বর্তিকা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

7263
.002/25

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

৫৫—২০ সংখ্যা—১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট : : কলিকাতা—১২

১।	চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২।	রবীন্দ্রনাথে তুমি ও আমি	শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত	৫
৩।	বাসদেবতা	শ্রীঅরবিন্দ	১১
৪।	মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	২১
৫।	যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	৩৫
৬।	ভারতের অমর সাহিত্য	শ্রীঅরবিন্দ	৪৮
৭।	শ্রীমা প্রসঙ্গ	ডাঃ কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	৫৬
৮।	অমৃতসঞ্জীবনী (কবিতা)	নিশিকান্ত	৫৮
৯।	আগমনী (")	রবি গুপ্ত	৬০
১০।	অপরাজেয় ( )	রণজিৎ সরকার	৬৩

বার্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৲ টাকা

4-'60-750

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

১৯৬০

জ্ঞানে পাওয়া, ভাল।
জীবনে ধরা, আরো ভাল।
হয়ে ওঠা, পূর্ণ সিদ্ধি।

—শ্রীমা

শ্রীমা

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীঅরবিন্দ

বিবর্ত্তন এখনো শেষ হয় নি। প্রকৃতির শেষ কথা মনন নয়, মনোময় মানুষও প্রকৃতির পরম রূপায়ণ নয়। পশুর থেকে মানুষ যেমন উঠে এসেছে, মানুষ থেকে অতিমানসও তেমনি উঠে আসছে।

* * *

নিখুঁৎভাবে নিয়ম মেনে চলবার সামর্থ্য হল স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। সেই জন্যে প্রায় সকল সাধন-পথেই সাধকের অন্তঃপুরুষকে তার আপন দিব্যসত্তায় স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ হবার আগে তার নিয়ত অঙ্গের বিধিবিধান স্বীকার করতে হয়, পরিপালন করতে হয়। যে সব সাধন-মার্গ স্বাধীনতা দিয়েই আরম্ভ করে তা হল শক্তিমানদের জন্য, যারা স্বভাবতই স্বাধীন, কিম্বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাদের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা তারা গড়ে তুলেছে।

* * *

আত্মকৃত নিয়ম স্বাধীনভাবে, পূর্ণভাবে, সুবুদ্ধি অনুসারে পালন করবার যথেষ্ট ক্ষমতা যাদের নাই তাদের রাখা দরকার অপরের ইচ্ছাধীন করে। দেশ যে পরাধীন হয় তার কারণই এই। প্রভুর পদতলে যখন তাদের দুঃশীল অহংকার দলিত পিষ্ট হয়েছে তখনই স্বাধীনতার দ্বারা স্বাধীনতার যোগ্য হবার পুনরায় সুযোগ তাদের দেওয়া হয় কিম্বা যদি শক্তি তাদের থাকে তবে তা অর্জ্জন করে।

* * *

অপরের প্রদত্ত নয়, নিজের উপর নিজের প্রদত্ত নিয়ম পালন করাই হল স্বাধীনতার অর্থ—আমাদের বর্ত্তমান অপরিশুদ্ধ প্রাকৃত অবস্থায়। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আমরা উপভোগ করতে পারি শুধু ভগবানের মধ্যে, কিম্বা অধ্যাত্মচেতনার একাধিপত্যে।

* * *

পাপপুণ্যের দ্বৈত-বিধান আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে, কারণ আমাদের অন্তরে সেই আদর্শ জীবন ও জ্ঞান নাই যা স্বতঃই অব্যাহতভাবে অন্তরাত্মাকে নিয়ে চলে তার আত্ম-সিদ্ধির দিকে। পাপপুণ্যের বিধান কেটে যায় যখন সত্যের মধ্যে প্রেমের মধ্যে ভাগবত

সূর্য্য তার অনাবৃত প্রভা নিয়ে অন্তরাত্মার উপর কিরণ বর্ষণ করে। মোসেস'এর পরিবর্তে আসেন যীশু, শাস্ত্রের পরিবর্তে শ্রুতি।

* * *

অজ্ঞানের বন্ধনে যখন আমরা রয়েছি তখনও অন্তরস্থ ভগবান আমাদের সর্ব্বদাই যথাযথভাবে নিয়ে চলেন। কিন্তু তখন লক্ষ্য স্থির থাকলেও, সেখানে পৌঁছাতে হয় ঘুরে-ঘুরে, এ-দিক সে-দিক চলে ফিরে।

* * *

ক্রশ-চিহ্ন যোগ-সাধনায় হল পুরুষ ও প্রকৃতির দৃঢ় ও পূর্ণ মিলনের প্রতীক, কিন্তু অজ্ঞানের সব মলিনতার মধ্যে আমাদের পতনের ফলে তা হয়েছে দুঃখকষ্টের ও চিত্তশুদ্ধির প্রতীক।

* * *

খৃষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন শুদ্ধি সাধনার জন্য, পূর্ণতার সিদ্ধির জন্যে নয়। তিনি পূর্ব্ব হতেই দেখেছিলেন যে তাঁর ব্রত সফল হবে না, তাঁকে ফিরে আসতে হবে ভাগবত অস্ত্র হাতে নিয়ে, এই যে জগৎ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে তার মধ্যে।

* * *

মহম্মদ যে ব্রত নিয়ে এসেছিলেন তার প্রয়োজন ছিল; নতুবা কেবল আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টাকেই আমরা অতিক্রম করে দেখতাম এবং শেষে আমাদের মনে হত যে পৃথিবী কেবল মঠবাসীদের জন্য আর নগর হল নরভূমির অন্তরে পৌঁছিতে সাময়িক আশ্রয় মাত্র।

* * *

সব বলবার পরে বলতে হয় প্রেম ও শক্তি দুটিতে মিলে তবে পরিণামে জগৎকে উদ্ধার করতে পারে, কিন্তু শুধু প্রেমে নয়, শুধু জ্ঞানে নয়। তাই ত খৃষ্ট তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবের উপর দৃষ্টি দিয়েছিল আর মহম্মদের ধর্ম্মও যেখানে বন্ধ হয়ে থেমে যায় নি সেখানে, ইমামদের পর হয়ে মেহ্দির জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে।

* * *

বিধি-বিধান জগৎকে উদ্ধার করতে পারে না, মোসেস'এর অনুশাসন মানবজাতির পক্ষে মৃত আর ব্রাহ্মণের শাস্ত্রও দূষিত ও মুমূর্ষু। বিধি যখন স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ছড়িয়ে বন্ধনহীন হয়ে পড়বে তখনই তা নিয়ে আসবে মুক্তি। পণ্ডিত নয়, চাই যোগী—সন্ন্যাস নয়, চাই বাসনার, অজ্ঞানের, অহংকারের আন্তর পরিবর্জন।

* * *

বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত ভাবাবেগের বশে এই ভ্রান্তি স্বীকার করে বসেছিলেন যে সাকার ভগবানকে মেনে নেওয়া হল একটা বিষম দুর্নীতি, এ রকম ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করা সকল সৎ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। কিন্তু জগৎকে চালিত করে থাকে যদি সকল নীতির অতীত, এক সর্ব্বশক্তিমান প্রজ্ঞা ও ইষণা, তবে তাকে বাধা দেওয়া নিশ্চয় অসম্ভব। আমাদের

দিক থেকে বাধা দান তাঁরই উদ্দেশ্য সাধন করে, আর বস্তুত সে বাধাদান তাঁরই আদিষ্ট। তাই যদি হয় তবে, তাঁকে অভিযুক্ত না করে, অস্বীকার না করে, তাঁকে জানবার, বোঝবার প্রয়াসই শ্রেয় নয়?

* * *

ভগবানকে যদি বুঝতে চাই, তবে আমাদের সব অহংকৃত অজ্ঞান মানুষী ধারণাকে বর্জন করতে হবে, নয় তাদের উন্নত করে বিশ্বভূত করে তুলতে হবে।

* * *

সজ্জনের মৃত্যু হয়, ব্যর্থতা হয় আর অসৎ থাকে বেঁচে, হয় বিজয়ী, তাই বলে কি ভগবান হলেন অসৎ? এ রকম সিদ্ধান্তের ন্যায় আমি ত দেখি না। প্রথমত আমাকে স্বীকার করতে হবে যে মৃত্যু ও ব্যর্থতা হল অসৎ কিছু। আমার ত কখন কখন মনে হয় যে এরা যখন এসে উপস্থিত হয়, তখন ক্ষণিকের জন্য তারা হয় আমাদের পরম সৎ। কিন্তু আমাদের প্রাণ আমাদের আধ্ এতখানি আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে যে তারা যা পছন্দ করে না, কামনা করে না সে সবই আমাদের কাছে অসৎ হতে বাধ্য।

* * *

আমার অতীত জীবনের উপর আমি যখন দৃষ্টি দেই তখন দেখি যদি আমি বিফল না হতাম, দুঃখভোগ না করতাম, তবে জীবনের যে শ্রেষ্ঠ আশীষ তা থেকেই বঞ্চিত হতাম—কিন্তু যখন আমি দুঃখভোগ করেছি ব্যর্থ হয়েছি ঠিক তখন কিন্তু একটা দুর্গতির বোধ আমাকে সংক্ষুব্ধ করেছে। কারণ আমরা ত আর কিছুই দেখতে পাই না এক যা আমাদের নাসিকার সম্মুখে তা ছাড়া তাই ত আমরা এই যত উদ্বেগ-আবেগের প্রশ্রয় দিয়ে চলি। শান্ত হও, ক্লান্ত প্রাণ। অহংকারকে নিহত কর, শিক্ষা কর কি রকমে দৃষ্টি হয় বৃহৎ বিশ্বতোমুখী।

* * *

সকল ভ্রান্তির, সকল দুঃখভোগের ঔষধ হল পূর্ণ বিশ্বদৃষ্টি আর বিশ্ব-অনুভব—কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাদের অহংকারের পরিধিকেই কেবল বাড়িয়ে চলে।

* * *

মানুষ বলে ও চিন্তা করে, "দেশের জন্য", "মানবজাতির জন্য", "জগতের জন্য", কিন্তু আসলে তার অর্থ করে," "দেশের মধ্যে যতটুকু পাই আমাকে তার জন্যে", "মানবজাতির মধ্যে যতটুকু পাই আমাকে তার জন্যে," "জগৎকে যতটুকু আমার নিজের খেয়ালের অনুগত করে ধরেছি তার জন্যে।" এ রকমে বৃহৎ হওয়া যায় বটে, তার নাম মুক্তি নয়। বৃহতে বিচরণ আর বৃহৎ কারাগৃহের মধ্যে বিচরণ একই রকম মুক্তির অবস্থা নয়।

* * *

যে ভগবান তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে, যে ভগবান তোমার নিজের মধ্যে, যে ভগবান তোমার দেশের মধ্যে এবং তোমার শত্রুর দেশেরও মধ্যে, যে ভগবান মানবজাতির মধ্যে, যে ভগবান তরুলতায়, পাথরে-শিলায়, ইতর প্রাণীর মধ্যে, যে ভগবান জগতের মধ্যে, জগতের বাহিরে, তাঁর জন্য যখন তোমার জীবন, তখনই তুমি উঠে গিয়েছ মুক্তির ঋজু পথে।

* * *

ন্যূনতর এবং বৃহত্তর শাশ্বত সব আছে—শাশ্বত হল অন্তরাত্মার গুণ, তা কালের মধ্যে থাকতে পারে, কালকে অতিক্রম করেও থাকতে পারে। শাস্ত্রে যখন বলে "শাশ্বতী সমাঃ", তখন তার অর্থ কালের সুদীর্ঘস্থায়িতা অথবা প্রায় অপরিমেয় যুগ একটি—এক পূর্ণ ভগবানই শুধু পূর্ণ শাশ্বত। তথাপি, যখন অন্তরে প্রবেশ করা যায়, তখন দেখা যায় বস্তুত সব জিনিষই শাশ্বত—অন্ত কোথাও নাই, কখন আদিও কিছু ছিল না।

* * *

যখন কাউকে তুমি বল মূঢ়—কখন কখন তা বলতে হয়—তখন কিন্তু ভুলে যেওনা, তুমি নিজেও বিশ্বমানবের অন্তর্গত হয়ে ছিলে পরম মূঢ়।

* * *

ভগবান মূঢ়ের মত আচরণ করেন সময় মত, মানুষ কিন্তু তা করে সময়ে ও অসময়ে—উভয়ের পার্থক্য এই শুধু।

* * *

বৌদ্ধদের মতে চলনশূন্য একটি পিপীলিকাকে উদ্ধার করা, একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার অপেক্ষা মহত্তর কর্ম্ম। কথাটির মধ্যে সত্য আছে বটে, কিন্তু সব সত্যকেই আবার সহজেই অতিক্রম করা যায়।

* * *

একটি সদ্‌গুণকে—করুণাকে পর্য্যন্ত—অন্য সকলকে ছাড়িয়ে অতিরিক্ত উর্দ্ধে তুলে ধরা হল যেন জ্ঞানচক্ষুকে হাতের আড়ালে রাখা। ভগবান নিত্য চলেছেন সমন্বয়ের অভিমুখে।

* * *

অন্তরাত্মা তোমার যতদিন দেখছে পার্থক্য, ততদিন তুমি তোমার করুণা দুঃস্থ জনদের জন্যই রেখে দিতে পার—কিন্তু মানুষ তোমার কাছে আশা করে মহত্তর কিছু, আশা করে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, সদ্ভাব, সাহচর্য্য, সমানে সমানে ভ্রাতৃবোধে সহযোগ।

---

* Thoughts and Aphorisms থেকে। অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথে তুমি ও আমি

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

এক প্রান্তে

তুমি হে কেবল প্রভু তুমি হে কেবল

অন্যপ্রান্তে

অয়মহম্ ভোঃ—

একপ্রান্তে তুমিই শুধু আছ, আমি নাই, আমি তোমাতে লয় পেয়েছি ; অন্যপ্রান্তে আমিই শুধু আছি, তুমি আমার মধ্যে লয় পেয়ে গিয়েছ। এই দুই প্রান্তের মাঝখানে তুমি ও আমি আছি নানা পরিমাণে ও নানা চঙে, সুতরাং নানা সম্বন্ধ স্থাপন করে।

রবীন্দ্রনাথে এই দুইটির সম্বন্ধ ও সম্বন্ধ-ক্রম চমৎকার একখানা ছবি আমাদের মানসপটে রচনা করে এবং অনেকখানি জ্ঞান আমরা তা থেকে পাই। গোড়ায় সমুচ্চে—চেতনার গোড়ায় ও সমুচ্চে—আমরা পাই বৈদান্তিক অদ্বয় ও অদ্বিতীয়তা— ঁ তৎ সৎ, সেই শুধু আছে, অর্থাৎ তুমি। তাইত ঔপনিষদ মন্ত্র প্রতিধ্বনিত করে তিনি বলছেন—

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি
তারে নমো নম।

সোঽহমস্মি—সেই ত আমি, আমার যে সত্য-সত্তা তা তুমি। এ হল অন্তরাত্মার চেতনার তুরীয় স্থিতির সিদ্ধান্ত—কিন্তু প্রাণে ও দেহে অনুরূপ অনুভূতি যখন নেমে আসে, বৈষ্ণবীয় পূর্ণ প্রপত্তি বলে তখন

.....আত্মহারা
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে

কিম্বা

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমার ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে

অথবা

যাচি যে তোমার পরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি

আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও
চোখের জলে॥

বৈষ্ণব কবি যেমন বলছেন রাধা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণই যেন হয়ে গেলেন। এ হল পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি, কেবল তুমি। কিন্তু এই তুমির মধ্যে ধীরে ধীরে আমির আবির্ভাব হয়—নতুবা লীলা কি? সাধক তাই বলছেন, না, চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই। প্রপত্তির প্রথম পৈঠা তবে হল—

আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—

তুমিই আছ, আর আমিও আছি কিন্তু তোমার অনুগত হয়ে, তোমার প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া হয়ে, তোমার করণ-উপকরণ হয়ে। সত্যকার আমি তাই—সাধকেরা যাকে বলে থাকে "পাকা আমি"। এই ভাবের ভাবুক হয়ে কবি তখন বলেন—

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি...
আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে।

আমি, আমার সত্যকার অস্তিত্ব, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম কৃতিত্ব সব তদ্‌গত বা মদ্‌গত, তোমারই প্রকাশ ও মহিমা—যেন আমি একান্তভাবে জানি, উপলব্ধি করি—

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়...

এ কথা নিশ্চয় সত্য, মূল আদি সত্য, সন্দেহ নাই—

অহংকার তো পায়না নাগাল যেথায় তুমি ফের।

তবুও কথা আছে—অহংকার নয়, এই যে আমি তা তুমি, তুমি হয়েছ বা এসেছ আমি হয়ে, তোমার আপন প্রয়োজনের, বা আত্মরঞ্জনের জন্য—পরাশক্তির এই ত হ্লাদিনী শক্তি অর্থাৎ যাকে আশ্রয় করে আনন্দের লীলা। কারণ নিজ সত্তায় তুমি অকায়ং অব্রণং নিত্যং জ্যোতিঃ তমসঃ পরস্তাৎ। তার মধ্যে যখন আমি-প্রত্যয় জাগে তখনই ত সৃষ্টি, বহিঃপ্রকাশ—তুমি নিজে অসীম, কিন্তু

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর...
তোমার আলোয় নাইত ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া—

এই কথাই ঘুরিয়ে কবি বলছেন

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান—

এ পর্য্যন্ত একে বলতে পারি আমি তুমির প্রায় সমান ভাগাভাগি, সমান মর্য্যাদা—কিন্তু এর পরে থেকে আমির দাবি বেড়ে যায়—যত আমরা চলি পৃথিবীর দিকে, মানুষী ভাবের দিকে—পদস্খলনের প্রথম পদে বলে উঠি, "আমি"র স্ব-তন্ত্র মহিমা গেয়ে—

তুমি মোরে চাও যবে অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে—

'অব্যক্তের অখ্যাত আবাস', এই দূঢ়, প্রায় রূঢ় পরিভাষার, কবি দিয়েছেন সৃষ্টির প্রাক্কালের চিত্র। অবশ্য বৈদিক ঋষিরাও ঐ জাতীয় মন্ত্র দিয়েছেন—তবো আসীৎ তমসা গূঢ়ং অগ্রে—সেটি হল অচেতনার মহাসাগর, তার মাঝে প্রথম জাগল কামনা অর্থাৎ মহৎ। বৈদিক ঋষিরা এখানে উপর থেকে, ব্রাহ্মীচেতনা থেকে সৃষ্টি বা প্রকাশের কথা বলছেন না—বলছেন নীচের সৃষ্টির কথা, অবচেতনা থেকে স্থূলের বা পৃথিবীর জন্ম-কথা। আমাদের বাক্যটির সমগোত্র মিলবে হয়ত আধুনিক একটা চিন্তাধারায়, আধুনিক পাশ্চাত্যে, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে **Existentialism** (বলি, ভবতি-বাদ)। দুই রকম অস্তির আছে—এক শুদ্ধ "অস্তি" আর এক "ভবতি"। অস্তি অর্থ প্রায় নাস্তি, কারণ তাই হল "অব্যক্ত অখ্যাত" অচেতন নিশ্চেতন, শূন্যপ্রায়। আদি নিস্তরঙ্গ স্থির শূন্যে ঢেউ ওঠে যখন তখন সৃষ্টি, প্রকাশ—প্রত্যেক ঢেউ হল "আমি"। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে এ রকম কথা আছে—তবে এক বৌদ্ধবাদ ছাড়া আদি অব্যক্তকে শূন্য কেউ বলেনি, তাকে প্রাধান্য দিয়েছে অচেতনা নয়, পরাচেতনা বলে এবং সকল আমিকে তারই অঙ্গ করে, বা তারই মধ্যে ডুবিয়ে মিলিয়ে রেখেছে। তাইত সে বলতে পেরেছে প্রাণের আবেগে—

তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাওত

কিন্তু পাশ্চাত্যের ভবতি-বাদের যে বৈশিষ্ট্য তা হল তার "আমি"র বৈশিষ্ট্য। এই আমি জন্মেছে তার নিলয় বা জন্মস্থান, তার পটভূমিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করে, তাকে পায়ে ঠেলে যেন তার অসীম সমতার উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে আপন বৈষম্য প্রকট করে, একটা স্বাতন্ত্র্য যার অর্থ একান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠায় ক্ষুধা তা নিয়ে। এই যে তত্ত্ব মানুষের দেহে প্রাণে এবং মনে যখন রক্তমাংস নিয়ে শরীরী হয়ে ওঠে—যেমন, মানুষী প্রেমের আবেগ, তখন সে আর সৌম্য থাকে না, হয় রুদ্র—মহালক্ষ্মী নয়, মহাকালী। রাধা তখন বলে ওঠেন

শুন মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল

তখন শুরু হয় একান্ত মান-প্রতিমানের পালা অর্থাৎ অহমিকার বিচিত্র অভিমান বিপরীত

লীলা। মান-অভিমানকে প্রেমের লীলায় আমরা খুব বড় স্থান দিয়েছি—প্রেমের গরব সৌন্দর্য্য বলেই একে আমরা গ্রহণ করি—কিন্তু আসলে এ হল অহমিকার চরম প্রকাশ। এ লীলার প্রথম ও একমাত্র সূত্র হল আমির মূল্য ও মর্য্যাদা, তুমি হয়ে গেলে আমির দাস সেবক—ভগবান সত্য সত্যই ভক্তের দাস হয়ে পড়লেন, একটা তামস অর্থে নয় কি? পরানুরক্তি নিয়ে রাধিকা বলেছিলেন—হামার গরব তুঁহু বঢ়াওয়ল—কিন্তু এখন তাঁকে বলতে হবে, তোমার গরব হমে বঢ়াওয়ল। আমি ছাড়া তোমার আর গতি নাই, তাইত প্রেমের এই দাবি

তুমি ত ভালো বেসেছ আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।

কারণ তুমি ত আর নাই, আমিই হয়ে গিয়েছ—ভগবান, পৃথিবীতে যখন নেমেছ তখন ত তুমি এই মাটিই হয়ে গিয়েছ—

তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো

ভক্তের মধ্যে ছাড়া ভগবানের আর বাঁচবার স্থান নাই। কবি তাই স্পষ্টই বলছেন দার্শনিক তত্ত্বের রূপ দিয়েই—

মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্ম্মার বিশ্ব শিল্প...

কারণ,

ওদিকে অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলি আমি।

এই ভাবের ভাবুক হয়ে, মানুষী প্রেমোন্মাদের মতই, ভগবানকেও উদ্দেশ্য করে বলা যেতে পারে অহমিকাকে একটা স্থিতশ্রী পরিয়ে দিয়ে—

যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে*

এ হল "আমি"র দেবত্বপ্রাপ্তি বা দেবায়ন (Apotheosis)। তখনই কি হৃদয় হতে উৎসারিত হয় না আমিত্বের এই মহিমা-গীতি একটা ভাবের রসে জারিত হয়ে, মধুময় হয়ে—

---

* এ আক্ষরিক অনুবাদ করিয়ে দেয় ফরাসী কবি র্যঁ সার যে মহাবাক্য বলে গিয়েছিলেন মেড়শ শতাব্দীতে—

Ronsard me célébrait du temps que j'estois belle.

র্যঁ সার আমার গুণকীর্তন করেছে সে-কালে যখন ছিলাম আমি সুন্দরী।

শেক্সপীয়রও বলেছেন

But you shall shine more bright in these contents

(Sonnets 98)

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তার বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।

তব কণ্ঠে মোর নাম সেই শুনি গান গেয়ে উঠি
"আছি, আমি আছি।"

এ আকূতির পিছনে আছে এক ভয়, আতঙ্ক আমি নাই, আমি নাই, আমি থাকব না। তবে কথা আছে—জিনিষটা যে অতখানি সহজ ও একান্ত, তা নাও হতে পারে। সৃষ্টি একতন্ত্রময় নয়, তা জটিল এবং বহুমুখী। "আমি" অহংকারের কথা বললাম, বললাম তার নেতিমুখী ধারার রহস্য। কিন্তু ইতিপূর্বে একটা পাকা-আমির উল্লেখ করেছি; তার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, তার ভাবে ভাবুক হলে এই আমিত্ব-কীর্তনের অন্যরকম অর্থ ও ব্যঞ্জনা পাই। বৈষ্ণব কবিদের ভাষণ-ভঙ্গিই তখন মনে পড়ে। দেহজ কামের চিত্র বিবৃত করে চলেছি, কিন্তু তার আন্তর চিত্র ভাগবত প্রেমের লীলা-বৈচিত্র্য। ফলতঃ অজ্ঞানের বাহ্যবৃত্তি যত, তারা যে একান্ত বাহ্য, একান্তই মিথ্যা মোহ তা নয়—সে-সবই হল অন্তরের উত্তরের সত্যেরই ছায়া বা বিকৃতি। বাহিরে যে বিকৃতি দেখি তা অন্তরের প্রকৃতির অনুকরণ। সুতরাং বাহ্যতঃ যাকে বলি অহংকার, অহম্মন্যতা, অহমিকা, অন্নিতা, স্বার্থপরতা, স্বাধীকারমত্ততা তার পিছনে রয়েছে একটা দিব্য সত্য, তা হল জীবভূত ব্রহ্মসত্তা, বাষ্টির, বাষ্টির অন্তরাত্মা, আমির মধ্যে নিহিত যে তুমি, কিম্বা তুমির মধ্যে প্রস্ফুটিত যে আমি।

অহং যে দাবী করে ভগবানকে, মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা করে কল্পনা করে—অর্থাৎ ভাল বাসে মানুষীভাবেই—ভগবানকে, তার পিছনে রয়েছে এই সত্য যে ভগবানও চায় মানুষকে, শিবও চায় জীবকে, ব্রহ্মও চায় অহংকে। কারণ ও-দুটি বস্তু মূলতঃ একই। মানুষ উপরে উঠতে চায়, কারণ উপরে থেকে নীচে ডাক এসেছে। সৃষ্টি ক্রমে বিকশিত করে চলেছে সেই বস্তু যা তার মধ্যে সম্পুটিত। আমি চাই তুমি হয়ে উঠতে কারণ তুমিই "আমি"তে লীন বা একীভূত। তাই কবির

আমারে যে ডাক দেবে এজীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া

একটা নিবিড় সত্য অর্থ গ্রহণ করে। তবুও যে উপলব্ধি এই সিদ্ধান্তকে সত্য করে তোলে তার স্থিতি আর এক লোকে বা চেতনায়—তাকে যদি এই লোকের চেতনা দিয়ে ব্যক্ত করি তবে তার সুর অন্যরকম হয়ে পড়েই, তার মধ্যে দেখা দেয় এই মায়ার মিথ্যার লোকের আকূতি—যে বলে

তব কণ্ঠে মোর নাম সেই শুনি গান গেয়ে উঠি
"আছি, আমি আছি"

সোঽহমস্মি—সত্য বটে কিন্তু তা হল "সঃ অহম্," তা "অয়ম অহম্" নয়—"সঃ" এর মধ্যে ডুবে যাওয়া "অহম্"—কবি নিজেই ত বলেছেন এক সময়ে

ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মত যেন
অঙ্গ ওঠে ভরে

অনেক সময় এ ভাষা শাঁখের করাত যেন। একদিকে বা একভাবে—বাহ্যতঃ যা মনে হয় যেন অহমিকার মাহাত্ম্য নির্ঘোষ, আর একভাবে, আত্মন্-অভিজ্ঞতা ও অতীপ্সার দিক দিয়ে তাই আবার আত্মবিলুপ্তি নয় কিন্তু আত্মপ্রাপ্তির ফলে আত্মপ্রকাশের পরিচয়। তা ধরা যাবে ধ্বনির ব্যঞ্জনায়, কণ্ঠের সুরে।

বাসবদত্তা

[অনুবাদ]

শ্রীঅরবিন্দ

তৃতীয় অঙ্ক

অবন্তী : রাজপ্রাসাদে

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের অন্তরমহলে একটি কক্ষ।
মহাসেন : অঙ্গারিকা

মহাসেন। এখনও আমি জয় করে চলেছি,
তবে অবশ্য অস্ত্রবলের মাহাত্ম্যে নয়।
বন্দী সে!
তরুণ বিজয়ী বৎস আমার সম্পত্তি,
আমার হাতে বন্দী।

অঙ্গারিকা। (উচ্চহাস্যে) দেব হনুমানের মতোই
আপনিও সূর্যকে কুক্ষিগত করেছেন।
কী করবেন ওকে নিয়ে?

মহাসেন ওকে চন্দ্রমা বানিয়ে
ওর পাশে রাত্রির পূর্বাকাশে
দীপ্তি পাব আমি।

অঙ্গারিকা। পারবেন?

মহাসেন। সংশয়বাদী গৃহিণী আমার,
পারব।
তোমার অন্ধকার জগৎ থেকে
ভয়ার্ত তোমাকে

যেদিন সবলে টেনে নিয়ে এলাম
আমাদের সূর্যালোকে বাতাসে নীলাকাশে,
সৌভাগ্য-দেবী আমার,
সেদিন থেকে যা-কিছু আমি করতে চেয়েছি
তা-ই কি করিনি?

অম্বারিকা। হ্যাঁ, বলপ্রয়োগে;
কিন্তু এখানে তো বলপ্রয়োগে
হয়নি।
নিজের স্বধর্ম ত্যাগ করেছ,
চণ্ড মহাসেন,
আর আশা রাখছ বিজয়ের?

মহাসেন। তুমি আমার শক্তি,
আমার সৌভাগ্য,
কিন্তু উপদেষ্টা নও।

অম্বারিকা না, আমি শুধু চক্ষুর পালন করি
আর দেখে যাই।
তোমার অদ্ভুত জগতে
এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।
মানুষ জীবটি
সূর্যালোকের দ্বারা বিভ্রান্ত অন্ধ হয়ে
দৃষ্টির বশেই ভুল করে চলে।
আর, যে জগৎ তোমার মনে হয় অন্ধকার,
সেখানে যারা চলে
তাদের আছে দৃষ্টি।
এদেরই একজন আমি;
ছায়ার তলে বেড়ে উঠেছে আমার অন্তরাত্মা।

মহাসেন। কী বলে তোমার দৃষ্টি?

অঙ্গারিকা। বলে, তোমার নহষ
বৎসের নহষের কাছে কিছুই নয়,
তোমার ধূর্ততা
বৎসের ধূর্ততার কাছে কিছুই নয়;
তোমার চাপে প'ড়ে
নত হবে না সে।

মহাসেন। তুমি তো নত হয়েছ,
সিংহিনী।
আর এ তো
সুকুমার বালক,
শিশিরবিন্দুর মতো কোমল,
প্রতি তরঙ্গের সামান্য আঘাতেও বার বার অবলুণ্ঠিত
কুমুদের মতো।
মহাবীর একজন?
হ্যাঁ,
সব আর্যকুমারেরাই তাই।

অঙ্গারিকা। তোমার কন্যা বাসবদত্তা
এই তরঙ্গ,
তা প্লাবিত করে ফেলবে
এমন কুমুদটিকে।

মহাসেন। দেখেছ তুমি?

অঙ্গারিকা। ভালই ত; ঠিক যৌবনটি আবার অন্তর চায়।
আবার কন্যার হবে সাম্রাজ্য।

মহাসেন। না, হবে তোমার পুত্রের।

অঙ্গারিকা। কে, তাতে বিশেষ এসে যায় না।
যুগের নরশ্রেষ্ঠ তার চিত্তজয় করবে;

গর্ব্ব আর প্রেম
এই দুই দোষে দোষী সে—
এ-দুটিই তৃপ্ত হবে।
সুখী হবে সে।

মহাসেন। রাণী, তাকে ডাকো এখানে।
তাকে শিখিয়ে দিতে হবে
কি কি করতে হবে তাকে।

অঙ্গারিকা। তার হৃদয়ই তাকে শিখিয়ে দেবে।
বীণা, যাও রাজকুমারীকে আমার এখানে ডেকে আনো।

মহাসেন। ওঃ! হৃদয়, ওইখানেই তো বিপদ,
পাগলামি।
মনবুদ্ধিকে দাও রাশ ধরতে।

অঙ্গারিকা। রাজা, আমরা নারী।

মহাসেন। না, রাজনন্দিনী তোমরা।
আমার মেয়ের আছে সম্ভ্রম,
গর্ব, জ্ঞান, উচ্চাশা।
সাধারণের মতো আচরণ করতে পারে না সে।

অঙ্গারিকা। প্রেম এসে আসনটি কেড়ে নেবে,
ওসব লুটিয়ে দেবে
তার কুসুম-কোমল চরণের তলায়।

মহাসেন। তুমি যেন আজীবন
আমার বিরুদ্ধাচরণ করতেই কৃতসংকল্প।

অঙ্গারিকা। কাজে হুকুম মেনে চলতে হয় যাদের
তাদের ঐটুকুই হল যৎকিঞ্চিৎ প্রতিশোধ।
মহারাজ, ছাত্রী প্রস্তুত।

(বাসবদত্তা। প্রবেশ ও পিতামাতাকে প্রণাম)

রাজকীয় বিজ্ঞতা নারীর বুদ্ধিকে শেখাক
কী করে তার সব প্রিয়তম চিন্তাকে
রাজ্যশাসনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

মহাসেন। বাসবদত্তা, আনন্দদুলালী আমার,
জন্মদাতা পিতামাতার কাছে তোমার যে বহুদিনের গভীর ঋণ
তা পরিশোধ করবার এই সময়।
শোনো আমার কথা—
তুমি বুদ্ধিমতী, বুঝতে পারবে।
কৌশাম্বীর রাজা, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু,
আমার সৌভাগ্যের পথে উদ্যুক্ত বিঘ্ন বৎস
বন্দী হয়ে আসছে অবন্তীতে।
আমার ইচ্ছা, বৎস তোমার পতি হয়,
হয় তোমার ক্রীতদাস।
তোমার সহায়ে
এখনকার মতো বৈরী না হয়ে
অন্য রাজাদের মতো
হয় অধীনরাজ।
তখন তোমার পিতৃসৌভাগ্য সীমা ছাড়িয়ে যাবে,
তখন শাসন করবে তুমি তোমার গৃহ
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তোমার এই দেশ।
এই আমার ইচ্ছা ;
কল্যাণী, তোমারও কি তাই ?

বাসবদত্তা। পিতৃদেব, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা,
আর সে তো নিয়তিরও ইচ্ছা।
যার হাতে খুশী সমর্পণ কর আমাকে ;
সম্মতিদান ছাড়া
এতে আমার আর কী করবার থাকতে পারে ?

মহাসেন। অনেক কিছু

যা তোমাকে আমার মিত্র ও পরমসহায় করে তুলবে।
কারণ, তুমি না হলে
বৎসকে আমি বাঁধতে পারি না।
আদরিণী কল্যাণী। তোমাকে হতে হবে
স্বর্ণশৃঙ্খল,
তা দিয়ে বৎসকে বাঁধব আমার সিংহাসনের সঙ্গে,
আমার রাজদূত হয়ে তুমি জয় করবে তার মন,
এবং তার অনুগত সংকল্পের উপর শাসন করবে
তুমি আমার রাজপ্রতিনিধি হবে।

বাসবদত্তা। সে কি এতে সম্মত হবে?

মহাসেন। হাঁ, তুমি যদি রাজী থাক।

বাসবদত্তা। আমি রাজী, পিতৃদেব,
এই যখন তোমার ইচ্ছা।
সমস্ত বিশ্ব তোমার অধীন হোক
এ একান্ত ইচ্ছা আমার,
স্বদেশের মহত্ত্ব আমার ঈপ্সিত কল্যাণ।

মহাসেন। তোমাকে শিক্ষাদান আমার সার্থক;
হারিও না ও-জিনিস।
তোমার প্রকৃতি সাধারণের মতো নয়;
নিজের উচ্চাশাকে তুমি সকলের প্রথমে স্থান দাও না,
যদ্ধ চঞ্চল হৃদয়কেও সমর্থন করে চল না।

বাসবদত্তা। দেশের প্রতি এবং পিতার প্রতি কর্ত্তব্য
আমার পরিচালিত করবে।

মহাসেন। রমণীর কর্মকুশলতাকে আমি শেখাতে চাই না
কী করে এই যুবককে গড়ে-পিটে তুলতে হবে,
চাই না তোমার সংকল্পকে সাবধান করতে

রক্তের বাসনা কামনা সম্পর্কে।
হৃদয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাম চালায় সাধারণ নারীকে ;
তুমি হলে মনস্বিনী।

বাসবদত্তা। এই ত আমার গর্ব, পিতৃদেব,
তোমার মহা শ্রীবৃদ্ধির পথে
তুমি আমাকে সমুন্নত করে ধরেছ তোমার যন্ত্ররূপে।
আমি শুধু সেইটুকুই।

মহাসেন। হৃদয়ের তৃষ্ণার কাছে
তাহলে আত্মসমর্পণ করবে না তো তুমি ?

বাসবদত্তা। যতই কামনা হোক না তার
আমি কিছুমাত্র আত্মসমর্পণ করব না।
তোমার কন্যা আমি ;
মহত্তম রাজাও পর্য্যন্ত আমার কাছে এসে প্রার্থনা জানাবে
আর আশাতীত আনন্দ হিসাবে
হাত পেতে নিয়ে যাবে আমার অনুগ্রহ।

মহাসেন। তুমি আমার উপযুক্ত ছাত্রী ;
তোমার মনোযোগী মস্তিষ্কে
রাষ্ট্রনীতির কূটকথা বিফলে যায় নি।
মহারানী ! দেখলে তো ?

অঙ্গারিকা। মহারাজ ! মেয়ের সঙ্গে সন্ধি করলে তাহলে ?
একফোঁটা শিশু ও যেন এ-সব বুঝতে পারে।
যাও এখন,
আমাকে একলা থাকতে দাও
আমার মেয়ের সঙ্গে।
অন্য আর-এক ভাষায়
ওর সঙ্গে কথা বলব আমি।

মহাসেন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে
একটি শব্দ না।

অদারিকা। সে ভয় করো তুমি?

মহাসেন। না, বলো যা বলবে ওকে।

(ককু থেকে নিষ্ক্রমণ)

অদারিকা। (দু'হাতে বাসবদত্তাকে জড়িয়ে ধরে)
এখানে দু'জনও থাক, না;
অচিরে অন্য এক বক্ষে
আশ্রয় হবে তোমার।
মাতা কী বললেন শুনলে তো,
এবার শোনো তোমার বাবের কথা।
এখন জানতে পাবে
নারীর দেহ ও হৃদয়কে যেতে হয়
কি নিদারুণ ও নষ্ঠুর অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে।
মাতা আমার, আগুন বুকে ধারণ করবে তুমি,
দেখতে পাবে জীবন্ত সব দেবতাদের;
এতদিন যা সব ভেবে এসেছ
জেনে এসেছ
তা এক অগ্নিশিখায় গলে বিলিয়ে যাবে,
নবজন্ম পাবে তুমি।
এখন যা বলতে চাই
তা বুঝবে না এখনি,
কিন্তু অনেক বিনিদ্র রজনী যাপনের শেষে পারবে।
ফুল ফোটে সে ফুল বলেই,
তার বুলাশ্রয় মাটিকে উঁচুতে তুলে ধরবার জন্যে নয়।
তোমার বাবার জন্যও
তোমার মা তোমাকে জন্ম দেয় নি,
দিয়েছে যাতে তোমার আপন প্রকৃতি পূর্ণবিকশিত হয়
তোমার অন্তর পায় তার ঈপ্সিত আনন্দ,

আর স্বামী ও ভবিষ্য সন্তানসন্ততির জন্য।
বাছা, যে তোমাকে আলিঙ্গনে বাঁধবে
তাকেই তোমার দেবতা বলে গ্রহণ কোরো,
যাতে তারও দেবী হতে পারো তুমি।
বিবাহপূত তোমাদের বাহুতে রচে যেন স্বর্গ,
তার ইচ্ছা হোক তোমার,
তোমার ইচ্ছা হোক তার,
তারই সুখ হোক তোমার রাজৈশ্বর্য।
বাসবদত্তা, তোমার হৃদয়
জেগে উঠবে যখন
তখন তুমি অনুসরণ করবে এই একচ্ছত্র সম্রাটকে;
আর স্বার্থপর দেবতাদের কাছে
নিবেদন করবে না তোমার আনুগত্য।
এখন তোমার পিতার কথানুযায়ী চলো;
অচিরে জাগ্রত দেবতাটি চালাবেন
তাঁর অভিপ্রায় মতো।
ইঁা, কম্পিতদেহ সত্ত্বেও
কোনো ভয় ক'রো না।
বাছা, তোমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে
তোমার মা।

(বাসবদত্তাকে বাহুমুক্ত করে রেখে প্রস্থান।)

বাসবদত্তা। সবচেয়ে বেশি ভালবাসি
তবু বুঝতে পারি না মাকে:
অথচ আমার মন
আমার বাবার চিন্তাধারা সর্বদা ধরতে পারে।
বিবাহ যদি আমাকে করতেই হয়
তবে তাকেই করবো যাকে শাসনে রাখতে পারি।
বৎস! বৎস উদয়ন!
দূরান্ত-ধ্বনিত ও-নাম মাত্র আমি শুনেছি।
বীণাটি কেমন?

একটি অগ্নিশিখা ?
একটি ফুল ?
গোপালকের মতো সমুন্নত শির
না কোনো স্বর্গীত সুন্দর ও মধুরাক্ষি যুবক ?
জানবার জন্য হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠছে আমার।

(ক্রমশঃ)

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

(১)

প্রশ্ন : ভগবৎ সিদ্ধি ও দিব্যত্বপ্রাপ্তির আসল অর্থই যখন ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, তখন লোকে তাই নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের কথা বলে কেন ?

উত্তর : কথাটা এই যে ভগবানের যে-দিক নিয়ে তুমি তাঁকে ধরতে চাইবে কেবল সেই দিকের কথাই তুমি জানবে। তাঁকে যেমন ভাবে দেখবার দেখবার প্রত্যাশা ক'রে আসছো তেমন ভাবেই তাঁর দেখা মিলবে, যে রকম তাঁকে আবিষ্কার করতে চাইছ তেমনি আবিষ্কার করবে। তোমার প্রত্যাশিত এবং আকাঙ্ক্ষিত দিকের স্বরূপটাই তিনি তোমার সম্মুখে প্রকাশ করবেন।

যার যেমন গ্রহণযোগ্যতা ও সামর্থ্য তারই পরিমাপ অনুযায়ী তিনি সেই ব্যক্তির কাছে আপন অভিব্যক্তির বিকাশ করেন। তাতে তুমি যেমনই স্পর্শ পাও তা খাঁটি জিনিসই হবে, কিন্তু যেমন তোমার গ্রহণযোগ্যতা ও যেমন সাধনপন্থা তুমি বেছে নিয়েছ তারই মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে যদি তুমি কোনো সীমার পথ না নিয়ে সকল সীমাকেই ছাড়িয়ে যাও, তখনই পাবে তাঁকে সর্বময়রূপে পূর্ণ ও সমগ্রভাবে। অতএব তাঁকে বিভিন্ন প্রকারে দেখার সামর্থ্যের মধ্যে একটা তারতম্য রয়েছে, এই সম্পর্কেই হয়তো বিভিন্ন সত্তা-দের মধ্যে ছোটো বড়ো শ্রেণীবিভাগের একটা সত্য কৈফিয়ৎ আছে।

এ কথা সত্য যে প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান আছেন, সুতরাং ভগবানের সঙ্গে মিলে যাবার সম্ভাবনা সকলের মধ্যেই সমান,—তবুও যার যেমন যোগ্যতা ও সাধনপথ সেই অনুসারে তা খণ্ডিত বা অখণ্ড হবে, আর তারই হিসাবে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের দিব্যত্বের ক্রমোচ্চতার স্থান নিরূপিত হবে। যদিও কথার মারপ্যাঁচে আসল অর্থ অনেক বিকৃত হয়ে যায়, তবু এমন কথা বলা চলে যে যদিও স্পর্শলাভের গভীরতা সকলের বেলাতেই সমান, অর্থাৎ যেখানে কেউ ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছে সেখানে সে তা পুরোপুরি এবং নিখুঁত ভাবেই হচ্ছে,—কিন্তু কতরকম বিষয় নিয়ে ও কতগুলি দিক দিয়ে সেই একাত্মতা ঘটল তারই মাত্রাভেদ অনুসারে ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ থেকে যায়।

মনে করো ভগবানের মাপাল পেতে তুমি কোনো এক নির্দিষ্ট পন্থা বেছে নিলে ; মনে

P 30250

করো সেটা হলো জ্ঞানমার্গ। তা যদি হয় তাহ'লে স্বভাবতই তুমি সেই বিশেষ রাস্তাটিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে চলতে থাকবে, আর যা কিছু সেই মার্গের অন্তর্ভুক্ত নয় সমস্তকেই নিজের জীবন থেকে বাদ দিয়ে যেতে শুরু ক'রবে। যখন তুমি তাঁর কেবল জ্ঞানের দিকটি লক্ষ্য করেই চলেছ, তখন রাস্তা তোমার সোজা ও সুপ্রত্যক্ষ, তাই তুমি অন্য কোনো দিকে না চেয়ে বরাবর একমুখী থেকে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু একটিমাত্র রাস্তা বেছে নেওয়ার বদলে যদি তুমি সকল রাস্তাতেই পা দিয়ে চলে সব দিক থেকেই ভগবানকে জানতে এবং পেতে চাও, তাতে সামগ্রিক সাফল্য মিললেও তোমার যাত্রাটি হবে যথেষ্ট দুর্গম ও মন্থরগতি। তাঁকে যতই পূর্ণ স্বরূপে তুমি পেতে চাইবে ততই তোমার এগিয়ে চলা হবে কঠোর ও জটিল, দীর্ঘ বিলম্বিত ও শ্রমসাধ্য।

অবশ্য, একপথগামী হয়ে চললেও যখন তোমার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে, অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে, তখন তা খাঁটি এবং নিখুঁত জিনিসই হবে। কেবল তফাৎ এই হবে যে তা খাঁটি হলেও অখণ্ড জিনিস নয়, তা হবে আংশিক জিনিস। অর্থাৎ যদিও তুমি ভগবানের সঙ্গে প্রকৃতই একাত্ম হয়েছ, প্রকৃতই তাঁর দেখা পেয়েছ, কিন্তু তা কেবল তাঁর সেই একদিক নিয়ে।

যে সর্বতোভাবে ও সমগ্রভাবে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারে, বিশ্বোপলব্ধির দিক থেকেও সে তাঁর সঙ্গে অভেদ ও একাত্ম, কাজেই এখানে তারতম্যের বেলা ঐ একপথগামী সিদ্ধব্যক্তির চেয়ে তাকে বলতে হবে ওর চেয়ে আরো অনেক উচ্চস্তরের সিদ্ধপুরুষ।

এখানেই মিলবে আধ্যাত্মিক সিদ্ধির ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের প্রকৃত অর্থ, এই তারতম্য থেকেই কথাটা বলা হয়। নতুবা এর অন্য কোনো ভিত্তি নেই, কারণ একাত্মতা একই জিনিস, যখন তা এসেছে তখন পুরোপুরি ভাবেই এসেছে। কিন্তু এইরূপ ভাবে দেখলে বলা যাবে যে ভগবানের সঙ্গে যারা মিলেছে তাদের সকলেরই উপলব্ধি যদিও সমান এবং নিখুঁত, সেই হিসাবে তারা সকলেই সিদ্ধ, কিন্তু তথাপি সকলেই সমানভাবে পূর্ণসিদ্ধ নয়।

* * *

প্রশ্ন : একপথগামী হয়ে যারা ভগবানের একদিকের সঙ্গেই সার্থকরূপে একাত্ম হতে পারে, তারা কি নিজেরা বোঝে যে এই একাত্মতা নিখুঁত হলেও আংশিক মাত্র ?

উত্তর : তা সম্ভব ; সবই তো সম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয় যে তা সচরাচর হয়না। তুমি তখন আপন নির্দিষ্ট মার্গের কথাগুলি ছাড়া অন্য সব কথাকে অগ্রাহ্য ক'রে এতই সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েও দাও যে, তোমার একাত্মতা সম্পূর্ণ না হয়ে আংশিক হচ্ছে এ ধারণা আনবার মতো কিছুই তোমার মধ্যে বাকী থাকেনা। ভগবৎ একাত্মতার অপূর্ব অনুভূতিটি এলে তুমি তার মধ্যেই তলিয়ে যাবে ; তখন আর কেইবা গুরু কেইবা শিষ্য, কেইবা সাধ্য কেইবা সাধক, তোমার সমস্তটাই তখন ভগবান। তখন আর ঐ ধারণা বা ঐ শিক্ষা নেবেই বা কে

আর দেবেই বা কে ? সেইজন্য একটি কথা ছাড়া অন্য সকল কথাকে বাদ দিয়ে দিতে থাকলেও ওরই মধ্যে চেতনার একটুখানি অংশকে তফাৎ ক'রে রাখা চাই, যেটুকু একান্তভার তোড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবেনা, সেই অংশটুকু জানবে যে তবু এখনও পুরোপুরি জিনিস হয়নি, এর পর অন্য রাস্তাও ধরতে হবে।

সমস্তই নির্ভর করে সেই পূর্ণতার উপর, যা দিয়ে সাধক আপন সত্তা থেকে তার নির্দিষ্ট মার্গের জিনিসগুলি ছাড়া অন্য সব জিনিসকে বাদ দিয়ে দেয়। যেমন মনে করো, যখন তুমি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেছ তখন যদি নিজের ভিতরকার প্রেম ও ভক্তিকে আপাতত ঘুম পাড়িয়ে রাখো, তাহ'লে একান্তভা এসে পড়লেও তখন দেখবে যে ওর মধ্যে একটা জিনিস বাকী থেকে গেল, অনুভূতিটি পুরোপুরিভাবে সন্তোষজনক হচ্ছেনা। কিন্তু যদি ওগুলিকে নিঃশেষে দূর ক'রে দাও, তাহ'লে একান্তভার সিদ্ধি এবং মিলন হলেও তা যে একপেশে জিনিস হচ্ছে এ কথা টের পাবার মতো কে আর রইল ?

* * *

প্রশ্ন : কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আনন্দ তো ভরপুরই থাকল ?

উত্তর ভরপুর আনন্দ, শাশ্বত, অনন্ত, সবই।

* * *

প্রশ্ন : তবে আর প্রভেদ কোথায় রইল ?

উত্তর প্রভেদ কেবল অভিব্যক্তিতে।

যেমনি তুমি ভগবানের সঙ্গে মাত্র একটা দিকে একান্ত হলে অমনি বাকী সব অভিব্যক্তি তার থেকে বেরিয়ে গেল। যদি সমস্ত অভিব্যক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই হয় তোমার লক্ষ্য, যেমন ধরো তুমি যদি নির্বাণ চাও, তাহ'লে সকল অভিব্যক্তিই তোমার কাছে শূন্য হল, সেখানে আর প্রভেদ বা ক্রমোচ্চতার কোনো প্রশ্নই রইলনা। কিন্তু যেমনি তুমি অভিব্যক্তির মধ্যে মাথা গলাবে অমনি প্রভেদের প্রশ্নটিও তখন এসে পড়বে। যেমন মনে করো, যদি অতি-মানস জগতের উপলব্ধিতে যাও, সেখানে প্রত্যেকে একই স্তরে উপস্থিত হবেনা, কারণ প্রত্যেক সত্তাটি এক ছাঁচে গড়া নয়, প্রত্যেকের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা একই রকমের নয়। লোকের মনে সেই মোহটাই রয়েছে বটে ; লোকে ভাবে যে একই জিনিষ অনন্ত চক্রে পুনরাবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক তাই নয়। উপলব্ধির বেলাতে, অভিব্যক্তির আরম্ভের বেলাতে সামর্থ্যের ও ক্রিয়াবিকাশের মধ্যে ক্রমোচ্চতার প্রভেদ আছে। যেখানে অভিব্যক্তির বাইরে চলে যাওয়া লক্ষ্য সেখানে ঐ প্রশ্নই নেই, উপর থেকে বা নীচের থেকে যেদিক দিয়ে হোক বেরিয়ে যেতে পারলেই হলো।

সমস্তই নির্ভর করছে তোমার নির্দিষ্ট আদর্শের উপর। প্রণয় বেছে নিয়েই যদি তুমি

সরে পড়ো, তবে তুমিই সরলে কিন্তু সারা বিশ্ব একভাবেই চলতে থাকল। অবশ্য তাতে তোমার কিছু যায় আসেনা, তোমার লক্ষ্য ছিল নিজে বেরিয়ে যাওয়া, তুমি বেরিয়েই গেলে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আরো সকলে বেরোতে পারলে। কেবল তোমার একার বেলাতেই তাই হলো, কিংবা হয়তো আরো যারা তোমার লক্ষ্য নিয়ে চলেছিল তাদেরও তাই হলো।

ঠিক এই সমস্যাই দেখা দিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের কাছে এখানে, আর আমার কাছে ফ্রান্সে : অর্থাৎ আগে তো আপন সীমাবদ্ধ পথটি ধরে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছই, তার পরে হবে আবার ফিরে এসে বাকী সকলকে ধরে পূর্ণ রূপান্তরের কাজ শুরু করার কথা,—আর না হয় যদি সমস্তকে সঙ্গে নিয়ে, কোনো পথকেই বাদ না দিয়ে এবং একত্রে সকল সম্ভাবনাকেই মেনে নিয়ে সকল দিক জুড়ে একত্রে অগ্রসর হই ? কোনটা ঠিক কাজ হবে, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত—অতিমানসকে পাওয়া ও উপলব্ধি না করা পর্যন্ত —জীবন ও কর্ম থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়াই, না সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত থেকে তাকে সাথে করেই অতিমানস অভিমুখে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হই ?

এটা বুঝতে হবে যে সব কিছুই ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় তুমি একটা ধাপ এগোলে, অমনি বাকী সকলকে সেখানে টেনে নিলে ; আবার এক ধাপ এগোলে, অমনি সে পর্যন্তও তাদের টেনে নিলে ; এইভাবে অগ্রসর হওয়া চলতে থাকল।

এতে তোমার মনে হতে পারে যে তেমন তাড়াতাড়ি এগোনো হচ্ছেনা। কিন্তু সামগ্রিক অগ্রগতি এই ভাবেই হয়।

(২)

প্রশ্ন : ভগবৎ প্রেমের উপযুক্ত আধার হতে চাইলে কি করতে হয় ?

উত্তর : ভগবৎপ্রেম তো হাজির হয়েই আছে, প্রবল এক শক্তি রূপে সতেজ ও পূর্ণ জীবন্ত নিয়ে তা আমাদের সামনেই রয়েছে, কিন্তু ক'জন সে কথা জানছে ? অধিকাংশ লোকের কিছুমাত্র অনুভবই নেই। বড়ো জোর নিজেরা যতটুকু ক্ষুদ্র, যতটুকু তাদের নেবার ক্ষমতা কেবল ততটুকুই টের পায়।

অথচ কথাটা একটু ভেবে দেখ। সেই ভগবৎ প্রেমের আবহাওয়ার মধ্যেই তোমাকে সর্বক্ষণ প্রায় ডুবিয়ে রাখা হয়েছে, অথচ নিজে তুমি তার বিন্দুবিসর্গও জানোনা ! ক্বচিৎ কখনো দৈবাৎ হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্য তার একটু সামান্য আভাস পেলে, আর অমনি বলে উঠলে : "ভগবৎ প্রেম আমার মিলে গেছে।" কিন্তু তা সেই আসলটাই নয়। হয়তো তোমার বন্ধ দরজা একটুখানি ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, আলপিনের মাথাটা যেটুকুর ভিতর দিয়ে

গলতে পারে সেইটুকু মাত্র, তাই সেই ফাঁক দিয়ে দিব্যপ্রেমের একটু বাতাস দরকার মতো ঢুকে পড়েছিল ; তার এই স্বভাব, যেখানেই জায়গা খালি পায় সেখানেই এমনি ক'রে ঢুকে পড়ে।

ভগবানের কেবল প্রেমই নয়, তাঁর সব কিছুই এমনিভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে, পূর্ণ তেজে ও পূর্ণ মাত্রাতে। তুমিই শুধু তাকে নিতে চাওনা, দরজা বন্ধ রাখো, জোর ক'রে এঁটে,—অহোরাত্র অন্য রকমের ব্যাপারে নিজেদের নিযুক্ত রেখে ব্যস্ত হয়ে থাকো।

অধিকাংশ সময় কেবল নিজেকে নিয়েই ভরপুর। আপন অহংটাই সব চেয়ে বড়ো, সারা বিশ্ব যেন খেটে মরছে তোমারই অহংএর জন্য। তুমি আছো সব কিছুর কেন্দ্র হয়ে, আর সারা বিশ্ব ঘুরে চলেছে তোমার কেন্দ্রকে ঘিরে। নিজের অন্তরের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখ, এ কথা একেবারে ঠিক কিনা ; বিশ্বকে তুমি ঐরূপ চোখেই দেখে থাকো, যেন তার সকল ব্যাপার ঘুরে চলেছে তোমাকেই কেন্দ্রে রেখে। কিন্তু সে দেখা তোমার বিশ্বকে দেখা নয়, বিশ্বের মাঝখানে কেবল নিজেকেই দেখা। যখন তুমি নিজেকে নিয়েই এমন ভরে আছো, সেখানে আর ভগবানের প্রবেশের স্থান কোথায়।

অথচ তিনি সর্বদাই উপস্থিত।

আর এত যে সব আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার তোমার চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে, তাও কি তুমি কখনো চোখ দিয়ে চেয়ে দেখ? কেবল কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে, যখন তোমার গ্রহণযোগ্যতা হঠাৎ একটু বেড়ে যায়, কিংবা ঘুমের ঘোরে যখন তুচ্ছ পাখির কথাগুলো নিয়ে ঘোলানোর মাত্রা একটু কমে যায়, তখনই হয়তো ক্ষণিক ঝলকের মতো কিছু একটু নজরে আসে, কিছু একটু অনুভব ঘটে। কিন্তু আবার সাধারণত, যেমনি তুমি জেগে ওঠো অমনি সবকিছুই ধুয়ে মুছে যায় তোমার দুর্ধর্ষ অহংএর চাপে, আবার সেই আগেকার জিনিস কাণায় কাণায় ছাপিয়ে ওঠে।

প্রথম কথা, এই অহংএর গণ্ডী থেকে তোমায় বেরিয়ে পড়তে হবে। তবেই একটু উপরে উঠে সব জিনিসকে তার সঠিক পরিচয়ে দেখতে শুরু করবে। আরো কথা, তেমন-ভাবে দেখতে চাইলে তোমাকে অবিকল একটি আয়নার মতো হতে হবে, থাকতে হবে একেবারে স্থির, নীরব, নিস্তরঙ্গ, শান্ত, অবিচল, নিরপেক্ষ হয়ে, নিজের মতামত কিছু না রেখে সম্পূর্ণই গ্রহণোন্মুখ হয়ে। তা যদি থাকতে পারো, তখন আবিষ্কার করবে যে এমন অনেক জিনিসই দেখতে পাচ্ছো যার সম্বন্ধে আগে কিছুই জানতে না, অথচ তা আগের থেকেই ছিল, কেবল সম্প্রতি তোমার মধ্যে কাজ করতে শুরু ক'রে দিলে। আর তখন তুমি এই বিরাট বিশ্বের মাঝে অতিক্ষুদ্র ঐটুকু অহংবিন্দুর মধ্যেই চিররুদ্ধ না থেকে ঐ সব অপূর্বতার মধ্যেই সর্বক্ষণ বাস করবে।

* * *

প্রশ্ন এই অহংএর গণ্ডী থেকে বেরোবার জন্য কেমন মনোভাব আনতে হবে?

উত্তর : শুধু মনোভাব নয়, ইচ্ছা চাই। তার জন্য প্রকৃত সংকল্প চাই। বস্তুত, এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুনিশ্চিত উপায় হলো নিজেকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করে দেওয়া। তাকে নিজের দিকে টানাটানি করতে যাওয়া নয়, কিন্তু নিজেকেই তাঁর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া। এতেই তুমি কতকটা বাধ্য হবে নিজের গণ্ডীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে

কিন্তু দুঃখের বিষয় এটি কেউ করেনা। ভগবান-চিন্তা করতে গেলেই অমনি তাঁকে নিজের দিকে সবাই টেনে আনতে চেষ্টা করে, তারই জন্য যথাসাধ্য জোর প্রয়োগ করতে থাকে, ফলে কিছুই পায় না। তখন তারা এই বলে আর্তনাদ শুরু করে : "ভগবানকে এত ক'রে ডাকলাম, এত প্রার্থনা জানালাম, কিন্তু তার কোনো জবাবই পেলামনা, কিছু সাড়াই মিললনা!" যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "নিজেকে তাঁর কাছে নিবেদন ক'রে দিয়েছ কি?" তখন তারা বলে "না, তা করিনি, তাঁকেই টেনে আনতে চেয়েছি। হায়, তাই বুঝি তিনি এলেন না!"

কিন্তু বাস্তবিক তিনি এলেন না নয়, তুমি যখন নিজের দিকে তাঁকে টানছিলে তখন নিজেই অহংএর গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে এমন ক'রে ঘিরে রেখেছিলে যে মাঝখানের দেয়ালটা তোমার কাছে কোনো কিছু আসার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজেকে রেখেছ জেলখানার মধ্যে বন্ধ ক'রে, আর কেউ তোমার কাছে আসছে না কেন এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছ।

শুধু জেলখানা নয়, তার আবার একটিও জানালা নেই!

নিজেকে তার বাইরে এনে বিলিয়ে দাও, নিঃশেষে নিজেকে দিয়ে ফেল, দেবার আনন্দেই যথার্থভাবে একবার দিয়ে দেখ। তবেই সম্ভব হবে তাঁর কথা কিছু জানতে পারা।

* * *

প্রশ্ন যদি ভাবতে চেষ্টা করি যে আমি বলে কিছু নেই, একমাত্র তিনিই আছেন, সেটাই কি হবে অহংএর গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায়?

উত্তর : তা হবে একরকম মনগড়া প্রচেষ্টা। শুধু মনের তরফ থেকে কিছু একটা কথা গড়ে নেবার চেষ্টা করলে তাতে বিশেষ কোনো ফল হয় না। যা চাইবে তা স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া চাই, তার জন্য আশ্পৃহা প্রবল হওয়া চাই, সত্তার মধ্যে দীপ্তশিখার মতো অহোরাত্র তা জ্বলতে থাকবে—অর্থাৎ আশ্পৃহার এক প্রজ্বলন্ত শিখা।

কেবল মাথার মধ্যেই জিনিসটা যদি চোকাও, তাতে কোনো কাজ হবেনা, কিছুই না।

* * *

প্রশ্ন : কিন্তু আমার বুদ্ধিতে এই মনে হয় যে মনের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে কিছু চেষ্টা করা যায় না। আর চেষ্টাকে স্বতঃস্ফূর্ত করিই বা কেমন ক'রে?

উত্তর : কেবল মনের দ্বারাই চেষ্টা হয় এ কথা জিদ্ ক'রে বলতে চাইছ কেন? আমি তো এই জানি যে, কোনো কিছুকে আয়ত্ত করতে শুধু মনের তরফের প্রচেষ্টা, আর সত্তার গভীর চৈত্যকেন্দ্র থেকে উৎসারিত রূপান্তরের আশ্পৃহা, এ দুইএর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

চেষ্টা যতক্ষণ কেবল মনেতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, ততক্ষণ তার মধ্যে তেমন কোনো জোরই নেই, কিংবা যদিবা একটু থাকে তা অতি সামান্য আর নিতান্তই তার সংকীর্ণ গণ্ডী-টুকুর মধ্যে। আর সর্বক্ষণই সেখানে একটা প্রতিবাদের ক্রিয়া চলতে থাকে। তাতে তোমার মনে হতে থাকবে যেন অনেক কষ্টে ইচ্ছাটিকে ধরেবেঁধে খাড়া ক'রে রেখেছ, কতকটা তার মধ্যে কৃত্রিমতাও রয়েছে, তুমি অনেক চেষ্টাতে জিনিসটাকে ভালো ক'রে ধরতে যাচ্ছ কিন্তু পরক্ষণেই তা কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

তাই আমার মনে হয় যে মাথার চেষ্টা দিয়ে যোগ করা খুবই কঠিন, যদি তা জোর ক'রে তোমাকে চেপে না ধরে। ইচ্ছা জিনিসটি ঠিক মাথার জিনিস নয় প্রকৃত ইচ্ছা—যাকে বলি জেগে-ওঠা ইচ্ছা—সেটি হলো হৃদয়ের ভিতরকার জিনিস, একটা জীবন্ত প্রেরণা-শক্তি, যা নিতান্তই চায় সার্থকতা।

কেবলই মাথার জোরে যা কিছু করতে যাবে তার মধ্যে অসংখ্য রকমের সংশয়দোলা লেগেই থাকবে। যেমন মনে করো, যেমনি তুমি কিছু একটা সাব্যস্ত করলে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার যতরকম বিপরীত যুক্তি আছে সেগুলি একসঙ্গে এসে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে দেবে। মনের তরফের এই হলো এক মস্ত কেরামতি—সব কিছু নিয়েই সে তর্ক চালাতে পারে আর সব কিছুই প্রমাণ করতে পারে। অথচ তুমি এক পাও এগোলে না।

(৩)

প্রশ্ন : নিম্নতর নিয়তির উপর উচ্চতর নিয়তির প্রভাব সম্বন্ধে—

উত্তর : চেতনার ক্ষেত্রে উপর্যুপরি অনেক স্তরভেদ ও ভূমিভেদ রয়েছে, আর প্রত্যেক রকম চেতনার বা কর্মস্তরের পক্ষে যে নিয়তি নির্দিষ্ট আছে তা অকাট্য। কিন্তু তার উচ্চতরের প্রভাব তার উপর এসে বর্তায়—যেমন প্রাণের প্রভাব আসে দেহের উপরে—

তাতে প্রাণের নিয়তি দেহের নিয়তির উপর চেপে বসলে তাকে সে বদলে রূপান্তরিত ক'রে দেয়।

তেমনি তুমি যদি তোমার আত্মশ্রদ্ধার জোরে, আভ্যন্তরীণ ইচ্ছার জোরে, নিজেকে নিবেদন ও যথার্থ সমর্পণের জোরে কোনো উচ্চতর স্তরের বা এমন কি সর্বোচ্চেরই সংস্পর্শে নিজেকে নিয়ে যেতে পারো, তাহ'লে সর্বোচ্চের নিয়তি সেখান থেকে নেবে এসে তোমার নীচেকার সমস্ত নিয়তিকে বদ্‌লে দেবে, আর অল্প সময়ের মধ্যেই এমন জিনিস ক'রে দেখিয়ে দেবে যা সম্পাদন করতে অনেক বছর কিংবা অনেক জন্মও লেগে যাবার কথা।

মনে করো যখন তুমি কিছু বিপদে পড়েছ, তখন যদি তোমার বর্তমান স্তরেই ছটফট করার বদলে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে চেতনারাজ্যের স্তরের পর স্তর পার হয়ে সর্বোচ্চে উঠে যেতে পারো, আর চরম সমর্পণের জোরে তারই সংস্পর্শ লাভ করতে পারো যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন পরাৎপর, তাহ'লে সেই পরাৎপরই তখন তৎপর হয়ে সমস্ত কিছু পাল্‌টে দিয়ে তোমার যেমন অবস্থাই হোক তার পরিবর্তন এনে দেবে—লোকে যার নাম দেয় "অঘটন ঘটানো", যেহেতু তারা জানে না যে কোন উপায়ে ওটি ঘটা সম্ভব।

কিন্তু আসল কথা এই যে, কেমন ক'রে সেই চূড়ান্ত পর্যন্ত ওঠা যায় তার ওই কৌশলটি জানা চাই।

(৮)

প্রশ্ন : প্ল্যানচেট বা স্বতঃলিখনের (automatic writing) প্রক্রিয়ার দ্বারা কিরূপ অদৃশ্য শক্তিকে নামিয়ে আনা যায়, আর কেমন ভাবেই বা তাই করা হয়?

উত্তর ব্যাপারটি নির্ভর করে যারা তেমন কিছুকে ডাকতে চাইছে তাদের নিজেদেরই উপর। অধিকাংশ সময়ে তথাকথিত কোনো "শক্তি"ই নামে না। প্ল্যানচেট চলতে থাকে তাদের নিজেরই মন ও প্রাণের স্পন্দনের জোরে; নিজেদেরই অবচেতন কল্পনাগুলো ঐভাবে দেখা দেয় শতকরা আটানব্বুই জায়গাতে। আর যদিবা তারা প্রকৃত কোনো অদৃশ্য শক্তির দেখা পায়, তাও এতরকমের হতে পারে যার কোনোটাই খুব নির্ভরযোগ্য নয়।

তোমরা হয়তো জোর দিয়ে বলবে যে লোকের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরকম। অনেক স্থলেই তারা প্রকৃত কোনো মৃতব্যক্তির "আত্মাকে" আমন্ত্রণ ক'রে আনে, হয়তো কোনো বন্ধু বা আত্মীয় বা প্রিয়জন, যার সঙ্গে মৃত্যুর পরে তারা যোগাযোগ করতে চায়। আর প্রায়ই তাদের কাছে নানা রকমের নির্বোধ প্রশ্ন করতে থাকে, তবে ভাগ্যিস তাদের কাউকে যথার্থই এইভাবে উত্যক্ত করতে পারে না।

এ বিষয় নিয়ে বড়ো জোর এইটুকুই বলতে পারি : এখন যদি কেউ থাকে যার সঙ্গে তোমার আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, সে চলে যাবার পরে তুমি শান্তচিত্ত হয়ে যথেষ্ট শক্তি নিয়ে তাকে স্মরণ করছো, তাহ'লে সে কয়েকটী কিছুকালের জন্য তার প্রাণচেতনাকে তোমার চারপাশের আবহাওয়াতে—যাকে সে ভালোবাসে তার আবহাওয়াতে—এনে উপস্থিত করতে পারে। তাতে বোঝা যায় যে পরস্পরের সম্পর্কটা খুবই অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ ছিল। আর যদি তুমি এতটা একরোখা জড়বাদী না হও যার মানসলোকে সাক্ষাৎ সংযোগবোধ কিছুই হয় নি, তাহ'লে তার সঙ্গে তোমার মনের সাক্ষাৎ ঘটেও যেতে পারে, ঐভাবে তার সঙ্গে মনের যোগাযোগ আনাও সম্ভব হয়। কিন্তু এমন জিনিস নিতান্তই বিরল। আর তোমার নিজের আবহাওয়া যদি বাস্তবিকই তেমন শান্তিপূর্ণ ও মজবুত হয়, আর এমনি একটা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের মতো জায়গা পেয়ে সেই মৃতব্যক্তির আত্মা সেখানে এসে গভীরভাবে একটু বিশ্রামলাভ করছে, সেখানে তাকে বিরক্ত করা তোমার পক্ষে উচিতই হবেনা তোমার উচিত হবে আপন ভালোবাসা দিয়ে তাকে ঘিরে রাখা আর শান্তিতে থাকতে দেওয়া।

সুতরাং সম্ভবও যদি হয় কারো সঙ্গে ঐভাবে কথা বলা বা কিছু আদানপ্রদান করা, তাকে আমি নির্বোধ কাজই বলব, আর তা খুব অন্যায়ও হবে। সৌভাগ্যের কথা এই যে যারা অমন বিশেষ রকমের আশ্রয় দেবার ক্ষমতা রাখে—যাতে কোনো আত্মা একটু মানবিক আশ্রয় ও বিশ্রাম পায়—তারা অমন প্ল্যানচেটে আঙুল দিয়ে তাকে বিরক্ত করতে প্রায়ই চায় না।

তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। কখনো কখনো উল্টে এমন হয়, মৃত্যুর পরে তোমার সেই প্রিয়জন নিজেই চাইলে তোমার আবহাওয়ার আশ্রয়ে এসে তোমার জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে, সে নিজেই ইচ্ছা ক'রে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। এমন একটি স্নেহময় স্বামীর কথা আমি জানি, মৃত্যুর পরে তিনি স্বয়ংলিখনের ভিতর দিয়ে এসে স্ত্রীকে অনেক নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করতেন, এবং তাতে তার খুবই উপকার হতো!

কিন্তু যারা অন্যায় কৌতূহলের বশে এই সব কাজে প্রবৃত্ত হয় তারা তেমনি তার সমুচিত ফলও ভোগ করে। যে আবহাওয়ার মধ্যে আমরা অবস্থান করছি তার মধ্যে অদৃশ্য কত ছোটোখাটো প্রাণসত্তা নিত্য আনাগোনা করছে, অপূর্ণ কামনা নিয়ে এখানেই আবদ্ধ থেকে তারা অত্যন্ত নিম্ন ধরনের প্রাণ-তৎপরতা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, তাদের সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রাণময় জগতের নানা শক্তিমান সত্তারও অপভ্রংশ; এরা সকলে মিলে গাদি লাগার মতো হয়ে ঘুরছে, অধিকাংশ মানুষ যে তা দেখার দুর্গতি হতে রক্ষা পেয়ে আছে এ তাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, কারণ সে দৃশ্য মনোরম নয়; কিন্তু কেউ যখন বিপরীত কৌতূহলের বশে স্বয়ং-লিখন বা টেবিল উত্তোলন বা ঐ ধরনের অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা ওদের সাড়া নিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে, তার ফলে এমন হয় যে ওদের মধ্যে কোন কোনো ক্ষুদ্রমনা সত্তা তাদের নিয়ে কিছু কৌতুক করতে এগিয়ে আসে, আর ঐ সকল ব্যক্তির অবচেতন মনের ভিতরকার খবর জেনে

তদনুযায়ী প্রমাণ দিয়ে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয় যে তারাই হলো সেই বিশেষ মৃতব্যক্তির আত্মা, যাকে তারা আমন্ত্রণ করতে বসেছে।

এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমি জানি যা জড়ো ক'রে গল্পচ্ছলে তোমাদের জন্য একটা বই লিখে দিতে পারি ; অনেকেই তাই ক'রে থাকে, এই সব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান ক'রে তাদের অভিজ্ঞতার অকাট্য প্রমাণ দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে কত কিছুই লেখে, অথচ সেই সব প্রমাণ এমনই হাস্যকর যে তার থেকে বরং এই কথাই প্রমাণ হয় যে কেউ বুঝি তাদের নিয়ে রীতিমত তামাসা করেছে। খুব সম্প্রতির এক দৃষ্টান্তের কথা বলছি, একটি ভদ্রলোক এসে গম্ভীরভাবে আমাকে বললে যে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি নাকি তার কাছে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য গুপ্তকথা বলে গেছেন। এর চেয়ে হাস্যকর আর কি আছে।

সে যাই হোক, সাধারণত এই হয় যে, প্ল্যানচেটের উপর তোমার নিজেরই ভিতরকার অবচেতন মন ও প্রাণশক্তিকে আরোপ ক'রে যা দেখতে পাও তাকে চমকপ্রদ রহস্যভেদ বলে নিজেকেই প্রত্যয় করিয়ে নাও। এই প্রণালীতে অনেক জিনিসই করা যায়।...এক সময় আমি নিজেই প্রমাণ ক'রে লোককে দেখিয়েছি যে তারা ঐভাবে নিজেদেরকেই আমন্ত্রণ ক'রে আনছে, অন্য কাউকে নয়। কেবল ইচ্ছার একাগ্রতার জোরেই আমি দেখিয়ে দিলাম যে টেবিল চেয়ারগুলো ঠক্ ঠক্ করছে, টেবিলটা নড়ছে, ইত্যাদি।

স্বয়ংলিখনের বেলাতেও তাই। তুমি যদি তোমার সচেতন ইচ্ছাকে নিজের মধ্যে একেবারে গুটিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে তোমার হাতটিকে অসাড় ক'রে টেবিলের উপর রাখো তাহ'লে দেখবে যে সেই হাত আপনা থেকেই নড়তে শুরু করেছে, এদিকে তোমার আভ্যন্তরীণ চেতনার একটা প্রচ্ছন্ন কোণ উৎসুক হয়ে উঠবে, হাতের সেই স্পন্দনকে একটা কিছু তাৎপর্য দিতে চাইবে, তার জন্য সে অবচেতন মনকে তখনই তলব করবে, আর সে অমনি শুরু ক'রে দেবে তার নিজেরই কল্পনার দর্শনগুলো এনে উপস্থিত করতে। যদি তুমি বৈজ্ঞানিক মনকে জাগিয়ে না রাখো তাহ'লে শেষ পর্যন্ত বোকার ফাঁদে গিয়ে পড়বে, আর যদি বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে বুঝে দেখ তো দেখবে যে জিনিসটার কোনো মানে হয় না, কেবল বাজে কৌতূহলের ঝোঁকে খানিকটা সময় নষ্ট করা, তা ছাড়া ওর মধ্যে আর কিছু নেই।

তবে ঐ যে বললাম এমনও হয় যে কোনো কোনো অশরীরী প্রাণসত্তা এসে তোমাকে পেয়ে বসলো। তাতে বিপদও ঘটতে পারে। সৌভাগ্যবশত তেমন খুব কমই হয়।

বহুদিন আগের কথা বলছি, আমি তখন ফ্রান্সে। কোনো এক ব্যক্তি এই ধরণের প্রক্রিয়াগুলো করতে করতে কোনো এক অশরীরী প্রাণসত্তার খপ্পরে পড়ে গেল। লোকটি ছিল জুয়াড়ে, প্রায়ই নানারকম ফটকাবাজি খেলতো। তার কাজই ছিল রুলেৎ (roulette) খেলবার জন্য মন্টি কার্লোতে কাটানো, আর বছরের বাকী সময়টা দক্ষিণ ফ্রান্সে থেকে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের (Stock Exchange) কেনাবেচাতে কিছু লাভ করে নেওয়া। সেই "আত্মাটি" কয়েক বছর যাবৎ সত্যিই তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে লাগল, স্বয়ংলিখনের

ভিতর দিয়ে নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিতো যে কখন কোন বাজিটা ধরলে তাতে জিৎ হবে। যখন জুলেৎ খেলতে যেতো তখন সেই তাকে বলে দিতো "অমুক নম্বরে ধরো", আর তাতে সে নিশ্চিত জিতে আসতো। এমনি ক'রে সেই "আত্মাটির" উপরে সে একান্ত নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়েছিল। ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের কেনাবেচাতেও সেই "আত্মাই" তাকে বলে দিতো "অমুক কাগজটা কেনো," ইঙ্গিতের দ্বারা সবই তাকে জানাতো। লোকটি অল্পদিনেই বিরাট ধনী হয়ে উঠল। বন্ধুদের কাছে সে গর্ব করেই খোলাখুলি বলে দিতো যে কেমন ক'রে সে এত ধনী হয়েছে।

একজন তাকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্য বললে :" দেখ, এই বেলা তুমি সাবধান হয়ে যাও, কাজটা তোমার খুব সঙ্গত হচ্ছেনা, যে আত্মাটি তোমাকে দিয়ে এই সব কাণ্ড করাচ্ছে তার মতলব ভালো নয়" সে লোকটির সঙ্গে তার ঝগড়াই হয়ে গেল। কিছুকাল পরে সে মন্টি কার্লোতে গিয়ে অনেক অনেক মাত্রার বাজি রাখতে শুরু করলে, কারণ জানে যে সে জিতবেই। সবাই তাকে ভয় করতে শুরু করলে, ব্যাংক্ পর্যন্ত দেউলে হবার দাখিল। তখন একদিন সেই আত্মা তাকে বললে "তোমার যা কিছু আছে সমস্তটাই অমুক নম্বরে বাজি রাখো",...ঠিক তাই সে করলে, আর সেই এক ঘায়ে সর্বস্ব তার খোয়া গেল। তবু তখনও তার ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে কিছু ছিল। সে মনে মনে ভাবলে, "এবারটা ভাগ্যের দোষে অমন হয়ে গেছে"। ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের বেলা আবার সে স্পষ্ট ইঙ্গিত পেলে "অমুকটা কিনে ফেলো" সেবারেও তাই সে করলে,—তখন সব কিছু হারিয়ে একেবারে সে নিঃস্ব হয়ে গেল। সেই আত্মাটি কিন্তু আরো মজা দেখতে চায়, তাই সে এবার ওকে বললে : "এখন চাই আত্মহত্যা। মাথার মধ্যে একটা গুলি চালিয়ে দাও।" সে এমনই ওর কথার বাধ্য হয়েছিল যে তাও সে ক'রে বসলো। এখানেই গল্পের শেষ। কিন্তু এ সম্পূর্ণ খাঁটি সত্য গল্প। তাই বলছি এ কাজ অতি বিপজ্জনক ; ওদিকে মোটে না যাওয়াই ভালো।

না:! কিছুই নেই ওতে। খানিকটা নিরর্থক হৈ হৈ করা আর অকাজের জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানো।

* * *

প্রশ্ন কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নিজে কি তাঁর যৌগিক সাধন (Yogic Sadhan) বইখানি এইরকম উপায় নিয়েই লেখেন নি ?

উত্তর : না, না, একেবারেই না। এ জিনিসই তা নয়। দুটো আলাদা কথা নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ো না। শ্রীঅরবিন্দ যা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ জেনেশুনেই করেছিলেন, যাকে তিনি চেয়েছিলেন তাকে নিজেই বেছে নিয়েছিলেন ; আমি যে সব ছোটোখাটো সন্তাদের কথা বললাম তাদের নিয়ে সে কাজ মোটেই নয়, তাদের সঙ্গে ওতে কোনো সম্পর্কই

ছিলনা। সেখানে প্রত্যক্ষভাবে আদানপ্রদান ঘটেছিল মনের জগতে. এ কথাটি না বুঝে তোমরা ভুল করছ। এমন ধরণের জিনিস তা একেবারেই নয়।

যদি তোমার তেমন প্রজ্ঞা থাকে, যথেষ্ট শক্তি ও সংযম থাকে, নিজেকে যদি সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় রাখতে পারো, তাহ'লে তখন একটা উচ্চস্তরে উঠে জেনেশুনে এবং স্বইচ্ছাতে হয়তো কাউকে কোনো কাজে সাহায্যদান করতে পারো ; কিন্তু তার জন্য বৃহৎ রকমের চেতনা ও প্রচুর আত্মশাসন থাকা দরকার, যা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তেমনি আবার অনেকটা আন্তর প্রসার ঘটলে তবেই সেরূপ উচ্চস্তরে গিয়ে সেখানে কার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ঘটছে তা নিজেই দেখতে পাও, ইচ্ছা করেই সে অনুভূতিকে তুমি গ্রহণ করতে পারো. সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান ও পূর্ণ চেতনার সঙ্গে তুমি তার সঙ্গে কোনো কাজ করতে পারো। এমন খেলা সকলেই খেলতে পারে না। কিন্তু প্ল্যানচেট নিয়ে লিখতে বসা কি তার সঙ্গে সমান জিনিস হলো ? ওতে তুমি নিজেকেই প্রতারিত করো আর তারই ফলে দেখতে পাও যে সেটা নড়াচড়া করছে।

সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে ও সব খুব ভালো রাস্তা নয়। কারণ যেখানে আভ্যন্তরীণ জগৎ নিয়ে কথা, আত্মবিকাশ নিয়ে কথা, সেখানে এটা কেমন হয় জানো ? লোকের যে কারণে নভেল পড়ার দরকার হয়, এও কতকটা সেই রকম।

মন যাদের যথেষ্ট উন্নত হয় নি. তামসিক স্তরে থেকে এখনও যারা আধাআধি জড়ের অবস্থায় রয়েছে. তারাই নিজেদের মনকে খানিকটা চাঙ্গা ক'রে তুলতে নভেলগুলো পড়ে। একে খুব শ্লাঘা বা উন্নত অবস্থা বলা যায় না। আভ্যন্তরীণ উন্নতির সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা। যে ব্যক্তি এখনও আদিম অবস্থাতে রয়ে গেছে. আভ্যন্তরীণ জীবনের ঊর্ধ্বশিখা যার তীব্র হয়ে জ্বলেনি. তারই পক্ষে দরকার হয় এমন কিছু যাতে জীবনে একটু রঙ্গভাবের স্পর্শ মেলে. যাতে তাই নিয়ে মনের মধ্যে কিছু জাল বোনা চলতে থাকে। সেই ধরনের লোকরাই এই সব এক্সপেরিমেণ্ট করতে যায় আর মনে ভাবে যে খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু করছে। নভেল পড়া নিয়ে লেগে থাকাও তেমনি—তাও সাহিত্যিক নভেল নয়. সংবাদপত্রী নভেল।

শ্রীঅরবিন্দ নিজে আমাকে বলেছিলেন যে কারো কারো এটা দরকার হয়, কারণ তাদের মন এমনই অসাড় যে এতেই তারা খানিক নাড়া পেয়ে তবু একটু জেগে উঠতে পারে—এ হলো সেই একই জিনিস। কেউ কেউ এমন আছে যাদের ঘুমন্ত ও অসাড় প্রাণসত্তাকে খানিক জাগিয়ে তোলার জন্য এই সব প্রক্রিয়া করতে হয়, তবেই তাদের জীবনে কিছু উত্তেজনা আসে। কিন্তু তাই বলে একে কোনো প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান কাজ বলতে পারো না। বলতে পারো সময় কাটাবার খেলা কিংবা একরকম আমোদপ্রমোদ।

আর এই সকল জিনিস থেকে কারো কাছে কিছু আজ পর্যন্ত প্রমাণও হয় নি। কেউ কেউ হয়তো বলবে : "একটা অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব, কোথাও একটা আভ্যন্তরীণ রাজ্য

যে রয়েছে, এর থেকে তা জানা যায়। চোখে যাদের আর দেখছি না, তাদের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটাবার এ একটা কৌশল, এর থেকে নিশ্চয় বলে প্রমাণ হবে যে এখানকার বাইরে আরো একটা জগৎ রয়েছে।" কিন্তু সে কথা সত্য নয়।

তোমার নিজের অধ্যায় সত্তাটি যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা না দিচ্ছে, জেগে উঠে তা যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিজস্ব জীবন নিয়ে থাকতে সক্ষম না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সব জিনিস থেকে কোনো শিক্ষাই তোমার নিলবে না। এমন অনেকের কথাই আমি জানি, বিশেষ ক'রে তার মধ্যে একজনের কথা বলছি—লোকটি বৈজ্ঞানিক, চতুর, বেশ কাজের মানুষ, রীতিমত উচ্চ শিক্ষা পেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত; সে ছিল কোনো "প্রেততত্ত্ব" সমিতির একজন সদস্য, সে এমন একটি মিডিয়াম পেয়েছিল যার বাস্তবিক কিছু অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। লোকটি খুবই অনুসন্ধিৎসু। প্রত্যেক সভাতে উপস্থিত থেকে সতর্ক পর্যবেক্ষণের দ্বারা সে চেষ্টা করতো যাতে অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে প্রমাণ্য সত্যগুলি সংগ্রহ ক'রে সে ও-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যা কিছু দেখবার ছিল সবস্তই সে দেখলে—সকল খুঁটিনাটির দিকে নজর রেখে প্রত্যেক জিনিসের তাত্ত্বতন্ন নিয়ে বার বার পরীক্ষা করলে। যা কিছু অদ্ভুত সে দেখেছে সবস্তই আমাকে বলেছে। একটা জিনিসের টুকরো সে আমার হাতে দিলে, আজকাল যে প্লাস্টিক উঠেছে সেই ধরনের জিনিস—তার বুনন নেই—এ বলছি অনেককাল আগের কথা যখন প্লাস্টিক ওঠেনি—সেটা হাতে নিয়ে দেখলাম, খাসা ডিজাইন করা জিনিসের ছেঁড়া টুকরো। সেটা কোথা থেকে কেমন ক'রে পেয়েছিল তার কাহিনী আমাকে সে বললে। সেই ক্ষমতাপন্ন মিডিয়মটি যখন ট্রান্সের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তখন সেখানে দেখা দিল এক মূর্তি, আপাদমস্তক এইরকম জিনিস দিয়ে ঢাকা। একে বলে আত্মার বাস্তব রূপ নেওয়া। সেই মূর্তি যেমনি ওর কাছাকাছি এলো, অমনি ও চালাকি ক'রে তার আবরণের প্রান্ত থেকে একটুখানি ছিঁড়ে নিলে, তার একটা প্রমাণ রাখবার উদ্দেশ্যে।...সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়মটি কিন্তু চিৎকার ক'রে উঠল, আর সমস্ত জিনিসটা অমনি মিলিয়ে গেল। কিন্তু টুকরোটি রয়ে গেল ওর হাতে, সেটাই আমাকে সে দেখতে দিয়েছিল। দেখে আমি সেটি তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

এ ব্যাপারে সন্দেহ করবার কিছু নেই, নয় কি, যেহেতু টুকরোটি এখনও রয়েছে। একে ভ্রান্তদৃষ্টি বলা চলেনা। কিন্তু দেখ, এই সব দেখেশুনেও, আর বই পড়ার মতো অদ্ভুত গল্প প্রত্যক্ষ করেও তার কিন্তু বিশ্বাস আসেনি। যা দেখেছে তার নিজেই কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারেনা, সে বলে সে নিজেই পাগল কিংবা তারাই পাগল কিংবা...জিনিসটা যাই হোক কিন্তু জ্ঞাননাভের দিকে তাকে আধখানা ধাপও এগিয়ে দেয়নি।

পূর্ণ বিশ্বাস তুমি তাকেই করতে পারো যা তোমার নিজের মধ্যে এসেছে।

বাইরের প্রমাণ কখনই জ্ঞান দিতে পারেনা। নিজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিকাশ ঘটলে, কোনা কিছুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ রকমের আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ স্থাপিত হলে, তবেই নিজের

থেকে তুমি জানবে সে কেমন জিনিস। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জ্ঞানের সত্তাটি তোমার মধ্যে না জাগছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বাস্তব প্রমাণই দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ জ্ঞান এনে দিতে পারেনা।

আভ্যন্তরীণ সত্তাটি যাদের রয়েছে, জীবন তাদের একদিন না একদিন জাগিয়ে দেবার ভার নেবে, আর সময় মত যোগাযোগ এনে উপস্থিত করবে, যখন যা জানবার দরকার হবে তখন তা ঠিকই তারা জানবে। কিন্তু এই সব ব্যাপারের সম্পর্কে আপাতত এইটুকু বলা চলে যে ওগুলোর কোনো দাম নেই।*

---

* বুলেটিন থেকে। অনুবাদক—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য।

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[দ্বিতীয় পাদ—সম্যক্-জ্ঞানযোগ]

৫

বৈরাগ্য

সত্যের সঙ্গে মিথ্যা জড়িয়ে আছে জীবনে। সত্যার্থীকে এই মিথ্যার জাল হতে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। সত্যের অনুভব আকাশবৎ—তেমনি পরিব্যাপ্ত প্রশান্ত স্নোজ্জ্বল এবং প্রসন্ন. সবাইকে ছাপিয়ে থেকেও সবাইকে জড়িয়ে আছে। এই অনুভবকে যা আচ্ছন্ন ক্ষুব্ধ বা পীড়িত করে. তা-ই মিথ্যা। মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করবার শক্তি আসে বৈরাগ্য থেকে. যেমন বুদ্ধির স্বচ্ছতা এবং চেতনার একাগ্রতা থেকে অনপেক্ষ সত্যের অনুভব আমাদের মাঝে জোর ধরে। বৈরাগ্য পূর্ণসিদ্ধির অপরিহার্য সাধন।

কিন্তু বৈরাগ্য বলতে কি বুঝব? তার অধিকার কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে? বৈরাগ্য কি শুধু সাধন (means). না তা সাধ্যও (end)?

যেসমস্ত সাধনায় নেতিবাদ প্রধান. তাদের মতে বৈরাগ্যই হল সাধ্যাবধি। তারা বলে, জগৎ আর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করতে পারলে পরমসত্যের মুখামুখি হওয়া যায় না। জীবনে পেয়েছি কি?—শুধু দুঃখ. শুধু ঝামেলা. শুধু পরাভবের গ্লানি। নির্ভেজাল সুখ কোথাও পাইনি। সংসারের কোনও সুখই তো শাশ্বত বা পরম নয়। যে মূঢ় সে তা নিয়ে ভুলে থাকতে পারে. কিন্তু বিবেকী পারে না। 'সর্বং দুঃখং বিবেকিনঃ'—বিবেকীর কাছে কৈবল্যের নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি ছাড়া আর সবই দুঃখময়। যে-আকাশ পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে, তার বায়ুমণ্ডল দূষিত; অন্তরিক্ষের আকাশে মেঘ আর ঝড়ের হানাহানি; দ্যুলোকের আকাশেও এই আলো এই আঁধার। অতএব সব ছাড়িয়ে চলে যাও অনন্তিমবৎ বিশুদ্ধ অস্তিত্বের নির্বর্ণ আকাশে। এই পরিনির্বাণই পরম সত্য। এই হল চেতনার সাধ্যাবধি। সুতরাং গুণবৈতৃষ্ণ্যরূপ পরবৈরাগ্যই হল বিবেকীর সাধন এবং সাধ্য দুই-ই।

*

কিন্তু পূর্ণযোগীর কাছে বৈরাগ্য অধ্যাত্মসিদ্ধির সাধনমাত্র, সাধ্যাবধি নয়। অপরা-প্রকৃতির সম্মোহ আর বিকারের ঘোর কাটিয়ে ওঠবার জন্য বৈরাগ্যের দরকার, একথা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু যে-বৈরাগ্য জীবনকে আর জগৎকে নস্যাৎ করে দেওয়াকেই পরম

পুরুষার্থ বলে মনে করি, তাকে তিনি মানতে পারেন না। দুঃখের চেতনা আছে এবং তা হেয় —একথা সত্য। কিন্তু চেতনাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে দুঃখ ঘোচাতে হবে, সমস্যার এই সর্বনাশা সমাধানে তাঁর সায় নাই। সংসারে এলেই দুঃখ পেতে হবে, অতএব আর যেন এ-সংসারে না আসতে হয়—এ-বুদ্ধি কাপুরুষের। যে নির্বীর্য, দুঃখ তারই চেতনাকে অবসন্ন করে। বীরের কাছে দুঃখ অপরা-প্রকৃতির একটা বালসাটের মত, তা তার চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধই করে। এইখানে দুঃখের সার্থকতা। উদ্‌বুদ্ধ চেতনা দুঃখকে শুধু পরাভূতই করে না, তাকে আনন্দে রূপান্তরিতও করতে পারে।

তাছাড়া সম্যক্ সম্বুদ্ধের মাঝে দুঃখ ধরে করুণার রূপ। অধ্যাত্মসিদ্ধির পরম তাৎপর্য যদি হয় চেতনার বিস্ফারণ, তাহলে আমার সম্বুদ্ধ চেতনা হতে জগৎকে আমি কিছুতেই ছেঁটে ফেলতে পারি না। জগতের সুখ-দুঃখ তখন আমারই সুখ-দুঃখ। শুধু এইটুকু তফাত, জগৎ যেখানে আচ্ছন্ন আমি সেখানে জাগ্রত, জগৎ যেখানে অবশ আমি সেখানে স্ববশ। আমি আত্মবীর্যের দ্বারা দুঃখের উর্ধ্বে উঠেছি 'জগদুদ্ধিষীর্ষুঃ'—জগৎকেও সেই ঊর্ধ্বভূমিতে উঠিয়ে নেবার জন্য। সুতরাং আত্মমুক্তিতেই আমার সাধনা শেষ হয়ে যায় না, তারও পরে থাকে বিশ্বমুক্তির দায়। আর সে-দায়কে আমি মাথায় তুলে নিই তারই দিব্যসঙ্কল্পের বাহন হয়ে। বিশ্বপ্রাণের মর্মে রয়েছে সে-সঙ্কল্পের প্রেষণা, জড়ত্বকে তা বিচিত্র উপায়ে রূপান্তরিত করে চলেছে চিদ্‌বীর্যে। বিশ্বেশ্বরের এই 'জ্ঞানময়ং তপঃ'র আমিও শরিক। এই ভাবনা হতেই জগতের দুঃখবীজ সম্যক্-সম্বুদ্ধের চেতনায় ধরে অনোঘবীর্য মহাকরুণার রূপ।

তারপর সংসারের গতিটা শুধু চক্রাবর্তন নয়, বস্তুত তা কম্বুরেখ (Spiral)। চেতনার ক্রমিক উন্মেষ যেমন ব্যষ্টির জীবনে হচ্ছে, তেমনি সমষ্টির জীবনেও হচ্ছে। সুতরাং সংসার শুধু অবিদ্যা আর দুঃখের ক্ষেত্র এবং চিরকাল তা-ই সে ছিল, ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবে—একথা অশ্রদ্ধেয়। অচিতির ভিত্তি হতে পরমচেতনার ক্রমিক প্রকাশ—এই হল সংসার গতির আসল তাৎপর্য। দুঃখ সে-প্রকাশের একটা অশাশ্বত মধ্যপর্ব মাত্র। দুঃখ বস্তুত চেতনার তপোবীর্যেরই একটা তির্যকরূপ। তার লক্ষ্য আনন্দে উত্তরণ। সমস্তটা জগৎ চলেছে এক আনন্দচিন্ময় ভূমির দিকে। আমার আত্মচেতনোর আকৃতি হতেই তা টের পাই। সুতরাং আমার সাধনা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। এইজন্যই শুধু আমাকেই পাওয়া নয়, আমার মাঝে সবাইকে পেয়ে তবেই আমার পাওয়ার সার্থকতা।

সুতরাং এমনি করে পাওয়ার জন্যই পূর্ণযোগীর বৈরাগ্যের সাধনা শুধু বৈরাগ্যের জন্যই বৈরাগ্যের সাধনা নয়। অথচ তাঁর বৈরাগ্য নিশ্চয় পূর্ণবৈরাগ্য। তার মাঝে যেমন সংসারে আসক্তি নাই, তেমনি নির্বাণেও আসক্তি নাই। ভব আর নির্বাণ তাঁর কাছে এক।

*

এতেই বোঝা যায়, বৈরাগ্য শুধু কৃচ্ছ্রতা বা নিষ্কিঞ্চনতার উপাসনা নয়। তার সত্যকার স্বরূপ হল অনাসক্তি। অনাসক্তি অন্তরের ধর্ম। প্রাকৃত চেতনায় তিনটি গ্রন্থি আছে—বাসনা সংস্কার আর অহন্তার। আসক্তির মূল এদের মাঝে। বৈরাগ্যের ভাবনার দ্বারা আসক্তিকে উৎখাত করতে হবে।

বাসনা প্রাণের ধর্ম। প্রাণ চায় ভোগ আর ঐশ্বর্য। ভোগে রসচেতনার তর্পণ হয়, আর ঐশ্বর্যে শক্তিচেতনার। রস আর শক্তি হেয় নয়, বস্তুত প্রপঞ্চোল্লাস রস আর শক্তিরই খেলা। কিন্তু প্রাকৃত চেতনায় আমরা তাদের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে পাই না। অবিশুদ্ধির দুটি কারণ—একটি চিত্তের বস্তুনির্ভরতা, আরেকটি অবিবেক। আমরা সাধারণত মনে করি, রস আর শক্তির যোগান আসে বাইরে থেকে; আর তাইতে বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে যাই। কিন্তু রস আর শক্তি আমার অনুভবে। অনুভব বস্তুকে উপলক্ষ্য করে দেখা দিলেও তা বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারে। অনুভবের জগৎ ভাবের জগৎ। আর ভাব বস্তুর অতিরেক। বস্তুকে ছাপিয়ে ভাবে যখন প্রতিষ্ঠিত হই, তখন বস্তু আমার বশে আসে। ভোগ আর ঐশ্বর্য তখন অবশ নয়, স্ববশ। যিনি উপদ্রষ্টা, তিনিই যথার্থ 'ভোক্তা মহেশ্বরঃ'। তাঁর ভোগের আনন্দ উপচে পড়ে আত্মশক্তির উল্লাস হতে। এই ভোগ আর ঐশ্বর্য অকামহত স্বভাবের স্ফুরণ।

প্রাকৃত চেতনার আরেকটি গ্রন্থি হল সংস্কারের অন্ধতা। এটি মনের ধর্ম। মনের মতুয়ারি (dogmatism) জ্ঞানযোগের একটা মস্ত বাধা। আমি যা বুঝেছি তার বাইরে আর-কিছুই বুঝতে চাইব না—এরই নাম অবিদ্যা। আর বিদ্যার মুখোস প'রে আসে বলে এ-অবিদ্যা আরও সর্বনাশা। বিদ্যা আলোর মত। তার মাঝে সঙ্কোচ নাই, একদেশিতা নাই। সব রংই তার রং, অথচ নিজে সে রঙচুট। সংস্কারমুক্ত মনও তা-ই। যত মত যত পথ সবাইকে সে আপন করে নেয়, কিন্তু কোনটাতেই বাঁধা পড়ে না।

প্রাণ আর মনের অশুদ্ধির কারণ রয়েছে আরও গভীরে—আমাদের অহন্তার মাঝে। অহন্তাই হল চেতনার আসল গ্রন্থি। একদিকে অহং, আরেকদিকে আত্মা—বলা যেতে পারে চেতনার যেন কুমেরু আর সুমেরু। একটিকে চিনি, আরেকটিকে চিনি না। চেনার জগতে আছে মূঢ়তা, ক্লেদ আর দ্বন্দ্ব, ক্বচিৎ আলো আনন্দ আর শক্তির ঝলক। কিন্তু সব-পেরেছির দেশ সে নয়। সে-দেশের জন্য মন কাঁদে, কিন্তু কোথায় সে আছে তা জানি না।

অথচ আছে এই প্রাকৃত চেতনারই উল্টা পিঠে। চেতনার প্রবৃত্তিতে অহন্তা, নিবৃত্তিতে আত্মচৈতন্য। হাঁসফাঁস করি, বাইরের দিকে ছুটে যাই প্রকৃতির তাড়নায়—এর মূলে আছে অহং। এই অহংই আবার ভিতরের দিকে গুটিয়ে গিয়ে নিথর হয়ে যেতে পারে। তখন ফোটে আত্মচৈতন্য—ছায়াছবির পিছনে আলোর পরদার মত। চুপ থেকে দেখি, ঐ আলোই বাইরে ঠিকরে পড়ছে বর্ণের বৈচিত্র্যে। অহংএর প্রবৃত্তির মূলে আত্মচৈতন্যেরই প্রেষণা। অথচ নিবৃত্তির পথ না ধরলে অহং তার সাক্ষাৎ পায় না।

আত্মচৈতন্যের আবেশে অহং রূপান্তরিত হয় চৈত্যসত্ত্বে। তখন আর তার মাঝে প্রমাদ দুঃখ বা অশক্তির বেদনা থাকে না। চৈত্যসত্ত্ব অন্তর্যামীর প্রতিভূ, চলে তাঁরই প্রশাসনে। তাই স্বভাবতই সে বস্তুনির্ভর নয়, ভাবনির্ভর। বস্তুর উপর যে নির্ভর করে, তার বন্ধন পদে-পদে। বন্ধনের বেদনা আছে, তবুও তাকে সে ছাড়তে পারে না। এরই নাম আসক্তি। বস্তুর মূলে ভাবকে যে আবিষ্কার করেছে, সে আপনাতে আপনি থাকতে পারে। তার আসক্তি নাই, বন্ধনও নাই। সে স্ব-স্থ। স্বাতন্ত্র্যেই বৈরাগ্যের পর্যবসান।

*

আসক্তির মূলে এই-যে অহন্তা, কত সূক্ষ্ম ছলনাই যে তার আছে তা বলবার নয়। যতক্ষণ 'আমি আমি' করছি, ততক্ষণই বিষয়ে জড়িয়ে যাচ্ছি—জড়িয়ে যাচ্ছি পাপে-পুণ্যে, সুখে-দুঃখে, ভালো-মন্দের হাজার ঝামেলায়। গীতায় দেখি, অর্জুন একবার বলছেন, ওরা অন্যায় করছে, ওদের আমি মারব ; আবার বলছেন, না ওরাই আমায় মারুক, আমি সব ছেড়ে চলে যাব। দুটাই প্রাকৃত বুদ্ধির কথা। একটার মূলে আছে রাজসিক ক্ষোভ, আরেকটার মূলে তামসিক অবসাদ। শেষেরটাই মারাত্মক, অহন্তা সেখানে এসেছে নৈষ্কর্ম্যের মুখোস প'রে। এই তামসিকতাকে শ্রীকৃষ্ণ তীব্র আঘাত করলেন। বললেন, 'এ তোমার ক্লৈব্য, তোমার হৃদয়দৌর্বল্য। মুখেই তুমি প্রজ্ঞার বুলি আওড়াচ্ছ, কিন্তু প্রজ্ঞার লোকোত্তর প্রশান্তি তোমার মাঝে কোথায়? নিজের ছোটুট আমিটিকে বসিয়েছ বিশ্বের কেন্দ্রে, আর সেইখান থেকে বিচার করছ, বলছ এ করব আর এ করব না। যে লোকোত্তর অবিনাশী সত্তার মাঝে এ-জগৎ, তাকে দেখতে পেতে যদি, তাহলে এ-কার্পণ্য ধর্মাধর্ম আর কর্ম-নৈষ্কর্ম্যের এ-দ্বন্দ্ব তোমার থাকত না।'

এই হল আসল কথা। লোকোত্তরের মাঝে লোককে, অনন্তের মাঝে সান্তকে, আত্মার মাঝে অহংকে রেখে জগৎকে দেখতে শিখতে হবে। তাহলেই দৃষ্টির সত্য আর সৃষ্টির সত্য এক হবে। 'আমি' কি নাই? আছে। কিন্তু আছে তাঁর হয়ে। তিনি প্রয়োজক, আমি নিমিত্ত—এই হল সত্যের সম্বন্ধ। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরছে—তা নয়; সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ঘুরছে। এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই বৈরাগ্য সহজ হয়, কেবলতর হয়।

গীতার শিক্ষা, ত্যাগ বাইরে নয়, অন্তরে। বিষয় ছাড়লে বা কর্ম ছাড়লে কিছু হবে না, যদি আমার আমিটিকে না ছাড়তে পারি। আমার আমি যেখানে অনাসক্ত, সেখানে কর্ম(ও) ভোগ কিছুই আমায় বাঁধতে পারে না। বন্ধন কাকে বলি? চেতনার সঙ্কোচকে। আমার এই ক্ষুদ্র আমিটিকে নিয়ে পড়ে থাকার চাইতে বিড়ম্বনা আর নাই, যদিও এটা বুঝতে সময় লাগে। চেতনার বিস্ফারণে আমিত্বের প্রসার ঘটে, এই আমাই হয় ব্রহ্ম। তখন দেখি, এক আমিই আছে, সে-আমি তিনি। বিশ্বব্যাপী প্রজ্বলন্ত বৈশ্বানরের এক আমি, আর সব আমি তারই স্ফুলিঙ্গ। সে-আমি বিশ্বের ভূতে-ভূতে, সে-আমি বিশ্বের অতীতে,

সে-আমি আমার এই আমিতে। সে-আমিই সব-কিছুর দ্রষ্টা ভোক্তা এবং কর্তা, এ আমি শুধু চেয়ে আছে সে-আমির পানে। চেয়ে থাকতে-থাকতে আবার চোখ বুজছে, অনুভব করছে ঐ-দৃষ্টির আলোতেই এ-সৃষ্টি ফুটছে ফুলের মত। সিন্ধুর একটি বিন্দুতে সমগ্র সিন্ধু কল্লোলিত হয়ে ওঠে তখন। এ কার অনুভব, কে বলবে?

এমনি করে তাঁর জ্ঞানে সে-জ্ঞান, তা-ই হল সম্যক্-জ্ঞান।

*

কৃচ্ছ্রতা আত্মনিগ্রহ বা বর্জনবুদ্ধির উপাসক যে-বৈরাগ্য, তা হ'ল কাঁচা বৈরাগ্য। অবশ্য সাধনার প্রথম অবস্থায় এরও প্রয়োজন আছে। বারবার বাইরে ছুটে যাওয়া, বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া—এগুলি মনের কতদিনকার অভ্যাস। এ-অভ্যাসের মোড় ফেরাতে প্রথমটায় মনের উপর জোর করতে হয় বই কি। তাছাড়া আছে ভাবের ঘরে চুরি হবার ভয়। ভাবছি, কোথাও আমার আসক্তি নাই। কিন্তু চেতনার গভীরে রসতৃষ্ণা লুকিয়ে আছে কি না কি করে বলব? সংস্কার একদিনে যায় না। চিত্তের অতলে তার শিকড় বেশ রয়েছে। তাকে একেবারে উপড়ে ফেলা সহজ নয়। নিষ্কিঞ্চন শূন্যতায় স্থিতি যতক্ষণ না সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ বলতে পারব না যে কোথাও আমার আসক্তি নাই। তাই নিজেকে যাচাই করবার জন্যই কৃচ্ছ্রতারও প্রয়োজন হয় বই কি।

কিন্তু কৃচ্ছ্রতাই শেষ নয়, কেননা সম্যক্‌সিদ্ধি তো একটা নেতিবাচক সংজ্ঞা নয়। অল্পকে ছাড়ছি ভূমাকে পাব বলে। আবার সেই ভূমাও অল্পেরই সার সত্য। চিনির রস যে পেয়েছে, তার আর চিটাতে মন মজে না। এই হলেই তবে বৈরাগ্য পাকা হতে পারে। তার আসল সঙ্কেত হচ্ছে অন্তর্মুখীনতার দিকে। বিষয়ভোগে রস আছে অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু রসবোধ তো চেতনারই ধর্ম। বিষয়কে ছেড়েও চেতনায় তার স্থিতি সম্ভব। এই স্থিতিকালটুকুকে বাড়াতে পারলে ক্রমে নির্বিষয় রসাস্বাদও সম্ভব হয়। এই হল আত্মস্থিতির আনন্দ, বৈরাগ্য-সাধনারও সিদ্ধি। গীতার ভাষায়, ইন্দ্রিয় তখন আত্মবশ হয়ে বিষয়ে বিচরণ করছে, তার রাগও নাই দ্বেষও নাই, আছে শুধু নিজেকে বৃহতের অধীন করে দেওয়ার প্রসন্নতা।

যেমন ব্যাবহারিক প্রসন্নতা, তেমনি আবার পারমার্থিক প্রসন্নতাও আছে। বৈরাগ্য-সিদ্ধির সে হল আরেক দিক। বৈদান্তিক বলেন 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগের' কথা। অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণা ছাড়তে হবে যেমন এখানে, তেমনি ওখানেও। বাইরের বিষয়কে ভিতরে টেনে এনে সূক্ষ্মভাবে ভোগ করা—এও এক ধরনের বিষয়তৃষ্ণার তর্পণ। রসের সাধনা যারা করে, এই তাদের এক বিপত্তি। উপনিষদ বলছেন, যেমন বিত্তৈষণা ছাড়তে হবে, তেমনি ছাড়তে হবে লোকৈষণাও। লোক হল চেতনার যে-কোনও অপ্রাকৃত ভূমি। তার প্রলোভনও সাধককে ছাড়তে হবে। পথের শেষে না পৌঁছন পর্যন্ত কোথাও খুঁটি গেড়ে বসলে তার চলবে না। আর যেখানে শেষ, সেখানে সব-কিছুরই শেষ—যেমন আঁধারের,

তেমনি আলোরও। 'ন দিবা ন রাত্রিঃ, ন সন্ন চাসৎ'—সেখানে দিনও নাই রাতও নাই, সৎও নাই অসৎও নাই। অথচ সেই নিরালোকের আলোতেই সব-কিছু ভাসছে। ঐ অগমলোকে না পৌঁছন পর্যন্ত সহজ প্রসন্নতায় সব-কিছুকে গ্রহণ করবার অধিকার জন্মায় না। 'সব ছেড়ে সব পাওএ'। যেমন তিনি। সবাইকে ছাপিয়ে আবার সবাইকে জড়িয়ে আছেন। ছাপিয়ে থাকার দিক থেকে বৈরাগ্য, আবার জড়িয়ে থাকার দিক থেকে ঐশ্বর্য। দুয়ে তো কোনও বিরোধ নাই।

৬

সাধনসমন্বয়

একাগ্রতা আর বৈরাগ্যের কথা সাধারণভাবে আলোচিত হল। কর্ম জ্ঞান বা ভক্তি, সব পথেই যে এ-দুটি অপরিহার্য, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখতে হবে, জ্ঞানের সাধনায় এদের বিশিষ্ট প্রয়োগ হবে কেমন করে।

'আত্মানং বিদ্ধি'—আত্মাকে জান, এই হল জ্ঞানসাধনার গোড়ার কথা। সংসারে জড়িয়ে থেকে আমার যে-পরিচয়, তা কখনও সত্য নয়, বৃহৎ নয়। আমি এখন আচ্ছন্ন আর্ত অশক্ত; অথবা আমি মলাক্ত মূঢ়তায় অসত্যকে-স্পর্শী। আকাশের মত প্রশান্ত প্রভাস্বর প্রসন্ন উদার চেতনা আমার নাই। তাই বাইরে-ভিতরে আমার এত বিক্ষোভ, এত দ্বন্দ্ব। কি করে দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে গিয়ে আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, সেই হল আমার জীবনের প্রধান সমস্যা।

সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজা চলে। কিন্তু সে-পথ আমরা ধরতে চাই না। বনে গেলেও মন আমার সঙ্গে যাবে, তার মূঢ়তা আর বৈকল্যকে ঠেকাব কি করে? সুতরাং বোঝাপড়া করতে হবে আগে নিজের সঙ্গেই, সংসারের সঙ্গে নয়। আমাকে যে ক্ষুব্ধ করে, তার বিরুদ্ধে আমার নালিশ নাই। নালিশ আমার নিজেরই বিরুদ্ধে: আমি কেন ক্ষুব্ধ হই? ক্ষোভের কারণ হ'ল চেতনার সঙ্কোচ। একটা ডোবাতে ঢিল ছুঁড়লে তার জলে তোলপাড় শুরু হয়, আর মহাসমুদ্রে জাহাজডুবি হলেও কিছু হয় না। এই সমুদ্র-চেতনা আমারও গভীরে রয়েছে। কিন্তু দৃষ্টি বহির্মুখ বলে আমি তার অনুভব পাই না। আমার অষ্টপ্রহরের কারবার হল বাইরের জগৎটা নিয়ে, আর আমার সীমিত দেহ-প্রাণ-মন দিয়ে। বাইরের অভিঘাতে তাদের মাঝে যে-তরঙ্গ উঠছে, তা-ই হল আমার প্রাকৃত চেতনার স্বরূপ। প্রায়ই তার পরিণাম উত্তেজনা আর অবসাদ—ক্বচিৎ-বা উদ্দীপনা। কিন্তু কোনটাই একটা বড়-কিছু নয়।

যা বৃহৎ, তা হল ঐ আকাশ। এই দেহ-প্রাণ-মনকে ছাপিয়ে। তাহলে এরা কি মিথ্যা? মিথ্যা নয়, কিন্তু ঐ আকাশকে আশ্রয় করেই এদের পরম সত্যতা। দেহবোধে চেতনা তীক্ষ্ণ হয়, কিন্তু দাবায় তার বৈপুল্য, তার সাবলীলতা। উত্তাল প্রাণে উত্তেজনা আছে, কিন্তু ভোরের আলোর মত ছড়িয়ে-পড়ে-উপচে-ওঠা স্বাতন্ত্র্য তার মাঝে কই? মন ভাবনার জাল বুনে চলেছে, নিজের জালে নিজেই বন্দী হয়ে আছে গুটিপোকার মত, প্রজাপতির পাখা তার কই? দেহ-প্রাণ-মন তাই বন্ধন, যতক্ষণ ঐ আকাশকে না পাচ্ছি।

দেহ-প্রাণ-মন নিয়েই প্রাকৃত জীবনের ভক্ত। তিনটিতে ওতপ্রোত চেতনা তিনটির মাঝেই অনুস্যূত হয়ে চলেছে। আবার অধিকারভেদে একেকটার উপর ঝোঁক পড়ছে বেশী। জীবনের বনিয়াদ হল 'আমি দেহ'—এই বোধ। কিন্তু এই দর্শনকেই যদি একান্ত করে তুলি, তাহলে মনে হবে, যতটুকু দেহ ততটুকুই আমি, যতক্ষণ দেহ ততক্ষণই আমি, দেশ বা কালের ব্যাপ্তিতে অসীমের চেতনা আমার কাছে একটা আলেয়া। অধিকাংশ মানুষেরই দৃষ্টি দেহকে ছাপিয়ে আর ঘুরে যেতে চায় না। এই হল আধ্যাত্মিক জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ। আত্মচৈতন্যের এ হল শৈশব।

চেতনা আরেকটু স্বচ্ছ হলে তার মাঝে প্রাণের ছোঁয়া লাগে। দেহধর্মের গতানুগতিকতায় মানুষ আর তখন বাঁধা থাকে না, নিত্য-নতুন রূপায়ণের উল্লাস জাগে তার মাঝে। নিজেকে সে অনুভব করে প্রাণ বলে। প্রাণের অনুভব যদি দেহকে ছাপিয়ে না উঠতে পারে, তাহলে মনে হয়, যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণই প্রাণের উল্লাস, মরলেই সব ফুরিয়ে গেল। আর দৃষ্টি একটু অন্তর্মুখ হলে সে দেখে প্রাণের এক অবিচ্ছেদ প্রবাহে জন্মজন্মান্তর ধরে একই জীবসত্বের আবর্তন। এই হল প্রাণাত্মবাদ। তাকে বলতে পারি আত্মচৈতন্যের কৈশোর।

চেতনা আরও স্বচ্ছ হলে প্রাণের পিছনে ফোটে মনের আলো। মনকেই তখন অনুভব হয় আত্মভাবের বনিয়াদ বলে। প্রাণাত্মবাদের মত মন-আত্মভাবনারও দুটি স্তর আছে। এক স্তরে মন জড়িয়ে থাকে দেহের সঙ্গে, দেহ পড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার ও ভাবনা বেদনার অবসান হয়। আরেক স্তরে মনশ্চেতনার অবিচ্ছেদ প্রবাহে আবার চলে জন্মজন্মান্তের আবর্তন। তাছাড়া মন-আত্মবাদের আরও-একটা ধারা আছে। যাঁরা মনকেই চেতনার সর্বস্ব বলে জানেন, তাঁরা অমনীভাব বা মনোলয়কেই ভাবেন পরম পুরুষার্থ। এদেশের নিরোধবাদী দার্শনিকদের মধ্যে এ-ভাবনাটা খুবই প্রবল। মন-আত্মবাদকে বলতে পারি আত্মচৈতন্যের তারুণ্য।

দেহ-প্রাণ-মন মিথ্যা নয়, অতত্ত্ব নয়। তাদের ব্যক্তিগত বা বিশ্বগত দুটি রূপ আছে। দুটি রূপই সত্য। দেহ-প্রাণ-মনের চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষ ঘটছে এ-ও সত্য। কিন্তু আমাকে যদি আমি দেহ-প্রাণ-মনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ভাবি এর বাইরে আর কিছুই নাই, তাহলে সেটা ঘোর মিথ্যা। সাংখ্যের ভাষায় এই মিথ্যাভাবনাকে বলে অবিবেক

(identification)। অবিবেক হল অবিদ্যা, নিজেকে পুরাপুরি না জানা। আমি শুধু দেহ প্রাণ বা মন নই, আমি তারও অতীত কিছু, আমি চৈতন্যস্বরূপ, আমি আত্ম-স্বরূপ, দেহ-প্রাণ-মন সেই চৈতন্যেরই বিভূতি—এই হল বিদ্যা, নিজেকে সত্য করে জানা। দেহ-প্রাণ-মনের ভিতর দিয়ে চেতনা প্রকাশ পাচ্ছে গুণীভূত হয়ে—দেহচেতনায় তমোগুণ, প্রাণচেতনায় রজোগুণ, মনশ্চেতনায় সত্ত্বগুণ। কিন্তু প্রাকৃত দশায় সব গুণই ব্যাবিদ্ধ। মনের সত্ত্বগুণের মাঝেও তামসিক অবসাদ আর রাজসিক উত্তেজনার ভেজাল আছে। তাই সাধনার প্রথম লক্ষ্য হবে মনকে শুদ্ধসত্ত্ব করা। তখন আর তাকে মন না বলে উপনিষদের ভাষায় বলতে পারি বিজ্ঞান। আত্মচৈতন্যের বোধ হয় এই বিজ্ঞানেই।

★

বিষয়কে জানছি, চলতি কথায় তাকে বলে জ্ঞান; আর যে জানছে তাকে জানছি, তার নাম হল বিজ্ঞান। সুতরাং বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল অন্তরাবৃত্ত হয়ে বিশুদ্ধ আত্মবোধে স্থিত হওয়া। এ-বোধ শুদ্ধ অস্তিত্বের বোধ, আলোর মতই রংচুটা। তার দিকে চিত্তকে একাগ্র করতে গিয়ে সব শূন্য হয়ে যায়, চেতনা বিষয়ের দিকে প্রবর্তিত না হয়ে পরাবর্তিত হয় নিজেরও উপরে। তখন বাইরে-ভিতরে কোথাও কিছু থাকে না।

এই অবস্থায় পৌঁছবার জন্য সাধারণত দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়—একটি নেতি-ভাবনা, আরেকটি নিরোধের সাধনা। নেতিভাবনা হল বিচারের পথ। আত্মবোধ যা-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে, তা থেকে তাকে তফাত করতে হবে। তার প্রথম ধাপ হল দেহ থেকে তাকে পৃথক করা, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ভাবনা করা—'আমি দেহ নই'। এমনি করে ভাবনাকে ক্রমসূক্ষ্ম এবং অন্তর্মুখ করে অনুভব করা—'আমি প্রাণ নই, ইন্দ্রিয় নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমি নিজবোধরূপ শুদ্ধ সন্মাত্র।' এমনি করে জগৎ হতে পরাবৃত্ত চেতনাকে বিশুদ্ধ সত্তায় পর্যবসিত করে একেবারে ফাঁকা হয়ে যেতে হবে। নিরোধের সাধনা হল চিত্তকে প্রথম থেকেই সন্মাত্র অথবা শূন্যতার ভাবনায় একান্তভাবে লগ্ন করা, নিষ্পন্দ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ছাড়া আর কোনও বৃত্তিই তার মাঝে উঠতে না দেওয়া। চিত্তের প্রলয় হলে জগতেরও প্রলয় হবে, লোকোত্তরের অবর্ণ অনুভব ছাড়া আর-কিছুই তখন থাকবে না।

নেতিভাবনায় বা নিরোধ সাধনায় বিশ্বের প্রলয় হয়—ব্যক্তির কাছে। যেমন হয় আমাদের ঘুমে। এ-অবস্থায় যদি দেহ পড়ে যায়, তাহলে আত্মার ব্রহ্মনির্বাণ ঘটে, 'জলের বিম্ব জলে উদয় হয়ে সে মিলায় জলে'। কিন্তু দেহপাতের পূর্বে এ-অবস্থা থেকে ব্যুত্থান হওয়া খুবই সম্ভব। তখন নিরোধ সংস্কার প্রবল হওয়ার দরুন জগৎকে বাপসা বলে মনে হয়। জগৎ তখন মায়া, নামরূপের বিকারমাত্র, সত্য সেই অবর্ণ শূন্যতা।

এ-অনুভব সত্য, কিন্তু খণ্ডিত। তার খণ্ডত্বের হেতু চিৎশক্তির সম্পর্কে ধারণার অপূর্ণতায়। শুধু দ্রষ্টৃত্বই নয়, ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্বও চেতনার ধর্ম। ব্যক্তিগত সিদ্ধির

গরজে শেষের দুটিকে আমি বাদ দিতে পারি। ভোগ আর কর্ম নিরুদ্ধ হলে জগৎ থাকবে না, 'প্রপঞ্চোপশমনং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' হবে আমার অনুভব। কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্যের এ হল একদিক। তার আরেকদিকে রয়েছে প্রপঞ্চোল্লাস। সেখানে তাঁর ভোক্তৃত্ব এবং এবং কর্তৃত্ব অব্যাহত, তিনি বিশ্বপ্রকৃতির 'ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।' তিনিই সব-কিছু হয়ে আবার সব-কিছুকে ছাপিয়ে গেছেন। বিশুদ্ধ দ্রষ্টৃত্বে এই ছাপিয়ে যাওয়ার অনুভব হয়, কিন্তু সব-কিছু হওয়ার অনুভব বাকী থাকে। দুটিকে মিলিয়ে নিলে তবে আত্মানুভব এবং ব্রহ্মানুভবের পূর্ণতা।

*

উপনিষদে চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের কথা আছে। ব্রহ্ম বিরাট্, তিনি তৈজস, তিনি প্রাজ্ঞ, আবার তিনি প্রপঞ্চোপশম তুরীয়। এই প্রপঞ্চে তিনি বিরাট্, তিনিই সব-কিছু হয়েছেন—এই তাঁর বস্তুরূপ। আবার বস্তু তো শুধু বস্তু নয়, তার মূলে রয়েছে ভাব। তিনি সেই ভাবরূপও; তখন তাঁকে বলি তৈজস। বস্তু স্থূল, ভাব সূক্ষ্ম; দুয়ের মূলে রয়েছে কারণ বা শক্তি। বহির্বিশ্ব বা অন্তর্বিশ্বের মূলে চিৎশক্তির যে-প্রেষণা, তিনি তাও। বিশ্ব তাঁর শক্তিরূপ, তিনি তখন প্রাজ্ঞ। আবার শক্তির অধিষ্ঠান হল চৈতন্য—যা শক্তিতে উল্লসিত হয়, আবার শক্তিকে ছাপিয়েও থাকে। ব্রহ্মকে তখন বলি, বস্তু ভাব আর শক্তি এই তিনের অতীত তুরীয়।

এই চারটি বিভাবের যে-কোনও একটির উপর শুধু জোর দিলে সিদ্ধি পূর্ণাঙ্গ হয় না। পূর্ণযোগের তা লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যের অনুভব—আত্মাতে বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে, বস্তুতে ভাবে শক্তিতে এবং চেতনায়। অনুভব বিলোমক্রমে, আবার অনুলোমক্রমেও। সব ছাপিয়ে গিয়ে আবার সব হয়ে।

৭

দেহবশ্যতা হতে বিমুক্তি

বিবেকই হচ্ছে জ্ঞানযোগের মুখ্য সাধন। অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলতে বুঝি চেতনার সঙ্কোচ। এই সঙ্কোচের হেতু হল 'অবিবেক' অর্থাৎ অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা। দেহ প্রাণ হৃদয় মন এবং অহং—এই নিয়ে আমার আত্মপ্রকৃতি। এরা যখন আমার বশে থাকে না, এদের অন্ধতা এবং গতানুগতিকতা যখন আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তখন এদের বলি অপরা-প্রকৃতি। আত্মচৈতন্যকে একে-একে অপরা-প্রকৃতির কবল হতে মুক্ত করতে হবে, প্রকৃতির ঈশান হতে হবে, স্বরাট্ হতে হবে—এই হল জ্ঞানযোগের লক্ষ্য।

প্রথমত দেহবশ্যতা হতে চেতনাকে মুক্ত করতে হবে। দেহবশ্যতাকে প্রশ্রয় দেয় জড়বাদ, বিশেষত বৈজ্ঞানিক জড়বাদ। যদিও জড়কে বশে আনাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য, তবুও জড় নিয়ে কারবার করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে জড়োত্তর কোনও তত্ত্বকে তার ন্যায্য মর্যাদা দিতে সে নারাজ। আধিভৌতিক স্বাচ্ছন্দ্যই তার কাম্য, আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যের সাধনা তার মতে হয় নিষ্প্রয়োজন, নয় তো পাগলামি। ভোগোপকরণের প্রাচুর্য দিয়ে যদি দেহের সকল দাবি মেটাতে পারি তাহলে তাকে উপোসী রাখব কেন—এই তার মত। মানুষের দৃষ্টি যখন বাইরের দিকে ফেরানো থাকে, চেতনা যখন হয় একান্তই বস্তুনির্ভর, তখন এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বস্তুসাপেক্ষ স্বাচ্ছন্দ্য আর বস্তুনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য—দুয়ের মাঝে চেতনার উৎকর্ষের তারতম্য আছেই। জড়প্রকৃতিকে বশে আনা একটা পুরুষার্থ নিশ্চয়ই। কিন্তু আত্মপ্রকৃতিকে বশে আনাও একটা পুরুষার্থ এবং তার চাইতে বড় পুরুষার্থ, কেননা মানুষের মনুষ্যত্বের সত্যকার পরিচয় এইখানেই, ভোগে আর যোগে বাস্তবিকই কোনও বিরোধ থাকে না, যদি যোগী হয়ে ভোগ করতে পারি, শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে শক্তির উল্লাসকে মুক্তি দিতে পারি।

*

'আমি দেহ নই'—এমনিতর একটা দৃঢ় ভাবনা হল দেহবিমুক্তিসাধনার ভিত্তি। তার প্রাথমিক সাধন হচ্ছে দেহব্যাপারের প্রতি তটস্থ নিরপেক্ষতার ভাব। খাওয়া-শোওয়া চলা-ফেরা আরাম-আয়াস এগুলি নিয়ে অহরহ ব্যতিব্যস্ত থাকাটা যোগের অনুকূল নয়। তাবলে উপবাস নাম করে দেহকে পীড়ন করাও উচিত নয়। গীতায় আছে, আহারে-বিহারে নিদ্রায়-জাগরণে কর্মচেষ্টায় সাধককে যুক্ত থাকতে হবে, এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি বা পীড়াপীড়ি কোনটাই স্বাস্থ্যকর নয়। স্বাস্থ্য মানেই আপনাতে আপনি থাকা; গীতায় তাকেই বলা হয়েছে 'যুক্ততা'। নিরপেক্ষতার অর্থ তখন সনঙ্গ বা অবিক্ষোভ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা রোগ-জ্বালার আক্রমণ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু তা-ই নিয়ে সোরগোল করাটা জড়বুদ্ধির পরিচয়।

তারপর খাওয়া নিয়ে বাছবিচারের কথা। উপনিষদে আছে, আহারশুদ্ধি থেকে সত্ত্বশুদ্ধি হয়; গীতাতেও সাত্ত্বিক আহারের কথা পাই। সাধনার প্রথমটায় আহারনির্বাচনে সাবধান হওয়া প্রয়োজন হয়। কিন্তু কি বস্তু খেলাম তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে কি ভাব নিয়ে খেলাম। মাত্রা ঠিক রেখে নির্লোভ হয়ে খাওয়াটাই হল আহারশুদ্ধির গোড়ার কথা। আহার শুধু ক্ষুন্নিবারণ বা রসনাতর্পণের জন্য নয়; এ একটা যজ্ঞ, অন্নকে চিদগ্নিতে আহুতি দিয়ে অন্নময় চেতনার রূপান্তর ঘটানোই তার উদ্দেশ্য—এই বুদ্ধিতে আহার করাই ভাল। তারপর সব সময় অন্নগত প্রাণ হয়ে থাকাটাও একটা সংস্কারান্ধতা মাত্র। কেবল স্থূল অন্নই যে আমাদের আহার্য তা নয়। প্রাণ ও মনের সূক্ষ্মতর শক্তিকে আশ্রয় করে স্থূল আহারের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি কমিয়ে আনা যেতে পারে। সেকথা পরে হবে। আপাতত

এইটুকু জেনে রাখা ভাল, দেহের উপাদান জড় বলে তাকে জড়নির্ভর করে রাখাটা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

*

দেহবিমুক্তির সত্যকার সাধনা হল ভাবনা। দেহ শুধু জড় নয়, সে প্রাণময় মনোময় জড় —এই হল তার যথার্থ পরিচয়। দেহেরই মাঝে মনশ্চেতনার উন্মেষ ঘটে—এ-দৃষ্টি জড়-বাদের। কিন্তু মনশ্চেতনা একবার সুপ্রতিষ্ঠ হলে দেহের উপরেও তার প্রশাসন চলতে পারে, সুতরাং মনোময় পুরুষই দেহের নিয়ন্তা—এ-দৃষ্টি চিদ্‌বাদীর। বলা বাহুল্য, চিদ্‌বাদই হল যৌগিক ভাবনা ও সাধনার ভিত্তি।

ভাবনার প্রথম সূত্র হল দেহ শুধু জড় নয়, সে বোধের বাহন বা বোধরূপ—চেতনার এই সংস্কার উৎপন্ন করা। তার জন্য একই চেতনা মনে সাত্ত্বিক, প্রাণে রাজসিক আর দেহে তামসিক—এইভাবে আত্মপ্রকৃতির সব-কিছুকে চেতনারই বিভূতি বলে ধারণা করতে শিখতে হবে। আবার সেই ইন্ধন আর আগুনের উপমা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে পারি। ইন্ধনের মাঝে আগুন আছে, তার প্রকাশেই ইন্ধনের সার্থকতা। কিন্তু আগুনের প্রকাশ হতে গিয়ে ইন্ধনে প্রথমটায় ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। আগুন জোর ধরলে তার ধোঁয়া কেটে যায়, সমস্তটা ইন্ধনই আগুন হয়ে তাপ আর আলো ছড়ায়। এখানে ইন্ধনকে বলতে পারি দেহ, তাপকে প্রাণশক্তি, আর আলোকে চিৎশক্তি। দেহকে এমনি করে যোগাগ্নিময় করা, উদ্দীপ্ত শক্তি ও বোধের বাহন করাই হল দেহবিমুক্তির লক্ষ্য।

'আমি দেহ নই' এই নেতিভাবনার পরিপূরক হল 'আমি দেহের ঈশ্বর' এই ইতিভাবনা। আমি দেহের ঈশ্বর—চিদ্‌বিগ্রহরূপে। এই বোধটিকে পাকা করবার জন্যই প্রথমে নেতিভাবনা বিবেক আর প্রত্যাহারের প্রয়োজন হয়। বিবেক সুপ্রতিষ্ঠ হয় প্রত্যাহারে। প্রত্যাহারের অর্থ হল চেতনার মোড় বাইর থেকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। দেহটা নিয়ে ছটফট করছি, তার আরাম-ব্যারাম নিয়ে গোরগোল করছি—এটা হল দেহচেতনার অবিশুদ্ধ বহির্মুখ প্রকাশ। কিন্তু যোগাসনে নিস্পন্দ এবং স্বচ্ছ হয়ে যদি দেহকে অনুভব করতে যাই, তাহলে একটা স্থিরসুখময় বোধ দেহচেতনার অন্তরঙ্গ বিশুদ্ধপ্রকাশের পরিচয় পাই। এইটি হল প্রত্যাহারের দিক। প্রত্যাহারে যে-বোধের প্রকাশ হল, তাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারলেই দেহ থেকে বিমুক্ত বা বিবিক্ত আত্মচৈতন্যের প্রকাশ হয়। তখন অনুভব করি, আমি দেহ থেকে আলাদা, দেহ আমারই আশ্রিত, আমার উদ্দীপ্ত বোধের সে বাহননাত্র।

*

এমনি করে আত্মচৈতন্যকেই যদি দেহের অধিষ্ঠানরূপে ধারণা করতে পারি, তাহলে ক্রমে তার সমস্ত ক্রিয়ার উপরই বশীকার সম্ভব হতে পারে। তার প্রথম ধাপ হল তিতিক্ষার সাধনা, দেহের সুখ-দুঃখে নিজেকে অবিচলিত রাখা। খানিকটা তিতিক্ষা জীবনে সবারই দরকার হয়। কিন্তু তার শক্তিকে বাড়ানো যায়, যদি অন্তর্মুখীনতার দ্বারা অনুভবের কেন্দ্রকে

আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। আমাদের সমস্ত অনুভবই আপেক্ষিক। অন্তর্মুখ অনুভবকে যদি গাঢ় এবং জোরালো করা যায়, বাইরের অনুভব তাহলে আপনা হতেই ফিকা হয়ে আসে। আত্মানুভবের গাঢ়তার সঙ্গে ব্যাপ্তিবোধকে জুড়ে দিলে সাধনা আরও সহজ হয়। এখন মনে হচ্ছে, দেহের মাঝে আমি আছি। ব্যাপ্তিবোধে মনে হবে, আমার মাঝে দেহ রয়েছে, আমি আকাশবৎ। যেমন আকাশে আদিত্যের মণ্ডল, তেমনি আমার ব্যাপ্তিচৈতন্যের মাঝেই আত্মবোধের চিদ্‌ঘনতা।

এই ভাবনায় আমরা ক্রমে দেহবশ্যতা হতে মুক্ত হতে পারি। তার প্রথম লক্ষণ হল উপদ্রষ্টৃত্ব : দেহের মাঝে যা-কিছু ঘটছে, আমি তটস্থ থেকে তা দেখে যাচ্ছি, কোনমতেই তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি না। এই ভাবনা প্রবল হলে আমি আর দেহ আলাদা হয়ে পড়ি। তখন দেহের মাঝে যা ঘটে, মনে হয় সে যেন আর-কারও মাঝে ঘটছে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'দেখছি এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তার মাঝে গলার ঘা-টা একপাশে পড়ে রয়েছে।' এই চিৎ-প্রতিষ্ঠা থেকে আবার আনন্দস্বভাবের স্ফুরণ হয়, দেহের তীব্রতম দুঃখকেও তখন অনুভব হয় আনন্দের তির্যক বিলাসরূপে। দেহের অত্যন্ত সংস্কারের তখন বিপর্যয় ঘটে, আর তাইতে আত্মচৈতন্য উপদ্রষ্টার ভূমিকা হতে উত্তীর্ণ হয় অনুমন্তার ভূমিকায়। দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করতে পারে যে-শক্তি, তার ঐশ্বর্যের শেষ নাই। দেহকে সে আত্মবশ্য এবং একান্তননীয় আধাররূপে চিদ্‌বিভূতির বিচিত্র প্রকাশের বাহন করতে পারে। দেহ তখন হয় নিপুণ যন্ত্রীর হাতে স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের যন্ত্রের মত।

*

দেহের বশীকার হতে সিদ্ধ হয় প্রাণের বশীকার। প্রাণ হল চৈতন্যের শক্তি। তার ক্রিয়া চলছে যেমন দেহে, তেমনি মনে। দেহে তার ক্রিয়া বেশির ভাগই অবচেতন, কতকটা যান্ত্রিক—যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা কর্মপ্রেরণা অবসাদ আরোগ্য ব্যাধি ইত্যাদিতে। সবগুলি মিলিয়ে আছে একটা জিজীবিষা বা বেঁচে থাকবার ইচ্ছা। তার বিপরীত হল মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয় জিজীবিষাকে জড়িয়ে আছে, বলতে গেলে আচ্ছন্ন করে আছে। প্রাণের উল্লাসের চাইতে প্রাণের ভয়ই আমাদের মাঝে প্রবল। দেহবশ্যতার এই হল চরম রূপ। একে অতিক্রম করা অধ্যাত্মসাধনার একটা প্রধান লক্ষ্য।

দেহের প্রাকৃত ধর্ম হল জরা এবং মৃত্যু। চেতনার দিক থেকে দেখতে গেলে তার একটা সম্ভাবিত রূপ হচ্ছে চেতনার ক্রমিক অবক্ষয় এবং অবশেষে চিরবিলোপ। কিন্তু সবার বেলায় তা নাও হতে পারে। উদ্দীপ্ত মনশ্চেতনা দেহের জরাকে ছাপিয়ে ওঠে, এ আমরা প্রাকৃত জীবনেও দেখতে পাই। যোগচেতনা তেমনি জীবনের চ্যুতিক্ষণ বা মৃত্যুস্পৃষ্ট অন্তিম মহূর্তকেও ছাপিয়ে বিস্ফারিত হতে পারে। যেমন ঘুমের মাঝে জেগে থাকা, তেমনি মৃত্যুর সময়ও প্রাণের সংহরণকে তটস্থ থেকে প্রত্যক্ষ করা যোগীর পক্ষে অসম্ভব নয়। জীবন থাকতেই আমরা জীবনের ওপরকে ছুঁয়ে আসতে পারি, যদি চেতনাকে

অন্তরাবৃত্ত করি। যোগীর জড়সমাধি একরকমের জীবন্মৃত্যু। চেতনার চরম নিগূঢ়নে (involution) যেখানে জড়ের উৎপত্তি, এই সমাধি সেই 'অপ্রকেতং গহনং গভীরম্'কে ছুঁয়ে থাকে। এইটি অসংকল্প বিশুদ্ধ সত্তার বোধ, যা আমাদের প্রাকৃত দেহবোধের বর্বরতা। অভ্যাসের দ্বারা এই বোধকে জাগ্রতেও প্রবর্তিত করা যেতে পারে। আগে যে আকাশবৎ ব্যাপ্তিচৈতন্যের কথা বলেছি, তার সঙ্গে এই বোধের নিবিড় যোগ আছে। আকাশভাবনা গভীর হয়ে যখন অনন্ত সত্তার শান্তিতে আধারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন চেতনা প্রাকৃত জীবন-মরণের দ্বন্দ্ব হতে নির্মুক্ত হয়। সমুদ্রের বুকে বুদ্বুদ উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। বুদ্বুদ যখন সমুদ্রকে জানে না, অর্থাৎ কোথা হতে আসছে কোথায় আছে কোথায় যাচ্ছে জানে না, তখন এই ভাসা আর ডোবাকে তার সঙ্কীর্ণ চেতনা দিয়ে সে ভাবতে পারে জীবন আর মরণ। কিন্তু সমুদ্রচেতনায় আবিষ্ট হলে এই জীবন-মরণই হয় অজর অমর প্রাণের উল্লাস। মৃত্যু তখন ছায়ার মায়া।

এমনি করে মৃত্যুঞ্জয় হওয়াই দেহবিমুক্তির চরম পর্ব।

*

দেহবিমুক্তির সিদ্ধি নির্ভর করছে বিবেকের উপর। বিবেকের একটা উপাদান হল তটস্থতা। তার অর্থ হতে পারে নৈষ্কর্ম্য। যাঁরা কর্মে আর জ্ঞানে বিরোধ কল্পনা করেন, তাঁরা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিকেই জ্ঞানযোগের পরম সিদ্ধি বলে ধরে নেন। কিন্তু পূর্ণযোগী তা মনে করেন না। নৈষ্কর্ম্যকে অবশ্য তিনি অবাঞ্ছনীয় ভাবেন না, কেননা তিনি জানেন, শক্তি থাকতেও কিছু না করার অর্থ হতে পারে শক্তির হ্রাস টেনে রাখা। আর সেটা শক্তিরই পরিচয়। তবে শক্তির হ্রাস টানতে হয় শক্তিকে ঋতচ্ছন্দা করবার জন্যই। কর্মে বিরক্তি আর নৈষ্কর্ম্যে আসক্তি যদি শক্তিসংহরণের প্রয়োজক হয়, তাহলে তাকে পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ বলা চলে না। এখানে সাধককে অবলম্বন করতে হবে গীতার পথ। গীতায় বলা হয়েছে যোগস্থ হয়ে কর্ম করার কথা। অন্তরের সমত্বই হল যোগ। আমি সেখানে অকর্তা—আকাশবৎ প্রশান্ত নির্বিকার। আমাকে কর্ম করতেই হবে এমন কোনও দায় আমার নাই। আবার কর্ম ছাড়তেই হবে এমন ঝোঁকও নাই। হাওয়া চলতে-চলতে থেমে গেল; আকাশ তবু আকাশই। আকাশের এই প্রশান্ত ব্যাপ্তির মাঝে সাধককে বারবার ফিরে যেতে হবে।

অবশ্য সাধনার এটি প্রথম পর্ব—শক্তিসংহরণের পর্ব। তারও পরে আছে শক্তির ঈশ্বর হয়ে শক্তি বিকিরণের পর্ব।

[ক্রমশ]

ভারতের অমর সাহিত্য

শ্রীঅরবিন্দ

অন্য বৈষ্ণব কাব্যে কৃষ্ণকে রূপকের চিত্রে ধরা হয় নি, সেসব ক্ষেত্রে ভক্তির ঋজু ধারা ভাষার পাখায় উঠে একেবারে পৌঁছেছে বিষ্ণুর কাছে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছে যুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রকে। এই ধরণের কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তুকারামের গান। ক্বচিৎ কদাচিতের ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাংলার বৈষ্ণব কাব্যও চেয়েছে চিন্তার ভারবাহী না হয়ে উঠতে, চেয়েছে বিশুদ্ধ ভাবাবিষ্টের বর্ণনা, একটা প্রাণাবেগ ও নিবিড় অনুভূতির জীবন্ত প্রতিমূর্তি। অন্যদিকে, মারাঠি কাব্যে কিন্তু প্রথম থেকেই সচেতন চিন্তাশীলতার সুর সুস্পষ্ট। আদি মারাঠি কবি হলেন ভক্ত, যোগী ও দার্শনিক একটা নামের জন্ম ও উত্থানের সঙ্গে জড়িত যাঁর নাম সেই সন্ত জ্ঞানদাসের কাব্য ধর্মাবিষ্ট সদাপ্রভী চিন্তানন্দিত হয়েও লিরিকের সমুচ্চতায় উঠে গিয়েছে; ভক্তিরসসিক্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েও চিন্তার সর্বগ্রাসী সত্তা ও উদ্দীপনাই তুকারামের গানগুলিকে দিয়েছে যাদুকরী মায়া অথচ বীর্য। তাঁরই কিছু পরে দীর্ঘকাল ধরে চলেছেন শ্রেণীপরম্পরায় একদল ভক্ত কবি—এঁরাই মারাঠি কাব্যের অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছেন। একটু লঘুতর অথচ এই ধরণেরই আরো সু-উচ্চ কণ্ঠ হল কবীরের। বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের শেষভাগে এই ভক্তিরসের সঙ্গে ধর্মচিন্তার বহু বিচিত্র ধারা মিশেছে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে—এখানে জাগ্রত কল্পনার লীলা অতিপরিচিত জিনিসকে অর্থময় করে এক পৃথক মূর্তিতে তুলে ধরেছে, মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত এক নিগূঢ় অনুভূতির সঙ্গে। দাক্ষিণাত্যে, আদি সংস্কৃত কবিদের মতো, গভীরতর দার্শনিক সুরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিশেছে ভক্তির ভাষা—বিশেষ করে শৈব কবিদের মধ্যে,—তাকে আবার জীবন্ত করে তুলছে অনন্ত বাণী ও জাগ্রত উপমা। আরো দূর উত্তরে বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতা সুরদাসের কাব্যে নূতন রূপে দেখা দিল, অনুপ্রাণিত করল নানক আর শিখ গুরুদের। দুই সহস্র বৎসরের সাধনায় পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ এই আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির অজস্র ধারা সকল প্রদেশের মানসক্ষেত্র প্লাবিত করেছিল—তারই ফল নব নব বহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি, তারই কণ্ঠ এই বিচিত্র ভাষা-প্রবাহের মধ্যে আছো সর্বত্র সুশ্রুত।

গুটি কয়েক বহৎ এবং বিখ্যাত সাহিত্যসৃষ্টি বাদ দিলে এযুগের আখ্যানকাব্যে মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্যের অভাব বেশ দেখা যায়। অধিকাংশ ভাষাতেই একটা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের ফলে প্রয়াস হয়েছে মহাভারতের সম্পূর্ণ মূল কাহিনীটির কিম্বা তার কয়েকটি

রীতিই সুলভ—উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নাম করতে হয় গুজরাতী কবিকুলের অবশ্য অগ্রগণ্য বিখ্যাত প্রেমানন্দের। বাংলা দেশে দেখি আধ-রোমান্টিক আধ-বাস্তব আর এক প্রকৃতির আখ্যানকাব্য—তা সমসাময়িক কালের ধর্মাশ্রয়ী মন, জীবন ও পরিবেশের একটা কাব্য-চিত্র তুলে ধরে, তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাজপুত চিত্রকলার উদ্দেশ্যের মূল দিকটির সঙ্গে বেশ প্রগাঢ় মিল। সহজ সরল পাঁচালীকাব্যে চৈতন্যের জীবনী, তার আদিকের অপূর্ণতা সত্ত্বেও, একটা নিষ্ঠা ও স্পষ্টভাষণের গুণে হৃদয় স্পর্শ করে—একটা ধর্ম-আন্দোলনের জন্ম ও প্রতিষ্ঠার তা হল সমসাময়িক চিত্র। আর যে-দুটি কাব্য ক্লাসিকের পর্যায়ে উঠেছে তাতে শিবশক্তি দুর্গা বা চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন—মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, উল্লেখযোগ্য কাব্য-রূপশ্রীমণ্ডিত অকৃত্রিম পাঁচালী, যা জনপ্রিয় রূপকথার কাঠামোর মধ্যে ধরেছে এক জনসমবায়ের জীবন্ত আলেখ্য। অন্যটি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—তার প্রথম ভাগে গ্রাম্য বাঙালী যে-রকমে দেবতাদের মানুষীভাবে দেখে তার পৌরাণিক চিত্র, মধ্যভাগে এক রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান এবং শেষে বাদশা জাহাঙ্গীরের সময়কার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন উপাদান হলেও এর মূল উৎস এক, কল্পনাশক্তির সমুচ্চ উৎকর্ষ না থাকলেও বর্ণনা এখানে স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল, সরস ও অকুণ্ঠ ভাষায় প্রাণবন্ত। এই সব কাব্য—মহাকাব্য ও পাঁচালী, শিক্ষামূলক কবিতা (যার প্রতিনিধি রামদাস এবং তিরুভাল্লুভারের কুরল), দার্শনিক ও ভক্তিমূলক গীতিকাব্য—অভিরূপভূয়িষ্ঠের জন্য নয়, সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে বাকি সবটাই লোকায়ত সংস্কৃতির স্ফুরণ। তুলসীদাসের রামায়ণ, রামপ্রসাদ ও পথচারী বৈষ্ণব বাউলদের গান, রামদাস ও তুকারামের কাব্য, তিরুভাল্লুভার এবং মহিলা-কবি আণ্ডাল-এর বাণী এবং দাক্ষিণাত্যের সন্ত ও 'আলোয়ার'দের লিরিকগুলি সর্বজনপরিচিত—তাদের ভাবধারা তাদের হৃদয়াবেগ জনসাধারণের জীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল।

সাহিত্যের উপর সম্পূর্ণ না হলেও এত কথা যে বললাম তার কারণ এরই মধ্যে একটা দেশের বিচিত্র ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সাক্ষ্য। তিন সহস্র বৎসর ব্যাপী এই সৃষ্টিকর্ম এবং নহয় একটা বাস্তব ও অতি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির ধ্রুব প্রমাণ। শেষ ধাপে অবশ্য অবনতির লক্ষণ দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেই অবনতির মধ্যেও ঔজ্জ্বল্যটি চোখে পড়ে—বিশেষভাবে ধর্ম, সাহিত্য ও রূপশিল্পের অক্ষুণ্ণ প্রাণরসের মধ্যে। এখন যখন মনে হচ্ছিল যবনিকা পড়ল বলে, ঠিক তখনই প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই যেন নবযুগের শুরু হল, প্রথমত সেই তিনটি জিনিসেই যা পেয়েছিল দীর্ঘতম আয়ু—আধ্যাত্মিক ও ধর্মসংক্রান্ত ক্রিয়া, সাহিত্য এবং চিত্রকলা,—এখন তা জীবন ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হতে চলেছে, যে জীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ একদা ছিল মহৎ ও নেতৃস্থানীয়।*

* Foundations of Indian Culture থেকে। অনুবাদক—শ্রীনীরদবরণ গুহ

শ্রীমা প্রসঙ্গ*

ডক্টর কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

(১)

"তুমি তো শ্রীঅরবিন্দের 'জীবনী' লিখেছ, কেনই বা তুমি শ্রীমায়েরও একটি জীবনী পরিবেশন করবে না!"

এরূপ মৃদু আহ্বান কখনও, অনুনয় জানাও আভাসে ইঙ্গিতে আমার বন্ধুরা। কিন্তু এ কাজ কি বাস্তবিকই সম্ভব? অবতারের ইতিহাস বা চিরন্তনীর জীবনালেখ্য রচনার প্রচেষ্টা কেউ কি করে? শ্রীমার জীবনী লেখার সাহস কেউ কি করে? শ্রীমা শুধু মা-ই, এর বেশী তাঁর সম্বন্ধে কেউ জানে বলে ত সন্দেহ হয়।

কিন্তু তবু কেনই বা নয়? একটি শিশু তার ক্ষুদ্র ক্ষীণ দুটি বাহু বাড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে যখন ঘোষণা করে "অগীন, সে তো এত বড়!" তখন সে-সত্য তারই জ্ঞানের পরিমাপে। অল্পতর জ্ঞান বৃহত্তর জ্ঞানের অন্তরায় তো কোনদিনই নয়। ক্ষুদ্রতর যা তা নিজেকেই অতিক্রম করতে পারে কালে এবং বৃহতের কোঠায় পৌঁছাতেও পারে। সত্যের কাঞ্চনজঙ্ঘা একক সবল দৃঢ় পদক্ষেপে উত্তীর্ণ হওয়া, হায়, সে আমাদের নয়, তাই আমাদের প্রয়োজন ধীরে সন্তর্পণে উদ্ভুঙ্গ পাহাড়ের পিচ্ছিল ও খাড়াই পা বেয়ে পুরোহিত মন্থর আরোহণ পা রেখে শিলাগাত্রের উপর, উৎফুল্ল চোখ রেখে মেঘমুক্ত শোভিত শিখরের উপর, অদম্য সংকল্পভরে সাহসের সাথে, দ্বিধা, ক্লান্তি, সন্দেহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে...।

তা হ'লে মানুষীভাবের দিক থেকে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার জীবনালেখ্য রচনায় বাধা নেই। অপরপক্ষে এও হ'বে অপ্রাসঙ্গিক যদি শুধু বাহ্য ঘটনাবলীই বর্ণিত হয়। শুধু নিত্যনৈমিত্তিক খুঁটিনাটি দিয়ে তা পূর্ণ করা হয়, শুধু যদি "ইউক্লিডিয়ান" জগতের ওজন ও মাপকাঠি দিয়ে আলোচনা চালানো হয়। জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণতি, শৈশব, কৈশোর, নারীত্ব, পূর্বপুরুষের প্রভাব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিক্ষাদীক্ষার ছাপ,—এ সব সাধারণ শ্রেণীগুলিকে পর্য্যায়ভুক্ত করার সাথে অন্তরাত্মার জীবনের কোনই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। অন্তরাত্মা স্থান কাল অতিক্রম করে চলে, তার নেই আদি, নেই অন্ত; নেই বিকাশ নেই কোন বিশীর্ণতা; এ হিন্দু বা ইউরোপীয় নয়, এমন কি পুরুষ বা নারীও নয়। আত্মা একান্তভাবে সৎ, চিরন্তন ছিল, চিরন্তনই থাকবে।

* On the Mother—chaps I—IV

সিদ্ধার্থ, যিশু, রামকৃষ্ণ, যশুয়া, তেরেসা, রাবিয়া এঁরা সকলেই পুরুষ বা নারী এতে কোন সন্দেহ নেই ; তবুও একই দেবত্ব তাঁদের ঘিরে, তাঁরা সকলেই আমাদের সাধারণ বোধ ও অনুভূতিকে ছাড়িয়ে বহু উর্দ্ধে। নিছক মানুষত্ব ত্যাগ করে তাঁরা হয়ে উঠেছেন অতীন্দ্রিয়ের বিভূতি, পূর্ণের রাজদূত, অনন্তের তীর্থযাত্রী। এমন কি সিদ্ধার্থও জন্মেছিলেন, দিনে দিনে সূর্য্যের আলো ও বৃষ্টির ধারার মধ্য দিয়ে বয়:প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি ভালবেসেছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, তিনিও জেনেছেন প্রচেষ্টা সাফল্য ও নৈরাশ্য। তবুও তাঁর যতকিছু পার্থিব জীবনের তথাকথিত 'ঘটনা' কতইনা তুচ্ছ, কতই না নিরর্থক প্রতিবন্ধক মনে হয়। বুদ্ধ বলতে যখন বুঝি এক সমুজ্জ্বল অসামান্যতা, তখন যেটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তা হ'ল বহির্জীবনের যত ঠাসা নক্সার অন্তরালে আছে যে অধ্যাত্ম জীবনের সত্য তারই নিগূঢ় অধ্যায় ইতিহাস, বহির্জীবনের সেসব কাহিনীও স্থান পায় আমাদের অন্তরে ও স্মৃতিকোঠায়।

শ্রীমায়ের কথাও ঠিক এরূপই। তিনি একান্তই না যখন আমরা তাঁর সমীপস্থ হই মানবীয় ভাব নিয়ে। (১) মধুময়ী ও জগন্মোহিনী মানবী এই না-ই আবার অনন্ত প্রেম, পার্থিব প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি হয়ে তিনি আবার শাশ্বত আলো ; তবুও এই মানুষীভাবে দেখার মধ্যেও, এই বিস্ময়মাখা শিশুসুলভ আদর, বিস্ময় ও ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে দেখার মধ্যেও এক নিবিড় শান্তি ও পবিত্রতা। "আন্তর জীবনের" একটা মোটামুটি প্রাথমিক সূচীরেখা বা খসড়া কয়েকটা দ্রুত অঙ্কিত অথচ অর্থপূর্ণ রেখাচিত্র যা সেই জটিল জগতের ওলিকতক বিক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক সূত্র বাতিঘরকে সংযুক্ত করে—এইটুকুই এঁকে ধরতে চেষ্টা করা যায়।

(২)

"আমার জীবন উপরে দেখতে খুবই সাধারণ ও যতটা সম্ভব আটপৌরে কিন্তু ভিতরে তার রূপ কি ? (২)

" এই সত্তার সমস্ত পার্থিব জীবন, শুরু থেকে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, এর কাছে মনে হয় একটি মিথ্যা স্বপ্নের মত।" (৩)

---

(১) ১৯০৮ সালে কোন এক ব্যক্তির প্রত্যুত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—"ভগবান পরিণাম করেন মানুষের মাঝে, ধারণ করেন মানবীয় প্রকৃতি শুধু মানবীয় পথে বিচরণ করবার জন্যে ও মানবকে দেখাবার জন্যে, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর "ঈশ্বরত্ব" থেকে বিচ্যুত হন না। এ ঘটে শুধু রূপপ্রকাশের জন্যে। প্রকাশোন্মুখ দিব্য চেতনার ক্রমস্ফুটনের জন্যে, এ শুধু ভগবানের দিকে মানুষের ফিরে দাঁড়ান নয়। শ্রীমা বাল্যকাল থেকেই আন্তর চেতনার সব সময়েই মানুষীভাবের অনেক উপরে।" (শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী—পৃ: ৪)

(2.) Prayers & Meditations-P/251
(3.) Prayers & Meditations-P/231

" আমি হলাম পৃথিবীতে একটি প্রকৃত শূন্য" (৮)

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে লিখিত শ্রীমায়ের এই বাণীগুলি খুবই অর্থপূর্ণ। সাধারণ ও সামান্য ? মিথ্যা স্বপ্ন ? প্রকৃত শূন্য ? বাহ্য ও সত্য সত্তা ? অন্ধ মানুষ কেমন করে বুঝবে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ? শ্রীমায়ের এই "সাধারণ ও সামান্য" জীবন হয়তো বাহ্যপ্রকাশ মাত্র ; কিন্তু অন্তরে অগ্নিশিখা, অনন্ত অগ্নিকুণ্ড, আলোর আগ্নেয়াস্ত্রের সক্রিয় বর্ম—এ সবের প্রচণ্ডতা কেইবা অনুমান করেছে, এই আরোহণ যজ্ঞের আবক্ররেখা আর কেই বা চিহ্নিত করেছে ?

আজকের এই যে শ্রীমা—যিনিফ্রান্সীদেশের একজন ব্যাঙ্ক-অধ্যক্ষের কন্যা—তিনিও একদিন ছিলেন শিশু, কালে কৈশোরে পদার্পণ করলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেন শাশ্বত প্রকৃতির শক্তি ও মাধুর্য্য। শিশু, কিশোরী এ কথাগুলি কত দুর্বোধ্য তা একটি কবিতার কয়টী ছত্র থেকে বোঝা যায় :

তুমি যার বাহ্যানুভূতি বুঝতে দেয়না
পিছনে আত্মার ভুবান,
শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তুমি, তবুও যে রাখো তোমার
সনাতন প্রকৃতি, তুমি হলে দৃষ্টি স্বয়ং অন্ধদের জন্যে
রুদ্ধ তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার ও নীরব তুমি, শাশ্বতের গভীরতম
অর্থ তুমি খুলে ধর,
শাশ্বত মন তোমাকে অনুসরণ করে ছায়ার মতো.—
সর্বসমর্থ নবি, কল্যাণী দ্রষ্টা !"

বালক কৃষ্ণ বালকোচিত ভাবে খানিকটা মাটিতুলে নিল মুখের মধ্যে। জননী যশোদা যখন সে-মুখ খুলতে বললেন তখন তিনি দেখলেন আশ্চর্য্যের চেয়ে আশ্চর্য্য—সারা বিশ্ব, ভূলোক, দ্যুলোক, গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য্য, সীমাহীন জীবজগৎ সবই ওই "কাণ্ডজ্ঞানহীন" শিশুর মুখের ভিতর। শিশুটির বিশালত্ব একান্ত সত্য, যতই আমরা চেষ্টা করি ছোটর পরিচয়ে তাকে আবদ্ধ, আচ্ছন্ন, আনত রাখতে তা সত্ত্বেও।

তের বৎসর বয়সে শ্রীমা এক অভিনব রূপান্তরের অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন আর রহস্যটি সেই থেকে প্রায় একটি বছর ধরে জীবনে রোজ প্রত্যক্ষ করছিলেন অলৌকিক সূচনা :

".....প্রতিদিন রাত্রে আমি নিদ্রিত হওয়া মাত্রই আমার মনে হ'ত যেন আমি শরীরের বাহিরে এসে সোজা উপরে উঠে চলেছি—বাড়ী ছাড়িয়ে সহর অতিক্রম করে—বহু উর্দ্ধে। দেখতাম যেন আমি আমার চেয়ে দীর্ঘতর একটি অপূর্বসুন্দর সোনার পোষাক পরেছি। যতই আমি উর্দ্ধে উঠতাম, এই পোষাকটিও ততই দীর্ঘ হ'তে থাকত এবং আমার চারিদিকে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ত—সহরটির উপর একটি বৃহৎ আচ্ছাদন রচনা করে।

(4) Prayers & Meditations-P/35

তারপর আমি দেখতাম চারিদিক থেকে লোকেরা আসছে—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, অসুস্থ ও অসুখী। তারপর সেই প্রসারিত পরিচ্ছদটির নীচে সমবেত হ'ত, তাদের দুঃখ দুর্দশা ও বেদনার কথা বলে, সাহায্য ভিক্ষা করে। প্রত্যুত্তরে সেই নমনীয় ও জীবন্ত পোষাকটি দীর্ঘ হয়ে তাদের প্রত্যেকের দিকেই যেত এবং তাদের স্পর্শ করা মাত্রই তারা পেত সান্ত্বনা, হয়ে উঠত সুস্থ, এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুখী ও সবল হ'য়ে তাদের শরীরের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করত। আমার কাছে এর চেয়ে বেশী সুন্দর এর চেয়ে অধিক আনন্দের আর কিছুই ছিল না। রাত্রের এই কর্মটি—যা ছিল আমার যথার্থ জীবনস্বরূপ—এর কাছে দিনের সকল কর্মই মনে হ'ত নীরস, নির্গুণ ও নিষ্প্রাণ। এই উর্দ্ধে উঠে চলবার সময় প্রায়ই আমার বামপার্শ্বে একজন নীরব, নিশ্চিবচল বৃদ্ধকে দেখতে পেতাম—তিনি তাঁর শুভেচ্ছা ও স্নেহ দিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন; তাঁর উপস্থিতিই আমাকে উৎসাহ দিত। গায়ে বেগুনী রংয়ের দীর্ঘ পোষাক পরিহিত এই বৃদ্ধটি ছিলেন; তিনি হলেন—অনেক পরে আমি জেনেছি যাঁকে লোকেরা বলে দুঃখের মানুষী বিগ্রহ"(৫)

এ এক অপূর্ব সতর্ক জাগরণ। সত্যই শিশুটি হ'ল কল্যাণীদ্রষ্টা, সর্বসন্তাপহারিণী। এমন কি দুঃখের হিমালয়ও একান্ত নিষ্পিষ্ট করতে পারেনা; তাঁর সেই বিশুদ্ধ প্রসারিত পরিচ্ছদটির আছে এক আন্তরগতি এবং এই গতির সাথে সাথে শুরু হয় নিরাময় কার্য্য ও দূরীভূত হয় সব ব্যথা।(৬)

(৩)

শিশু যেমন সন্তানের পিতা, তেমনি আবার নারীরও মাতা। কবি বলেছেন:

ওই দেখি সে-নারীরে, যার চোখে চোখ
মিলাইতে চায় আঁখি অথচ জানেনা
কোথায় সে, কার পানে করে আরোহণ
পৃথিবীর পত্র-যাত্রা; না জানিয়া তবু
তারি তরে ছন্দ করে পক্ষ সঞ্চালন;
চন্দ্র-সূর্য্যে গাঁথা তাঁর অসীম ললাট
তারা-ফুল অঙ্কে নিয়ে স্বপ্ন-তট হতে
শান্ত ক'রে ডেকে আনে সুরের আলোকে

(৫) Prayers & Meditations-P/61-62

• অরবিন্দ লিখেছেন তাঁর "In The Mother's Light" (মীরার আলোর পরিপ্রেক্ষিতে) পৃঃ ৩, ১ম ভাগ সূত্রকে: "এই সোনার পরিচ্ছদটির প্রসাদে হল শাশ্বতী করুণার এক মর্মস্পর্শী ভঙ্গি—যেন প্রেমে আসছে আর্ত তাপিত মানুষের উদ্ধারের জন্য।"

নিহারিকার সংগীত ; সে বিবিধ-স্বর
তাঁর দৃষ্টিপাতে পায় মৈত্রীর অমৃত,
তাঁর প্রসন্ন দর্শনে ছন্দিত শুভতা।(৭)

যে ভের বছরের শিশু অপূর্ব অসাধারণ সব স্বপ্ন দেখত, আর জগতের বেদনার তার অন্তরে অনুভব করত এবং সে বেদনা নির্মূল হ'য়ে যেত তার নিরাময়কর স্পর্শমাত্রেই, যে শিশু ধীরে ধীরে সেই নীরব অচল দুঃখের মানুষী বিগ্রহের সঙ্গে মিশে যেত, সে শিশু তারপর হলেন একজন "সম্ভ্রান্ত মহিলা"। কিন্তু সেই "সম্ভ্রান্ত মহিলা" বিস্মৃত হন নি তাঁর অতীতের সুস্পষ্ট সব অলৌকিক দর্শন, ভগবানের স্বপ্ন-প্রত্যাদেশ।

অধ্যাত্মের পথে অন্বেষু কয়েকজনের একটি ছোট দল একসঙ্গে সভায় বসত কারণ তারা অদৃশ্য পরমের ভাবনায় ভাবিত ; তারা তাদের গভীরতম ভাব ও চিন্তাধারার আদান প্রদান করত, দর্শনশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের কণ্টকিত সমস্যার আলোচনা করত, আর উদ্দেশ্যমূলক কর্মশক্তির উৎসের গবেষণা করত। "সম্ভ্রান্ত মহিলা"ই হলেন এই দলটির প্রাণ ও আত্মা, তিনিই এনে দিতেন অনুসন্ধিৎসুদের মধ্যে মূল ঐক্য এবং পথের নির্দেশ। ১৯০৭ সালে একদিন রাশিয়া থেকে একজন আগন্তুক প্যারিসে এই দলটিকে খুঁজে বার করে বলল,—"হাঁ, কিয়েভ সহরে আমাদের একটি বিদ্যার্থীমণ্ডল আছে, যারা এই দার্শনিক চিন্তাধারার গভীর অনুরাগী। তোমাদের কতকগুলি বই আমাদের হাতে পড়েছে ও অবশেষে তোমাদের সার্বভৌম শিক্ষা দেখে আমরা অত্যন্ত প্রীত হয়েছি এই ভেবে যে তোমাদের শিক্ষা নিছক মতবাদের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তার পরিণতি কর্মে। তারপর আমার সহকর্মীরা বলল আমায় "যাও, ওদের পরামর্শ নিয়ে এস সেই আলোচ্য বিষয়টির যার অনুধাবন আমরা এবং সেইজন্যই আমি এসেছি।"(৮) তারপর আবার সুবিবেচনার সঙ্গে বলল, "আমার কাজ রাষ্ট্রবিপ্লবের।"(৯)

রাষ্ট্রবিপ্লবী কোনঠাসা—এমন একটা দিন আসেই যখন পৃথিবীর সব ব্যাপারভুগুরাই কোনঠাসা হয়—এবং রাষ্ট্রবিপ্লবীর মনে এই সন্দেহ জাগে যে তার দর্শন ও কর্মের একেবারে কেন্দ্রে কোথাও অন্ধকার ও নিষ্ফলতা আছে কিনা। হিংসার পথ, প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার কৌশল—তারা নিয়ে যায় চোরাগলিতে। বেপরোয়া প্রচণ্ড আঘাতে হয়ত আছে এক নির্ভীক মহত্ত্বের রোশনাই, কিন্তু চরম বিশ্লেষণে দেখা যায় তা নির্বোধ, নিরর্থক। "অবিচারের সাহায্যে কি করে আশা করতে পার ন্যায়বিচার, কি করে আশা করতে পার বিদ্বেষের মাধ্যমে মৈত্রী?"(১০) আগন্তুক উত্তর দিলেন—"তা জানি...ঘটনাচক্র যখন

(7.) Francis Thompson
(8.) Words of Long Ago P/8 (1952)
(9.) Words of Long Ago P/8
(10.) Words of Long Ago P/11

মানুষকে ঠেলে নিয়ে যায় তখন তার করণীয় কি ?...এমন কি প্রয়োজন হ'লে আমরা শেষ ব্যক্তিটি পর্য্যন্ত প্রাণ দেব তাও স্বীকার তবুও আমাদের পবিত্র কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হবনা, যে পবিত্র মন্ত্রের সাধন শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত করব বলে নিজেদের কাছে প্রতিশ্রুত, তার অবমাননা আমরা করব না।"(১১) সেই আগন্তুকের মুখমণ্ডলে এক মহান অলৌকিক প্রভা ফুটে উঠল এবং তার নৈরাশ্যের মধ্যেও ছিল সৌন্দর্য্য ও উদ্দীপনা। কিন্তু মরণ, সে ত যথেষ্ট নয়; বেঁচে থেকে সব জয় করাই ত সুপথ। শ্রীমা মহিলার যে উপদেশটি এ প্রসঙ্গে মাতৃসুলভ ও জ্ঞানদীপ্ত, তা হ'ল :

"কিছুকালের জন্য এসব বিরতি দিয়ে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে নীরবে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে হবে, নিজেদের শক্তি সব সংহত করে নিতে হবে, দলে দলে সুগঠিত হ'তে হবে, একটা ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্য আনতে হবে যার ফলে ভবিষ্যতে কোন মুহূর্ত্তে আপনারা গঠনক্ষম বুদ্ধিকে ধরে এমন এক সর্ব্বজয়ী অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াবেন যা কিছুতেই কখনো হিংসাবৃত্তির মত ব্যর্থকাম হবে না। শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দেবেন না বরং তাদের সামনে নিষ্কলঙ্ক হ'য়ে দাঁড়ান, তাদের দেখতে দিন ভীতিহীন ধৈর্য্য, সততা ও ন্যায়ের দৃষ্টান্ত। তখন নিকটতর হবে আপনাদের জয়। কেন না সে ক্ষেত্রে আপনাদের থাকবে ন্যায়, পরিপূর্ণ ন্যায়—আদর্শে ও উপায়ে উভয়তঃ।"(১২)

আগন্তুকটি অভিভূত,"তাঁর সকরুণ বিষণ্ণ চোখ দু'টি আমাদের পানে ফেরালেন, সে চোখে আত্মপ্রত্যয় আর আশা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তার বিদায়বাণী হ'ল "বড় আনন্দের কথা আজ এমন সব মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম যাঁদের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করা যায়, যাঁদের ন্যায়ের আদর্শ আমাদেরই মতন, যাঁরা আমাদের দুষ্কৃতকর্ম্মী কিম্বা উন্মাদ মনে করেন না যেহেতু আমরা সেই আদর্শকে ফলিয়ে তুলতে চাই। আচ্ছা তা হলে আসি, আবার শীঘ্রই দেখা হবে।"(১৩)

এই হল সেই "সুহৃদয় ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি"র প্রসঙ্গের শেষ, যিনি ছিলেন অধ্যাত্মপন্থী, এমন কি মনে হয় শহীদ। তিনি এসেছিলেন শ্রীমার কাছে তাঁর নিদারুণ যাতনা, বিহ্বলতা নিয়ে, আদর্শ অনুরাগ ও নৈরাশ্য নিয়ে, কিন্তু শ্রীমার নিরাময়ক স্পর্শ তাঁকে শান্ত ও আরোগ্য করল, আশ্বার কত সব বুঝিয়ে দিল, সঙ্কটমুহূর্ত্তে তাঁকে রক্ষা করল।

(৪)

শ্রীমা হলেন একটি অধ্যাত্মজীবন-অনুসন্ধিৎসু মণ্ডলীর প্রাণ। সে মণ্ডলীর কেন্দ্রটি

(11.) Words of Long Ago P/11
(12.) Words of Long Ago P/12
(13.) Words of Long Ago P/15

ছিল প্যারিসে, কিন্তু তার প্রভাবের পরিধি ক্রমেই দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেখানে হ'ত আলোচনা, আলাপ ও কর্মপন্থা নির্ব্বাচন। অভিজ্ঞতা যুক্তির সাথে মিশল, তর্ক-বিচারের সাথে মিলল দৃষ্টি, হৃদয় মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হ'ল এবং এভাবে জিজ্ঞাসুরা হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলল জীবনের পূর্ণ আদর্শের দিকে, তাকে পাওয়ার এক সর্ব্বাঙ্গীণ উপায় বয়ে। শ্রীমার উপদেশাত্মক উপকথা অনুপ্রাণিত মুখ থেকে উৎসারিত হ'ত, আর শ্রোতাদের অন্তরে তা অমৃতধারারূপে প্রবেশ করত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি যুবক ছাত্রের গল্প (১৪) আছে—এক "অষ্টলোনভ্" বলতে পারো তাকে—যে দীর্ঘসূত্রিতায় অভ্যস্ত :—

কাল, আগামী কাল, আর আগামী কাল,
এই ক্ষুদ্র পদক্ষেপ মন্থর গতিতে চলে
পরিচিত কালের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত...

যুবক শেষে ঘুমিয়ে পড়ে, স্বপ্ন দেখে এক বিমোহন পথ ও চমৎকার রাস্তায় এক মনোরম ভ্রমণ। "সূর্য্য তখন তেমনি উজ্জ্বল, গাছে গাছে বিহঙ্গের গান, অপূর্ব্ব দিনের সব পূর্ব্ব-লক্ষণ।"(১৫) যুবক চলে আরও দূরে, নিদারুণ নিরুদ্বিগ্নতায় তরঙ্গ-শিখরের উপর দিয়ে, কিন্তু অন্তরে কোথায় যেন জাগে এক অস্বস্তি, আর মনে মনে ভাবে, "আমি কোথায়? চলেছি কোথায়? কিই বা এসে যায় তাতে? ভাবনা কেন, কিছু করবার চেষ্টাই বা কেন? এস, এই অন্তহীন পথে গা ঢেলে দিয়ে আমরা ভেসে যাই; হেঁটে চলি তো এখন, ভাবনা করবো আগামী কাল।"(১৬) সে প্রলোভিত হ'ল সংজ্ঞাহীনভাবে একটি গভীর গিরিপথের দিকে, তা ক্রমশঃ নিবিড় হতে নিবিড়তর হ'য়ে উঠল, দেখল আদ্যন্ত বিবর্ণ মানুষের মূর্ত্তি, দুরবস্থায় কর্দ্দমাক্ত, দেখল পেঁচক, কাক, বাদুড়ের দল যেন কি বলে গেল কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে, যুবকটির মনে হ'ল বাস্তবিকই যেন সে যমরাজের প্রেতরাজ্যে পথভ্রান্ত হয়ে গেছে। যেন অপরিহার্য্যভাবে দুর্ভাগ্যের দিকে পতিত হতে লাগল। রাত্রের বীভৎস দুঃস্বপ্ন শেষ হ'ল তার। সে উঠে পড়ে চলতে শুরু করল, ঘুমন্ত চোখ বিস্ফারিত করে ঘোষণা করে উঠল, "আরে, সব তো অতি সরল, সহজ; পথটি পরে করব'র পথ, আর রাস্তাটি 'কালকে'র রাস্তা...।"(১৭) আর সেই সমুজ্জ্বল স্বপ্ন-পুরীটি—তা হ'ল "কিছুনা"র প্রাসাদ। ছাত্রটি এইভাবেই একান্তই ব্যাধিমুক্ত হ'ল।

শ্রীমার লিখিত আর একটি উপকথা আছে। মেঘলোকে অবস্থিত এক 'সত্যের প্রাসাদ'—সেই প্রাসাদের বহিঃকক্ষ হ'ল 'বুদ্ধির কক্ষ', আর সেখানে চলছিল বিরাট ভোজের উৎসব। সদ্‌গুণেরা সব একে একে উপস্থিত হ'তে লাগল, অবিলম্বে তারা দলে দলে

১৪ শ্রীমার বয়স যখন ১২ বৎসর সেই সময় লিখিত।
(15.) Words of Long Ago P/1
(16.) Words of Long Ago P/2
(17.) Words of Long Ago P/5

ভাগ হয়ে দাঁড়াল "যার যেখানে আকর্ষণ সেইভাবে। সকলেই খুব খুশী—সাধারণতঃ এ-জগতে সে-জগতে নানা-জগতে তারা সব পরস্পর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে আছে, যত রাজ্যের বিদেশীদের মধ্যে পৃথক হয়ে আছে—অন্ততঃ একবার তারা সবাই এক সাথে মিলিত হ'ল।"(১৮)

সভাপতি ছিল 'আন্তরিকতা', তার পরিধানে ছিল স্বচ্ছবসন ও হাতে ছিল বিশুদ্ধ ঘনাকার স্ফটিকখণ্ড, যার ভিতর দিয়ে বিনা-বিকৃতিতে সব জিনিষই প্রতিফলিত হয়। তার বিশ্বস্ত সহচর হ'ল 'বিনতি' ও 'সাহস'। আর 'সাহসের' সন্নিকটে দাঁড়িয়ে এক মহিলা সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠিত—সে হ'ল 'সাবধানিকা'।

মহাশয়া 'উদারতা'—"যুগপৎ শান্ত ও সতর্ক, কর্ম্মরত অথচ সংযত"—একেবারে মধ্য-স্থলে অবস্থিত অর্থাৎ সর্ব্বদাই সকলের নিকটস্থ, আর তার অভিন্ন সহচরী হ'ল তারই ভগিনী 'ন্যায়পরতা', কিন্তু 'উদারতা' যখন 'বুদ্ধির' কক্ষের মধ্য দিয়ে তার অলক্ষ্যে চলাফেরা করে তখন রেখে যায় তার চলার পথে "শুভ্র মৃদুল আলোর ধারা" যা বিচ্ছুরিত হয় চতুর্দ্দিকে। আবার উদারতাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরে অথচ অন্তরালে রয়েছে 'দয়া', 'ধৈর্য্য' ও 'নম্রতা'।

সদ্‌গুণেরা সবাই মিলেছে একত্রে—কিন্তু দরজার চৌকাঠের বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে, সকলেরই কাছে সে একেবারে অপরিচিত আগন্তুক—"অতি নবীন ও কোমলকান্ত দেহ, অতি সাধারণ, প্রায় গরীবেরই মতন।"(১৯) 'সাবধানিকা' এগিয়ে গেল অপরিচিতা নবাগতার কাছে, বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করল তার নাম। নবাগতা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলে "হায়, এখানে আমাকে যে বিদেশিনী বলে মনে হয় তাতে আমি বিস্মিত নই। আমি খুব কম জায়গাতেই নিমন্ত্রিত হই। আমার নাম 'কৃতজ্ঞতা'।২০

(18.) Words of Long Ago P/16
(19.) Words of Long Ago P/18
(20.) Words of Long Ago P/18

অমৃতসঞ্জীবনী

নিশিকান্ত

বোটর-এ্যাক্সিডেন্টের ক্ষের কেনে
মাসাজ-ক্লিনিকে মালিশ করাই আমি ;
এখানেও মারো তাগাদার তীর হেনে,
হে সম্পাদক, তুমি কি সর্বগামী ?

বলি, এখানেও এসেছ কবিতা নিতে ?
কেন দুর্গত কবির রচনা চাও ?
এই বাঁকা ঘাড়ে পারবে কি তেল দিতে ?
আগে দাও টাকা, তারপরে লেখা নাও।

কি বল্লে তুমি ? আধুনিক আফিকে
প্রেমের কবিতা লিখলেই লুফে নেবে,
অথবা ক্ষুব্ধজনতার জ্বালা লিখে
আগুন জ্বালালে দশগুণ দাম দেবে ?

আমার প্রশ্ন : শারদীয় সংখ্যায়
থাকবে না কেন শারদার আরাধনা ?
দুর্গা পূজায় ডাকবে না দুর্গায় ?—
কেন কোনো কবি জানাবেনা প্রার্থনা

জগন্মাতাকে,—জগতের দুর্গতি
হরণ কোরতে ? পূজার পত্রিকায়
পাতা খুলে দেখি নিদারুণ বিকৃতি।—
দুষ্টসরস্বতী করে সজ্জায়

অপপত্তির নষ্টপ্রভাব। গল্পে-উপন্যাসে
জন-গণ-মন-বিমোহিনী সেই বাণী
সার্থক হয় বিলোল-বাসনা-বিকাশের উল্লাসে;
বিনাশের বীণা বাজায় সে-বীণাপাণি।

দেবী-বোধনের প্রবন্ধমালা থাকে
পূজাসংখ্যায়, প্রখনপর্বে, আর
প্রখন পাতায় অসুরদলনী মাকে
ছবিতে রেখেছ,—এই কথা বার-বার

আমায় বোলেছ; আমিও তোমায় বলি,
'পয়োমুখ-বিষকুম্ভের' মত সে যে!
সেই পয়োমুখে দিতে হবে অঞ্জলি
আমার কবিতা? পূজোর শঙ্খ বেজে

উঠবে আমার লেখার ছন্দে? চাও
ফরমাস-দেওয়া-ভগবতীবন্দনা?
আমি পারবোনা। যাও ভাই, ফিরে যাও।
কত দুর্যোগ, কত যে দুর্ঘটনা

দুর্গার বরে কতবার করি জয়
মোটর-এ্যাক্সিডেন্টে অকস্মাৎ
এবারেও আমি পাই তার পরিচয়!
আবার ব্যর্থ হয়েছে মরণাঘাত

আবার জীবনে যাঁর অনুকম্পায়,
তাঁরি চরণের ধূলো নিয়ে হই ধনী।
আমি যে দেখেছি দেবী অবতীর্ণায়,
মর্তে পেয়েছি অমৃতসঞ্জীবনী।

আগমনী

রবি গুপ্ত

কালের বুকে কালহারা কোন
বাজল সুরের ছন্দ,
চিরন্তনীর আলোয় উজল
হ'ল যে দিগন্ত।
কোন অমরার দীপ্ত তপন
সাজায় ধরার স্বর্ণ-স্বপন—
বইতে নারে মর্ত্য-মলয়
কোন পারিজাত-গন্ধ।
কালের বুকে কালহারা কোন
বাজল সুরের ছন্দ।

(২)

এলো তোমার আবির্ভাবের
অভীপ্সিত লগ্ন,
নামল ধূলায় যে মন্ত্র দূর-
তারার মালায় লগ্ন।
কত যুগের আঁধাররাশি
পাবক-লীলায় উঠল হাসি',
নিভৃতে তার উঠল দীপি'
কোন অতলের রত্ন।
এলো তোমার আবির্ভাবের
অভীপ্সিত লগ্ন।

(৩)

জীবন-খেয়ায় এই পৃথিবী
আঁধার-পাথার-অন্তে

কোন কূলে যে ভিড়ল আসি'
কোন অসীমের ছুপে।
কার চরণের পরশ লাগে,
দূর অবরা ধূলায় জাগে
সীমার বুকে অসীম চির
কোন সুরে আনন্দে।
জীবন-খেয়ায় এই পৃথিবী
[illegible]-পাথার যন্তে।

(৪)

কত যুগের টুটল বাঁধন
লুপ্ত রজনি রাত্রি,
আশার গানে রাঙল আকাশ
অরুণ-পথে যাত্রী।
উষর-তীরে নিরবসান
বিহগ সাধে মুক্ত-তান—
সুপ্ত-প্রাণের সৃষ্টি-প্রদীপ
জাগায় জীবন-ধাত্রী।
কত যুগের টুটল বাঁধন
লুপ্ত রজনি রাত্রি

(৫)

আশিষ তোমার নামল ধরায়—
করল বরণ পদ্ম,
সব-অতলে উর্ধ্ব অসীম
বাজায় জয়ের শঙ্খ।
নীল-সাগরের উর্মি-দোলে
নবীন জগৎ দুয়ার খোলে—
কোন অধরা হেথায় আজি
বাঁচে আপন সঙ্গ।
আশিষ তোমার নামল ধরায়
করল বরণ পদ্ম।

(৬)

কালের বুকে কালহারা কোন
বাজল সুরের ছন্দ,
রাঙল চিরন্তনীর আলোয়
নিবিড় তিমির অন্ধ।
আজ অমরার দীপ্ত তপন
সাজায় ধূলির স্বর্ণ-স্বপন,
বইতে নারে মর্ত্য-মলয়
কোন পারিজাত-গন্ধ।
কালের বুকে কালহারা কোন
বাজল সুরের ছন্দ।

অপরাজেয়

রণজিৎ সরকার

আকাশের শেষ সীমানায়
নীলরেখা দিগন্ত বেখায়
গলে যায় তুষারের মত,
যেখানে তারাকাসারি চিন্তারা উধাও
সেখানে ছড়ানো ইতস্তত:
উজ্জ্বল তারার কণা
জড় করো দুই হাত ভ'রে।

সকাল বিকাল পার হয়ে,
পার হয়ে সর্বশেষ শিখরের আশা,
পার হয়ে নীলিমার নদির চুম্বন,
অনন্তের গূঢ় পরিচয়ে
পান করো
বিন্দু বিন্দু তীব্র হুতাশন।

দু'চোখে যদিবা ঘুম আসে
মুছে যায় সহজ প্রত্যাশা
তবু তুমি সূর্যের সকাশে
পেতে পারো বিশ্বাসের ভাষা।
সেই বাণী লয়ে
মেলে দাও শুভ্র পাখা
আকৃতির নির্বেধ আকাশে।

খুঁজে পাবে নতুন পৃথিবী।
সেই তার উর্বর মাটিতে
বুনে দিয়ো সূর্যবীজ
দীপ্ত তারাকণা
পূর্ণ হোক অন্তরের আকুল প্রার্থনা।

"Work done in the true Spirit is Meditation."

—*THE MOTHER*

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

বর্ষ—২০ সংখ্যা—২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪ এপ্রিল, ১৯৬০)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২

১।	চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২।	অন্তর্যামিনী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪
৩।	যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১১
৪।	মহামানবের সাগরতীরে	সমৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫
৫।	বাসবদত্তা	শ্রীঅরবিন্দ	২৮
৬।	মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৩৪
৭।	শ্রীমা প্রসঙ্গ	ডাঃ কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	৪৭

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৲ টাকা

214-'60-750

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

২৪শে এপ্রিল

১৯৬০

অরূপ আর সরূপ তাঁর মধ্যে মিলেছে।
একটিমাত্র দৃষ্টি অতিক্রম করে গেল তুরীয় প্রসার,
একটি আনন ধারণ করল অসীমার পুঞ্জীভূত বৈচিত্র্য,
তাঁর অঙ্গে অঙ্গে শরীরী হয়েছে অবর্ণনীয় ভঙ্গিমায়
সেই অপরিমেয়র আনন্দ যার খোঁজে অন্ধ বিশ্ব-শক্তিরা চলেছে,
সৌন্দর্য্য-সার দেহ তাঁর বিম্বিত করে কত সোম-সাগরের রক্ত-প্লাবন।
জন্মের প্রয়াসের নিয়তির নিম্নভাগে দাঁড়িয়ে তিনি,
যুগ যুগান্তরের মন্থর পরিক্রমা তাঁর আহ্বানে ঘুরে চলে,
তাঁরি হস্তস্পর্শে আনতে পারে কাল-সরীসৃপের অচল প্রতিষ্ঠায় পরিবর্ত্তন,
তাঁরি রহস্যকে লুকিয়ে রাখে অমানিশা,
তাঁরি হল অধ্যাত্ম-সত্তার যাদুকরী শক্তি,
তিনিই দিব্যময় সেতু, আশ্চর্য্যবৎ বহ্নি,
অজ্ঞাতের জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়,
ভগবানের গভীর নিতলে তিনিই মৌনস্যের ধীর্য্য,
তিনিই মহাবল, তিনিই অনাহত বাণী,
আমাদের কঠোর উর্দ্ধায়নে চুম্বকের আকর্ষণ তিনি,
সেই মহাসূর্য্য তিনি, আমাদের সকল সূর্য্য তা থেকে প্রসাদিত,
জ্যোতি তিনি অব্যক্ত অসীমা হতে তিনি আনত হয়ে আছেন,
সে উল্লাস তিনি, অসত্য হ'তে আলো যার হাতছানি,
আর যা-কিছু কখন অবতরণ করেনি সে সকলের আত্মশক্তি তিনি।
নিখিল বুক প্রকৃতি তাঁকেই শুধু ডাকে
তাঁর পাদস্পর্শে জীবনের যত আর্ত্তশ্বসন নিরাময় করতে,
মানুষের অস্ফুট অন্তরাত্মার উপর রয়েছে আবরণ যত তা ভেঙে ফেলতে,
সকল জিনিষের বদ্ধ হৃদয়ে তাঁরই আগুন জ্বালিয়ে দিতে।
সকল জিনিষ একদিন এখানে তাঁর মাধুর্য্যের নীড় হবে,
সব বৈসাদৃশ্যই তাঁর মহামিলন প্রস্তুত করে চলে,
আমাদের জ্ঞান তাঁর দিকে চলে, আমাদের আবেগ তাঁকেই খোঁজে,
তাঁর অপরূপ মহারাসে আমরা বসবাস করব,
তাঁর গাঢ় আলিঙ্গনে আমাদের বেদনা হবে উঠবে পরমানন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ

THE MOTHER

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীঅরবিন্দ

জ্ঞান

অমঙ্গলে জগতের যত মঙ্গল করেছে আর ধার্ম্মিকের হাতে মাঝে মাঝে হয়েছে যে অপকার তা দেখে জগতের মঙ্গল-কামীরা ব্যথিত। তা সত্ত্বেও ব্যথিত হবে না, বিভ্রান্ত হবে না, বরং পর্য্যবেক্ষণ কর, ধীরে, অনুধাবণ কর মানুষের সঙ্গে ভগবানের ব্যবহার ধারা কি।

* * *

ভগবানের ব্যবস্থায় অমঙ্গল নাই, আছে শুধু মঙ্গল অথবা মঙ্গলের জন্য প্রস্তুতি।

* * *

সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি সৃষ্টি হয়েছিল অন্তরাত্মার আপন প্রয়াস আর প্রগতির জন্য—কিন্তু ফলের দিক দিয়ে তারা ভগবানেরই হাতে, কারণ ভগবানই আপনাকে সার্থক করে তোলেন সুকৃতি-দুষ্কৃতির ওপারে।

* * *

জীবন যাপন কর অন্তরে, বাহিরের নানা ঘটনায় বিচলিত হবে না।

* * *

বদান্যতা ফলিয়ে দেখাবার জন্যে যথাতথা তোমার দান ছড়িয়ে দিও না—যেখানে সাহায্য করবে, সেখানে থাকে যেন তোমার প্রীতি, তোমার সৌমনস্য। তোমার অন্তরাত্মাই যেন অন্তরে বেড়ে চলে।

* * *

দুঃস্থদের সাহায্য কর, যতদিন দুঃস্থরা রয়েছে তোমার চারদিকে—কিন্তু বুঝে দেখবে, চেষ্টা করে চলবে যাতে কোন দুঃস্থই যেন আর কোথাও না থাকে তোমার সাহায্যের জন্য।

* * *

ভারতের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কাছে দাবি করে স্বেচ্ছায় সহজ জীবন যাপন, শুদ্ধ আচরণ, বিদ্যা-আহরণ, বিনা প্রতিগ্রহে সর্ব্বজনে শিক্ষা দান; রাজন্যদের কাছে দাবি করে সংগ্রাম, রাজ্যশাসন, দুর্ব্বলকে রক্ষণ, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দান; বৈশ্যদের কাছে দাবি করে বাণিজ্য, অর্থলাভ, লব্ধ অর্থ মুক্তহস্তে সর্ব্বজনে প্রত্যর্পণ; আর দাসের কাছে দাবি করে সকলের জন্য পরিশ্রম আর নিজের জন্য সঞ্চয় —তার দাসত্বের

পণস্বরূপ তাকে দেওয়া হত আত্মদানের শুল্ক ঘতে মুক্তি, রক্তদানের শুল্ক হতে মুক্তি আর তার বিত্তের উপর শুল্ক হতে মুক্তি।

* * *

যে সমাজে দারিদ্র্য রয়েছে তাতে প্রমাণ হয় সে সমাজের অন্যায় ও অব্যবস্থা। আমাদের দানখয়রাতের সাধারণ প্রতিষ্ঠান সব যেন চোরের মনে অবশেষে বিবেকের সর্ব্বপ্রথম জাগরণ।

* * *

আমাদের প্রাচীন মহাকবি বাল্মীকি বলছেন যে-সমাজ ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত সেখানে সার্ব্বজনীন শিক্ষা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা শুধু রয়েছে তা নয়, সেখানে এমন ব্যবস্থা হবে যে এমন কেউ থাকবে না যাকে কদন্ন খেতে হয়, যার মাথার জন্য মুকুট নাই বা দেহের জন্য অভ্যঙ্গ নাই, কি এমন কেউ থাকবে না যাকে ঐশ্বর্য্যরাশির হীন ও হেয় দাস হয়ে থাকতে হয়।

* * *

দারিদ্র্য-বরণ মহৎ হতে পারে, উপকারী হতে পারে বিশেষ কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির পক্ষে—কিন্তু যদি একে একটা সর্ব্বসাধারণ বা জাতীয় আদর্শরূপে বিস্তৃতভাবে সংগঠিত করে তোলা হয় তবে জীবন তার সমৃদ্ধি থেকে বিস্তৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

* * *

সামাজিক জীবনের জন্য দারিদ্র্য অবশ্যপ্রয়োজন কিছু নয়, যেমন নয় ব্যাধি প্রাকৃত শরীরের জন্য। জীবন ধারণের ভ্রান্ত অভ্যাস কতগুলি আর সত্যকার সুব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞান, এই হল পরিহার্য্য বিশৃঙ্খলার জন্য দোষী যে সেই কারণ।

* * *

স্পার্টা নয়, এথেন্সই হল মানবজাতির পক্ষে প্রগতির প্রতীক। প্রাচীন ভারত ছিল সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে দিয়েছিল বিপুল বিত্তের এবং বিপুল ব্যয়ের আদর্শ। আধুনিক ভারত একটা সার্ব্বজনীন বৈরাগ্যের ধারায় চলে জীবনের ক্ষেত্রে একান্ত দরিদ্র হয়ে পড়েছে, দুর্ব্বলতা আর অবনতির মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

* * *

স্বপ্নেও ভেবোনা স্থূল দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার হলেই মানুষ সুখী বা তৃপ্ত হয়ে যাবে, কিম্বা সমাজ তার যত ব্যাধি, দুর্ভোগ আর সমস্যা থেকে মুক্ত হবে। এটি হল সর্ব্বপ্রথম আর সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজন। অন্তরাত্মার সংগঠনে যতদিন ত্রুটি রয়ে যাবে বাহিরে ততদিন থাকবেই অশান্তি, বিশৃঙ্খলা আর বিপ্লব।

* * *

অন্তরাত্মার যদি থাকে বৈকল্য, শরীরে তবে ব্যাধি দেখা দেবেই। কারণ মনের পাপই হল শারীর পাপের প্রচ্ছন্ন কারণ। সেই রকম মানুষের সামাজিক জীবনে দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ

ফিরে ফিরে আসবেই জাতির মন যত দিন থাকবে অহংকারের অধীন হয়ে। মানুষকে তার অহং থেকে উদ্ধার করবার পক্ষে ধর্ম আর দর্শনই হল শ্রেষ্ঠ উপায়—তখনই অন্তরের স্বর্গরাজ্য স্বতই প্রতিফলিত হবে বাহিরের দিব্য-রাজ্যে।

* * *

মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ধর্ম মানবজাতিকে বলেছিল—"মানুষ, তুমি তোমার পার্থিব জীবনে একটা পাপ বস্তু, কৃমিকীট হয়ে আছ ভগবানের দৃষ্টিতে; অহং বর্জন কর, জীবন ধারণ কর একটা ভাবী স্থিতির জন্য, নিজেকে অনুগত করে রাখ ভগবানের আর ভগবানের প্রতিভূ পুরোহিতের কাছে।" ফল কিন্তু মানবজাতির পক্ষে একান্ত শুভ হয় নাই। আধুনিক জ্ঞান মানবজাতিকে বলছে, "মানুষ, তুমি হলে ক্ষণজীবী প্রাণী মাত্র, প্রকৃতির কাছে তুমি হলে সামান্য পিপীলিকা বা কৃমি, বিশ্বের মধ্যে তুমি হলে ক্ষণস্থায়ী বিন্দু একটি। সুতরাং তোমার জীবন হবে রাষ্ট্রের জন্য, পিপীলিকার মত অনুগত হয়ে থাক অতিজ্ঞ শাসক আর বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের কাছে।" এই জীবনবেদও কি পূর্বোক্তটির চেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করবে?

* * *

বেদান্ত বলছে অন্যপক্ষে, "মানুষ, তোমার প্রকৃতি তোমার সত্তা ভগবানের সঙ্গে এক তোমার অন্তরাত্মা এক তোমার মত আর সকল মানুষেরই সঙ্গে। ওঠ জেগে, নিজেকে উন্নত করে চল, যতদিন না লাভ কর তোমার পূর্ণ ভাগবতস্বরূপ, তোমার নিজের অন্তরে, অন্যের অন্তরে যে ভগবান তাঁর জন্য জীবন যাপন কর।" এই যে জীবন বেদ তখন দেওয়া হয়েছিল অল্পসংখ্যকের জন্য, এখন তা দিতে হবে সমগ্র মানবজাতিকে তার মুক্তির জন্য।

* * *

মানবজাতি সব চেয়ে বেশি এগিয়ে চলে তখনি যখন সে বেশি জোর দেয় প্রকৃতির পক্ষে তার যে প্রয়োজন তার উপর, তার স্বাতন্ত্র্যের উপর, তার সার্বভৌমিকতার উপর।

* * *

পশুধর্মী মানুষ হল গোড়ার স্থিনিত আরম্ভ, বর্তমানের প্রাকৃত মানুষ, বিচিত্র ও জটিল, তা হল মধ্যপথের, কিন্তু অতিপ্রাকৃত মানুষ হল মানবীয় জীবনযাত্রার জ্যোতির্ময় অতিলৌকিক লক্ষ্য।

* * *

জীবনের, কর্মের তোমার পরিসমাপ্তি হয়, লাভ করে তার শাশ্বত বিজয়-মুকুট যখন তুমি অর্জন করেছ সেই শক্তি যে তোমার প্রতি চিন্তায় ও প্রতি ক্রিয়ায়, তোমার শিল্পে, সাহিত্যে, জীবনক্ষেত্রে, তোমার গৃহে, তোমার রাজ্যশাসনে, তোমার সমাজে, তোমার অর্থার্জনে, অর্থ সঞ্চয়ে ও অর্থব্যয়ে প্রতিমূর্ত প্রকাশিত করে ধরবে সেই অদ্বিতীয় অবর সত্তাকে তাঁর এই নিম্নস্থ নরসত্তার মধ্যে।*

* Thoughts and Aphorisms থেকে। অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

অন্তর্যামিনী

[সেণ্ট জন অফ্ দি ক্রস*]

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

খৃষ্টিয়ান সাধনায় "অন্তরাত্মার ঘোর রাত্রি" বলে একটি উপলব্ধির কথা বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে। আমি তার নাম দিয়েছি "অন্তর্যামিনী"—দুই অর্থে: (১) অন্তরের যামিনী বা রাত্রি, (২) এই রাত্রিই হল আমার অন্তর্যামী শক্তি অর্থাৎ ভিতর থেকে, পিছনে লুকিয়ে থেকে যিনি শাসন করেন, পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে, এই কালরাত্রি হল সাধক যখন সাধারণত জীবনের দিনের আলো ফেলে এসেছেন, পুরাতন আকর্ষণ সব কেটে ফেলেছেন অথচ নতন জীবনের উষা যখনও এসে দেখা দেয় নাই—পুরাতন গিয়েছে নূতন আসে নাই, লৌকিক স্পৃহা লুপ্তপ্রায় অথচ অতিলৌকিক উপলব্ধি তার স্থান গ্রহণ করে নাই, এই যে শূন্যস্থান বা সন্ধিস্থল তাই হল অন্তরযামিনী।

অন্তরাত্মার রজনী দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ রজনী। কারণ পুরাতনকে তুমি ছেড়েছ, ছাড়তে চেয়েছ, কিন্তু সে ত তোমাকে সহজে ছাড়ে না। পথে চলেছ, এক সঙ্গে সমস্ত ভারখানি এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত হওয়া যায় না—এক এক করে পুঁটুলিগুলি ছাড়তে হয়। তোমার মনে প্রাণে অঙ্গি মজ্জায় মিশে রয়েছে, গাঁথা রয়েছে প্রাকৃত জীবনের বৃত্তি সব। বাহিরে নিবৃত্ত হলেও ভিতরের বৃত্তি উৎপাটিত হয় না—তাদের মূল সুদূরপ্রসারিত তোমার অবচেতনার নিশ্চেতনার অন্তস্তলে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে যার সঙ্গে তোমার বর্ত্তমান সংগ্রথিত। তা ছাড়া নিজস্ব প্রকৃতিও সব কথা নয়—বিশ্বের সত্তা তোমার মধ্যে অনুস্যূত—সমস্ত জগতের, দেশে ও কালে প্রসারিত একটা বিশাল ভার, তার সংহত শক্তি নিয়ে তোমাকে পিছনে নীচে টেনে রেখেছে। আরো বিপত্তি, কেবল যে তোমার ব্যক্তিগত কিম্বা অজ্ঞান প্রকৃতির বিশ্বগত অন্ধশক্তিই যে তোমার অন্তরায় হয়ে আছে তা নয়, চক্ষুষ্মান অপশক্তিও সব রয়েছে তোমার চারিদিকে, তারা জাগ্রত, তারা চতুর, তারা শক্তিমান—ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, ছলে বলে কৌশলে তোমাকে পথভ্রষ্ট বিপর্য্যস্ত করতে চায়। এর মধ্যে সহায় হল তোমার নিষ্ঠা, তোমার আস্পৃহা যা ডেকে নিয়ে আসতে পারে ভগবৎ-প্রসাদের শক্তি।

অন্তরাত্মার এই যে অন্ধকার, এই যে দুর্যোগ, আমাদের বৈষ্ণব পরিভাষায় এরই নাম বিরহ। শ্রীরাধার বিরহ, বৈষ্ণব কাব্যে সাহিত্যে কত যে বিবৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। তবে বৈষ্ণবভাব পূর্ণরূপে একান্তরূপে মানুষী আকারেই দেখান হয়েছে—

---

*St. John of the Cross.

এতখানি মানুষী সে বস্তু যে তার দৈবী বা আধ্যাত্মিক স্বরূপ আর লক্ষ্য হয় না। এমনটি বোধ হয় আর কোথাও পাই না। একমাত্র তুলনাস্থল কথঞ্চিৎ হয়ত বাইবেলের 'গানের গান' বা 'সলোমনের গান'। বাহ্যপ্রতীকের মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত—বৈদিক যাগযজ্ঞের বা বাহ্য ক্রিয়াবলির অন্তরালে তার আধ্যাত্মিক স্বরূপ যেমন অন্তর্হিত সেইরকম। "সবার উপরে মানুষ বড়" কথাটি এমনভাবে প্রযুক্ত হয়েছে যে আর কোন সত্তার স্থানই হয়নি। এ হল বৈদিক ঋষিরা তাঁদের বাক্য সম্বন্ধে যে বলে গিয়েছেন "নিণ্যা বচাংসি" (গূঢ় বাক) তার চয়ন। ভাগবত প্রেমে ও মানুষী প্রেমে বৈষ্ণব কবি কোন পার্থক্যই দেখান নাই। দুই-ই এক অভিন্ন যেন। মানবীয় প্রেমের পূর্ণ চিত্রই ভাগবত প্রেমেরও চিত্র—ভাগবত প্রেমে অধিকন্তু বা অপর কিছু লক্ষ্য করি না। শ্রীরাধার বিরহের চিত্র—

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতের কথা॥
সই, কে বলে পিরীতি ভাল,
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।

আর মিলনের চিত্র এই চণ্ডীদাসেই—বিদ্যাপতির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম—

বিগলিত কেশ কুন্তল শিখি-চন্দ্রক
বিগলিত নিতল নিচোল।
দুঁহুক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল।

অবশ্য সাধক-কবির ভাষা প্রায়ই তির্যক ভাষা—সাধারণ সহজ নয়, আবরণী বা প্রহেলী হেঁয়ালী ভাষা। বৈষ্ণব কবিরা একেবারে বিপরীত ভাষা গ্রহণ করেছেন—আধ্যাত্মিক নয়, চয়ন আধিভৌতিক ভাষা-রূপ। আবরণ-আচ্ছাদন কম করে, কথঞ্চিৎ স্বচ্ছ করে ধরেছেন এক মধ্যপন্থী সাধক-কবি—তাঁদের বলা যেতে পারে আধিদৈবিক শ্রেণী। আমাদের আউল-বাউল এই শ্রেণীর—যেমন

মনের মানুষ এই মানুষে আছে, লও চিনে
তারে দেখবে মন জ্ঞান-নয়নে।
রসিক যারা জানবে তারা
অরসিকে জানবে কেনে॥

কিম্বা

যার ভিতরে জ্বলছে আগুন,
যাওয়া পেলে জলে নিশুণ

গুণ পুড়ায়ে হয় নির্গুণ
হয় না বেদের আচারে ॥

আমাদের মধ্যযুগের এক বিরাট সাধকগোষ্ঠীরই এই ভাষা—কবীর, নানক, সুরদাস এমনকি মীরাবাঈ, এবং দক্ষিণী আলওয়াড়গণ। আবার সব আবরণ যাঁরা খুলে ফেলেছেন—তত্ত্বম্ পূষণ অপাবৃণু—বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক রূপ তাঁদের উপলব্ধিকে দিয়েছেন এমন ঋষি কবিও আছেন —উপনিষদ ও গীতার কবি। উপনিষদ যখন বলছেন

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্...

গীতা যখন বলছেন

অনিত্যমসুখনিমং লোকং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্—

তখন পাই আধ্যাত্মিক কবিত্বের পরম বিশুদ্ধাকৃতি।

সে যা হোক। আজ একজন সাধকের কথা বলব—তিনি খৃষ্টিয়ান—তাঁর নাম "সেণ্ট জন অফ দি ক্রস"—তাঁর আবির্ভাব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন দেশে। আমি বলেছি খৃষ্টিয়ান সাধনায় ঘোর রাত্রির কথা অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। সেখানে সুখের চেয়ে দুঃখকেই মহীয়ান গরীয়ান করে ধরা হয়েছে—যে যত বড় দুঃখী সে তত বড় খৃষ্টভক্ত সাধক। ভারতে বলা হয় আনন্দই পরম সত্য, একমাত্র সত্য, প্রথম মধ্য এবং শেষ সত্য। খৃষ্টিয়ানেরা বলবে আনন্দ (Felicity, Beatitude) আছে বটে চরমে ওপারে—দুঃখই তার পথ, দুঃখই তার প্রতীক, দুঃখেই তা নিহিত।

এই দুঃখের রাত্রি—ঘনঘোর অন্ধকার—বিরহক্লিষ্ট চেতনার অবস্থা, খৃষ্টীয় সাধক কি ভাবে বলছেন শুনুন—

আমি বেঁচে আছি কিন্তু না বেঁচে থেকে,
আমার অন্তরে
কত আশায় আশায় রয়েছি
মৃত্যু যেন আমার হয়,
কারণ মৃত্যু যে হয় না।
অন্তরে আমার আমি ত আর বেঁচে নই
আমার ভগবান ছাড়া আমি ত বেঁচে থাকতে পারি না।
আমি যদি না থাকি, তিনি যদি না থাকেন
তাহলে কোন জীবন হবে সে?
এযেন সহস্র মৃত্যুর সঙ্গে দেখা আমার,
তবু আমি যে রয়েছি জীবনের আশায়,
মৃত্যু হবে বলে
কারণ মৃত্যু যে হয় না।

এই যে জীবন আমি যাপন করি
তা হল জীবনের নাস্তি—
সেখানে আমার মরণই হয় শুধু,—
যতদিন না তোমার মধ্যে ফিরে পাই সে জীবন।

ভগবান, ভগবান শোন আমার বিনতি
এ জীবন ত আমি চাই না,
হয় যেন আমার মৃত্যু
কারণ মৃত্যু ত আমার হয় না।

তোমা ছাড়া আমি
কোন জীবন ধারণ করব?
যদি না সে-জীবন হয়
আরো, আরো বেশি মৃত্যু;
করুণা কর আমায়
বুক বেঁধে চলেছি যদি বা কখন
মৃত্যু এসে যায়, কারণ মৃত্যু ত হয় না।

এই মৃত্যু থেকে আমায় উদ্ধার কর
ভগবান, দাও আমায় জীবন
আমায় আর পাশবদ্ধ করে রেখো না
এতখানি কঠোর বন্ধনের মধ্যে।

সাধকের প্রার্থনা পূর্ণ হল কি রকমে? কি রকমে তাঁর মৃত্যু থেকে উদ্ধার হ'ল, পাশবন্ধন থেকে মুক্তি হ'ল? বিচিত্র সে অনুভূতি রাত্রির বাইরে নয়, রাত্রির ভিতরেই তিনি পেলেন আলো—"তমসস্পারে", তমসা পার হয়ে ওপারে গিয়ে নয়, এপারে এখানে থেকেই, তমসার গুঢ় অন্তরে আরো প্রবেশ করেই। কি যাদুবলে দুঃখ রূপান্তরিত হয়ে গেল পরম সুখে, বিরহের মধ্যে ফুটে উঠল মিলন-বৈদগ্ধ্য? শুনুন—

আঁধার রাতে এক,
ব্যাকুল প্রেমশিখা প্রজ্বলিত করে তোলে তাকে—
কি শুভ সুযোগ,
চলে গেলাম, দেখলে না কেউ,
আমার শান্ত-সুপ্ত নীড়খানি যেখানে।

অন্ধকারের মধ্যে, নিশ্বিঘ্নে,
গা ঢেকে গুপ্ত সিঁড়ি বেয়ে—
আহা কি শুভ সুযোগ—
অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে
আমার শান্ত-সুপ্ত নীড়খানি যেখানে।

রাত্রির সুযোগে
গোপনে কেউ যখন আমায় দেখছে না
আমিও কিছুই দেখছি না
আর কোন আলো নাই, দিশারী নাই,
হৃদয়তলে জ্বলছে যা সেইটুকু ছাড়া।

সে-ই আমায় চালিয়ে নিয়েছে,
মধ্যাহ্নের আলোর চেয়েও সুনিশ্চিত তা,
চালিয়ে নিয়েছে সেইখানে অবধি
যেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে
সেই জন যাকে আমি জানি খুব ভাল করে
এমন জায়গায় যার খোঁজ কেউ পায় না।

রাত্রি! দিশারী রাত্রি!
উষার চেয়ে মনোরম তুমি রাত্রি।
রাত্রি তুমি মিলিয়ে ধর
প্রিয়কে প্রিয়ার সঙ্গে
প্রিয়া যার প্রিয়ের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে।*

---

*মূলটি এখানে এত সুন্দর যে উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না—

O noche que guiste
O noche amable mas que el alborada
O noche que juntaste
amado con amada
amada en el amada transformada

সেইজন্যে তার আটাশ্বর স্পেনীয়—ইংরাজীতে চলায় (বা ফরাসীতে বলায়—Ronsard) যে রকম সৌষ্ঠবহানির অবকাশটা—দুই একটা অক্ষর পরিবর্ত্তনের ফল হলেও আধুনিক স্পেনীয় ভাষা যাঁরা জানেন তাঁদের পক্ষে খুব কঠিন বোধ হবে না।

এই রহস্যের পথ হল কবিসাধক নিজেই বলছেন দার্শনিক ভাষায়, Union con Dios por el camino de la negacion espiritual (Union with God by the way of spiritual negation) অর্থাৎ আমরা যাকে বলি নেতিপথে সাযুজ্য। এ হল যারো কবি যেমন বলেছেন

O cauteria suave !
O regalada llago !
কি শীতল এই দাহন।
কি সম্পদ এই ক্ষত।

এক অনুরূপ বার্তাই কি দিচ্ছেন না আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আকুল আহ্বানে

কোথায় আলো ! কোথায় আলো !
ওরে বিরহানলে আলো তারে আলো !

বাউল কবিসাধকও প্রায় ঐ একই ভাবের ভাবুক হয়ে তাঁর আটপৌরে ভাষায় বলে গিয়েছেন—

যার হয়েছে মহাব্যাধি
কি করবে তার সামান্য জ্বরে।
সাগরে শয়ন যার
শিশিরে কি সে ডরে ?
যাহার প্রেম বিরহ-দুঃখ
দূরে আছে স্বকীয় সুখ,
সে না পায় বাহ্যিক দুঃখ
যে ভেসেছে দুঃখ-সাগরে।
যার চিন্তামণির চিন্তা প্রবল,
কুচিন্তা সকল রসাতল,
শ্রীগুরুর চরণ করে সম্বল,
রূপ দেখে অন্ধকারে।

ঠিক এইখানে স্পেনীয় কবির বিশেষত্বটি লক্ষ্য করবার। তাঁর চেতনায় বিরহ যে মিলনে পরিণত হয়ে গিয়েছে, অন্ধকার যে নিবিড় আলো হয়ে উঠেছে তা যেন অতি সহজে বিনা আড়ম্বরে, নিঃশব্দে, গোপনে আপনা থেকে আর অবশ্যম্ভাবে একান্তভাবে। দুই বিপরীত প্রান্ত এক হয়ে গিয়েছে, দ্বন্দ্ব একত্বে মিলে গিয়েছে যেন যাদুর বলে।

তার হেতু এমন একটা মনচিত্ততা তিনি লাভ করেছিলেন, অথবা তাঁর ইষ্টের ঈপ্সিতের মধ্যে এতখানি নিজেকে নগ্ন করে দিয়েছিলেন যে বিপরীত কোন কিছু তাঁকে স্পর্শ করতে

পারেনি। দুঃখকে দুঃখ বলে, রাত্রিকে রাত্রি বলে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। ফলতঃ জীবনে তাঁকে অশেষ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে—তাঁর ধর্ম তাঁর সাধনা গোঁড়াপন্থী ছিল না বলে বহু বৎসর কারাগারের চূড়ান্ত শারীরিক উৎপীড়ন ভোগ করে থাকতে হয়েছে। এবং তাঁর মৃত্যুও হয় অতি দুঃখকষ্টের ভিতরে অতি করুণভাবে। শরীর তাঁর ক্ষতে ব্রণে পরিপূর্ণ হয়ে প্রায় পচে গলে চলেছিল। অথচ তাঁর সৌবনস্য, তাঁর স্নিগ্ধ হাসি, এমন কি তীক্ষ্ণ রসবোধ অটুট অব্যাকৃত রেখেছিলেন সকল বাহ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যে। খৃষ্টীয় সাধকের মধ্যে এই স্মিতহাসি অতি বিরল।

আমরা মানুষকে ছোট করিয়া সমাজকে বড় করিয়াছি। সমাজ কিন্তু তাহাতে বড় হয় না, কুদ্র নিষ্ফল ও নিষ্ফল হয়। আমরা সমাজকে উত্তরোত্তর উন্নতির উপায় নহে, নিষ্প্রাণ ও বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছি, ইহাই আমাদের অবনতির নিশ্চেষ্টতার, নিরুপায় দুর্বলতার কারণ। মানুষকে বড় কর, অন্তরস্থ ভগবান যেখানে গুহাহিতে বিরাজমান সেই মন্দিরের সিংহদ্বার খুলিয়া দাও, সমাজ আপনিই মহান্, সর্বাঙ্গসুন্দর, উন্মুক্ত উচ্চাদর্শ প্রকাশের সকল ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীঅরবিন্দ

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অগ্নির্বাণ

[দ্বিতীয় পাদ—সম্যক্-জ্ঞানযোগ]

৮

চিত্তবিমুক্তি

যেমন দেহকে আমাদের ছাপিয়ে উঠতে হবে, তেমনি চিত্তকেও। স্থূল ও চঞ্চল প্রাকৃত চিত্তকে রূপান্তরিত করতে হবে প্রভাস্বর যোগচিত্তে।

ইন্দ্রিয়সংবিৎ (sensation), ভাব (emotion), ভাবনা, বাসনা এবং অহন্তা —এইগুলি প্রাকৃত চিত্তের উপাদান। এদের কেন্দ্রবিন্দু হল অহং। অহং আর আত্মার তফাতের কথা আগেও বলেছি—একটিতে চেতনার সঙ্কোচ, আরেকটিতে বিস্তার। আমাদের জীবভাবের নিয়ামক হল অহং। অহংকে জড়িয়ে আছে বাসনা, তাকে বলতে পারি অহংএরই শক্তিরূপ। তদ্দৃষ্টিতে আকাশ আর প্রাণে যে-সম্পর্ক, অহং আর বাসনাতেও সেই সম্পর্ক। আকাশে প্রাণের স্পন্দন যেমন এই বিশ্বজগৎ, তেমনি অহংএর বাসনার স্পন্দনই আমাদের প্রাকৃত জীবন।

* * *

বাসনা অবিদ্যাচ্ছন্ন। চাই-চাই করা তার স্বভাব, কিন্তু কি চাই কেন চাই তা সে স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারে না। জীবন চলছে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির তাগিদে, তার দৃষ্টি উদার বা গভীর নয়, অনপেক্ষও নয়। সঙ্কীর্ণ অহংএর পরিবর্ত্তনই তার লক্ষ্য, তাকে ছাপিয়ে তার ভাবনা বৃহতে ছড়ায় না বা গভীরে ডোবে না। ইন্দ্রিয়সংবিৎ ভাব আর ভাবনা সাধারণত এই অবিদ্যাচ্ছন্ন অহন্তাক্লিষ্ট প্রাকৃত জীবনেরই তাঁবেদার। সে-জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বসঙ্কুল, বিক্ষুব্ধ, অচরিতার্থতায় ম্রিয়মাণ। এককথায় প্রাকৃত জীবন দুঃখময়, যদিও সে-দুঃখের সম্পর্কেও আমাদের চেতনা অপরিশীলিত এবং ক্ষীণ।

অথচ পরাভবের এই দৈন্যই যে আমাদের জীবনের নিয়তি তা নয়। এমন-একটা সময় আসে যখন প্রবৃত্তির বেগ আমাদের বশীভূত হয়, বাইরের প্রতি বীতরাগ হয়ে দৃষ্টি ফেরে অন্তরের দিকে। তখন যে-আমি জীবনের সহস্র ঝামেলায় জড়িয়ে আছে তারও পিছনে দেখতে পাই তটস্থ এক আমিকে—যে শুধু এই নয়, আরও-কিছু। এই বিবিক্ত গুহাহিত আমির চেতনা যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের মাঝে, বাইরের জীবনে ততই ছন্দ আসে।

ক্ষুদ্র ব্যক্তি-সত্তাকে (personality) উদ্‌বুদ্ধ করে। এই ব্যক্তিসত্তা বস্তুত আমাদের চৈত্যসত্তারই বিভূতি। প্রাকৃত জীবনকে অপ্রাকৃত চৈত্যসত্তার অধীন করাই হল যোগ-জীবনের প্রথম লক্ষ্য।

বুভুক্ষা রসতৃষ্ণা বা বাসনা অবর প্রাণের ধর্ম। তার তর্পণের উপাদান ছড়িয়ে আছে বাইরে, ইন্দ্রিয় তার খবর এনে দেয় মনের কাছে। ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনার সঙ্গে মন যখন জড়িয়ে যায়, তাকে তখন বলি ইন্দ্রিয়মানস (sense-mind)। ইন্দ্রিয়মানসের জোটানো উপাদানকে আস্বাদনের সামগ্রী করে তোলে মনের যেসব বৃত্তি, তাদের দিয়ে গড়ে উঠেছে ভাবমানস (emotional mind)। সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য আগ্রহ-নির্বেদ বা রুচি-অরুচির দ্বন্দ্ব হল তার বৃত্তি। ইন্দ্রিয়মানস আর ভাবমানসেরও পরে আছে ভাবনামানস (thought-mind)—বিবেক বিতর্ক বিচার স্মৃতি কল্পনা এইসবের সহায়ে বিষয়ের তত্ত্ব আহরণ করা তার স্বভাব। এই তিনটি মানসের ক্রিয়াই প্রাকৃত ভূমিতে প্রাণবাসনার সংস্পর্শে অবিশুদ্ধ।

* * *

মানসক্রিয়ার নিরোধ নয়, চাই তাদের বিশোধন এবং উন্নীপন। নিরোধ সাময়িক উপায় হতে পারে, কিন্তু যোগের চরম লক্ষ্য তা নয়। চিত্তবিশোধনের অন্যতম সাধন হল চিত্তপ্রসাদন। চিত্ত প্রসন্ন হয় চৈত্যসত্তার উদ্‌বোধনে। এই প্রাকৃত সত্তার পিছনেই তার অধিষ্ঠান। আমাদের সবারই মাঝে রয়েছে এক চিরকিশোর—অসীমের সঙ্গে তার নিত্যযোগ, তাঁরই আলোয় সে উদ্ভাসিত, তাঁরই আনন্দে নন্দিত। এইটি আমাদের চৈত্য-সত্তা, পরম-পুরুষের পরা-প্রকৃতি। এটি এখন আড়াল হয়ে আছে; অন্তর্মুখ আত্ম-সচেতনতার দ্বারা একে নিয়ে আসতে হবে চেতনার পুরোভাগে। 'আমি তাঁর'—এই প্রসন্ন বোধের মাধুরীতে তখন শুরু হবে মানসের রূপান্তর। ইন্দ্রিয়মানস তখন মাত্রাস্পর্শের ভিতর দিয়েই পাবে ব্রহ্মসংস্পর্শের আনন্দ, অর্থাৎ তার কাছে হবে মধুময়। ভাবমানসের প্রসন্নতায় হৃদয় খুলে যাবে রসের ফোয়ারা, তাঁকে ভালবেসে সবাইকে ভালবাসার সহজ আকুতিতে হৃদয় ভরে উঠবে কানায়-কানায়। ভাবনামানসের মাঝেও আসবে অভাবনীয় রূপান্তর: বুদ্ধি হবে স্বচ্ছ এবং ক্রান্তদর্শী, মানসোত্তর বোধির জ্যোতিঃসম্পাতে তর্কের কৌটিল্য ঘুচে গিয়ে ঋজুচারী মেধার আবির্ভাব হবে।

প্রাকৃত চেতনার যত অনর্থ, অহংগ্রন্থিই তার মূল। অহন্তার স্বরূপ হল আত্মরতি—'আপনারে শুধু ঘিরিয়া-ঘিরিয়া ঘুরে মরা পলে-পলে'। জাগ্রত মনের মাঝে এই আত্মরতি মুখর হয়ে উঠলেও বস্তুত তার শিকড় রয়েছে অবচেতনার গভীরে। সেখানে বুভুক্ষু আদিম-প্রাণের সম্মোহ চেতনাকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মন যদি-বা জাগে, প্রাণ কিন্তু কিছুতেই জাগতে চায় না, জান্তব বাসনার পাকে-পাকে কেবলই সে জগৎটাকে জড়িয়ে ধরে।

* * *

মনোময় পুরুষকে এই অন্ধ প্রাণবাসনার জাল হতে মুক্ত হতে হবে। মুক্তির সাধন হল প্রকৃতি আর পুরুষের বিবেক। অপরা-প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বসঙ্কুল অতৃপ্ত—তার পরিচয় আমরা ভাল করেই জানি। জানিনা, এই প্রকৃতিই আমাদের আত্মপ্রকৃতির সবটুকু নয় কিংবা এরই বশীভূত হয়ে থাকা আমাদের নিয়তি নয়। এই প্রকৃতির পিছনেই আছে এক প্রশান্ত নির্দ্বন্দ্ব প্রসন্ন চেতনা—নির্মেঘ আকাশের স্বয়ম্প্রভ ব্যাপ্তির মত। এই চেতনা পুরুষ। প্রকৃতির উপদ্রষ্টৃরূপে এই পুরুষকে আবিষ্কার করতে হবে।

উপদ্রষ্টৃত্ব একদিনে আসে না, দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর প্রযত্নের দরকার হয় তার জন্যে। সবসময় হুঁশে থাকা তার একটা প্রধান উপায়। আমার অগোচরে আমার মাঝে কিছুই ঘটবে না, স্বভাবের বশেও যা আসবে, প্রশান্ত অপলক দৃষ্টিতে আমি তা চেয়ে দেখব। উপনিষদে একে বলা হয়েছে সননস্কতা।

সননস্কতায় চেতনা দুভাগ হয়ে পড়ে—একভাগ দেখে, আরেকভাগ ভোগে বা করে। দ্রষ্টৃত্ব পুরুষের, ভোক্তৃত্ব আর কর্তৃত্ব প্রকৃতির। এতদিন তিনটি বৃত্তিতে জড়াজড়ি হয়ে ছিল, সননস্কতায় দ্রষ্টৃত্ব আর-দুটি বৃত্তি হতে আলাদা হয়ে যায়। আমার মাঝেই আমার আরেক আমিকে খুঁজে পাই, সে-আমি সবাইকে আশ্রয় দিয়েও কিছুতেই কারও সঙ্গে জড়িয়ে যায় না। প্রাক্তন সংস্কারের বশে ভোগ আর কর্মের প্রক্ষোভ তখনও হয়তো চেতনার প্রশান্ত আকাশে মেঘবাষ্পের মত ভেসে আসে, কিন্তু আকাশকে তা আচ্ছন্ন করে না।

আচ্ছন্নতা আসে অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব হতে। অনুরাগ-বিরাগ হল প্রাকৃত চিত্তের রস। অনুরাগ-বিরাগের দোলাতেই সে-চিত্ত সজাগ থাকে। এই দোলাটুকু না থাকলে সে জড় হয়ে যায়। আবার থাকলেও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল অবসাদ। যেদিক দিয়েই দেখি না কেন, প্রাকৃত চিত্ত আচ্ছন্নতার হাত হতে কিছুতেই মুক্তি পায় না।

অপ্রাকৃত চেতনা অনুরাগ-বিরাগের ঊর্ধ্বে। অথচ তা জড় নয়। দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে চেতনাকে নিতে গিয়ে যে-প্রত্যাহারের (withdrawal) দরকার হয়, তা-ই চেতনাকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ রাখে। সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতির পরিণাম তখনও চলতে থাকে, কিন্তু তা হয় সদৃশপরিণাম—দ্বন্দ্বসঙ্কুল চেতনার মত গুণের বিভঙ্গ তার মাঝে নাই। এই চেতনার প্রধান ধর্ম হল সমত্ব (equality)।

সমত্ব আর ঔদাসীন্য এক কথা নয়। ঔদাসীন্যে বিরক্তির একটুখানি ছোঁয়াচ থেকে যায়। সে যেন দেখে না, দেখতে চায় না। কিন্তু সমত্ব কোনও-কিছু হতেই মুখ ফিরিয়ে থাকে না। আকাশে আলো ফুটুক আঁধার নামুক, আকাশ কোনও-কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করে না। আলো আর আঁধার দুইই তার কাছে সমান। তারা মূল্যহীন বলেই যে সমান তা নয়। উপরভাসা মূল্যের চাইতে একটা গভীরতর মূল্য আছে বলেই তারা সমান। এই মূল্য দেয় আত্মবোধের প্রশান্তি।

দু'চোখ ভরে সব যে দেখছে, দৃশ্যকে সে ভোগও করছে। কিন্তু সে-ভোগ সুখ-

দুঃখের নয়—প্রসাদের। আমি আলোতেও প্রসন্ন, আঁধারেও প্রসন্ন। তাইতে আমি আলো-আঁধারের ঊর্ধ্বে। এই প্রসন্নতার অনুভবে নিজেকে আমি যেন নতুন করে আবিষ্কার করি। এই বোধই আমার মাঝে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রসন্নতা আমার স্বভাব। আপনাতে আপনি থেকে আমি নন্দিত। স্বত-উৎসারিত সেই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সব-কিছুর উপরে —নির্মেঘ আকাশের নীলিমাকে করে গাঢ়তর, শুভ্র মেঘকে জ্যোতির্ময়, কালো মেঘকে ইন্দ্রধনুচ্ছটায় মনোহারী।

এও প্রকৃতির কাজ—কিন্তু অপরা-প্রকৃতির নয়, পরা-প্রকৃতির অথবা পরমা-প্রকৃতির। দ্বন্দ্বের জগতের মূলে সে আবিষ্কার করে এক নির্দ্বন্দ্ব আনন্দের দোলা। আনন্দের প্রতিবোধ থেকে জাগে শক্তি, পুরুষের মাঝে জাগে ঈশনা।

আলো আর আনন্দ যদি আত্মচৈতন্যের স্বরূপসত্তা হয়, তাহলে তা জগতেরও সত্য। যেমন তা অন্তর্জগতের সত্য, তেমনি বহির্জগতেরও। আমার অন্তর্জগতে যে-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি বুদ্ধির শুদ্ধি একাগ্রতা এবং বৈরাগ্যের দ্বারা। আমাতে যে-শক্তি ঘনীভূত হল, বাইরে তা ছড়িয়ে পড়বেই। পরিবেশ ততক্ষণই আমায় নিয়ন্ত্রিত করে যতক্ষণ আমি পশু। আমি যখন মানুষ, তখন আমিই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করি। করি আত্মচৈতন্যের ঈশনার দ্বারা। যাঁর ঈশনা আছে, প্রকৃতির তিনি শুধু উপদ্রষ্টা বা অনুমন্তাই নন, তিনি তার ভর্তাও। উপদ্রষ্টা কিছু বলেন না, শুধু চেয়ে দেখেন। অনুমন্তা আরও স্বপ্রতিষ্ঠ বলে প্রসন্ন হয়ে সায় দিয়ে চলেন। ভর্তা প্রশাসন করেন। তাঁর প্রশাসন অন্যকে রূপান্তরিত করে ঋতে, প্রক্ষোভকে প্রসন্নতায়, অবসাদকে বীর্যে।

* * *

এমনি করে প্রকৃতির ঈশান হওয়াতেই চিত্তবিমুক্তির সার্থকতা। বিমুক্ত চিত্ত নির্দ্বন্দ্ব। কিন্তু আগেই বলেছি, যে-নির্দ্বন্দ্বতা ঔদাসীন্য নয়, জগৎকে প্রত্যাখ্যান করা নয়। অবশ্য চেতনাকে কূটস্থ করবার জন্য প্রত্যাখ্যানের একটা সাময়িক উপযোগিতা আছে। কিন্তু সাধনার তা আদিপর্ব মাত্র। আমাতে টলছি না—সুখেও নয় দুঃখেও নয়, এ হল সাধনার নেতির দিক। ইতির দিক হল, যা আসুক না কেন, তাহতেই আনন্দ ঠিকরে পড়ছে। আনন্দ প্রতিফলিত হচ্ছে অন্যবস্তু হতে নয়, আত্মচৈতন্য হতেই তা উৎসারিত হচ্ছে।

আত্মবোধ প্রগাঢ় না হলে এটি হয় না। তার জন্য শুধু বাসনানাশনকে নিরাকৃত করলেই হবে না, ভাবনানাশনকেও নিরাকৃত করবার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। সাধনার প্রথম অবস্থায় ভাবনা (thought) দিয়ে বাসনাকে দূর করতে হয়। ভাবনা তখন অবলম্বন করে বিবেক বিচার এবং বৈরাগ্যকে। এদের অনুশীলনে ভাবনা বাসনার আবিলতা হতে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়। কিন্তু তবুও তার মাঝে বৃত্তির তরঙ্গ থাকে। যে-আত্মসত্তা থেকে ভাবনার উদ্ভব, তার সঙ্গে যোগযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নিস্তরঙ্গতা সম্ভব নয়। শুধু বোধ অর্থাৎ নির্বিশেষ সত্তার বোধ নিস্তরঙ্গ, উপনিষদের ভাষায় তা 'অস্তীত্যুপলব্ধিঃ'। এই

অস্তিত্বের বোধে ভাবনাকে ডুবিয়ে দিতে হবে। বোধ ভাবনা নয়, এমন-কি বহির্জগতের বোধও তা নয়। সব বোধই নির্বন, নিঃশব্দ। সত্তা আর বোধ অভিন্ন। এক সত্তা এক বোধ অন্তরে-বাইরে সব-কিছুকে নিঃশব্দে ছেয়ে আছে।

এই নৈঃশব্দ্যে অবগাহন চিত্তবিমুক্তির অপরিহার্য সাধন।

৯

অহন্তাবিমুক্তি

দেহচেতনা প্রাণচেতনা আর মনশ্চেতনা—এই হল প্রাকৃত জীবনের উপাদান। এ-তিনের মূলে রয়েছে অহং। আমার দেহ, আমার প্রাণ, আমার মন। কিন্তু আমি কি?

একা আমিই আছি, তা তো নয়। আমাকে ঘিরে আছে বিরাট্ একটা জগৎ। সেখানে শক্তি আর চৈতন্যের খেলা। শক্তির অকূল সমুদ্র, আমি তার মাঝে একটা বুদ্‌বুদ মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে এই শক্তির সমুদ্র অচেতন, অর্থহীন। কিন্তু তার বুকে অহন্তার এই বুদ্‌বুদটি সচেতন এবং সার্থক।

ঐ সমুদ্রসোনার কোনও লক্ষ্য থাক বা না থাক, অহংএর কিন্তু একটা লক্ষ্য আছে। সে চায় বৃহৎ হতে, সমৃদ্ধ হতে। বীজ বনস্পতিতে বিস্ফারিত হতে চায়। এই চাওয়াতে প্রকাশ পায় শক্তি, আর পাওয়াতে আনন্দ। চেতনার বিস্ফারণ, শক্তির নিরঙ্কুশতা আর আনন্দের অক্ষয়তা—এইগুলি পুরুষার্থ।

কিন্তু চাওয়া আর পাওয়ার তারতম্য আছে। অহংএর পরিতৃপ্তি সবার পক্ষে এক নয়, তার মধ্যে একটা পর্বভেদও আছে।

প্রথম চাওয়া বুভুক্ষু প্রাণের চাওয়া, বাইরের উপাদানকে আত্মসাৎ করে অহংএর পরিতর্পণ। পরিতর্পণ বস্তুত চেতনারই হয়, কিন্তু চেতনা তখন বস্তুনির্ভর। বস্তুর ইন্ধন না জোগাতে পারলে চেতনা নিবে যায়। অহং তখন পরতন্ত্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর।

কিন্তু চেতনার বিস্ফারণই যখন অহংএর নিয়তি, তখন আত্মস্বার্থকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে সে পারে না। চেতনার স্বভাববশেই সে অনুভব করে, খেয়ে যে-সুখ, খাওয়ানোর সুখ তার চাইতে বড়। একার অহং তখন ছড়িয়ে পড়ে দশের মাঝে। শুধু শরীরযাত্রা-সিদ্ধির জান্তব আদর্শ রূপান্তরিত হয় লোকসংগ্রহের মানব আদর্শে। অহং বিস্ফারিত হয়, তবুও সে বস্তুনির্ভরই থাকে।

প্রবৃত্তিপথের সীমা এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে বিশুদ্ধ অহংএর বা আত্মভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না। চেতনার স্বভাববশেই কারও-কারও মাঝে সে-সন্বিৎসা জাগে। কেননা

কেবল প্রবৃত্তিমুখেই চেতনার গতি নয়, একটা নিবৃত্তিমুখী টানও তার মাঝে আছে। সে যেমন বস্তুর আকর্ষণে বাইরে ছোটে, তেমনি আবার অন্তরের তাগিদে ভিতরেও গুটিয়ে আসে। কর্ম আর বিশ্রাম, জাগরণ আর নিদ্রা—জীবনের এই যুগল ছন্দ। প্রবৃত্তিতে যেমন আনন্দ, নিবৃত্তিতেও তেমনি। বরং একদিন বোধ হয়, প্রবৃত্তির আনন্দ পরতন্ত্র, কিন্তু নিবৃত্তির আনন্দ স্বতন্ত্র। প্রবৃত্তিতে আমি জড়িয়ে যাই, নিবৃত্তিতে মুক্ত থাকি। প্রবৃত্তির অহং অবিশুদ্ধ, নিবৃত্তির অহং পরিশুদ্ধ। সে-ই আমার সত্যকার আমি।

অধ্যাত্মচেতা অন্তর্মুখ হয়ে তাই সত্য আমির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। খুঁজতে গিয়ে কারও আমি মহাশূন্যের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। কারও আমি আদিত্যদ্যুতিতে আকাশের বুকে ঝলমলিয়ে ওঠে। মহাশূন্য বা আদিত্যদ্যুতি দুইই অসংখ্যেয়। সেখানে বহু নাই, আছে এক, অথবা কিছুই নাই। কিন্তু কারও আমি হাজার তারার মেলায় একটি তারা হয়ে জ্বলতে থাকে। তার যেমন আকাশ আছে, তেমনি আছে ধ্রুবসত্তার নিশ্চিন্দ্রটিও।

অহন্তার বিস্ফারণের এই ছবি। এ থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু আপনাকে নিয়ে থাকা কখনও আমাদের পুরুষার্থ হতে পারে না। জ্ঞান প্রেম আনন্দ শক্তি —কিছুরই পরিপূর্ণ চরিতার্থতা আসবে না, যদি নিজেকে না ছড়াতে পারি। উপনিষদের ঋষি তাই বলেন, 'ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি'—ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। আমার সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধ আমিই 'অল্প' যে-আমি বিশ্বাত্মক অথবা বিশ্বোত্তীর্ণ তা-ই ভূমা।

বিশ্বময় নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ারও দুটি রীতি আছে—একটি আধিভৌতিক, আরেকটি আধ্যাত্মিক। অহংব্যাপ্তির আধিভৌতিক রূপ ফুটে ওঠে তথাকথিত মানব-হিতৈষণায়। এইটিই এখনকার লোকায়ত ধর্ম। কিন্তু একেই একান্ত এবং পরম ধর্ম বলতে পারি না। একথা মানি, নিজেকে পরের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া খুব ভাল। কিন্তু দেখতে হবে, কোন্ আমিকে ছড়াচ্ছি। আমি যাকে হিত বলে করছি, তার কোনও শাশ্বত মূল্য আছে কি না। শুধু প্রবৃত্তির চরিতার্থতাকেই আমি হিত বলছি, না নিবৃত্তিকেও তার যথাযোগ্য মূল্য দিচ্ছি। প্রবৃত্তির সাধনায় মুক্তির উৎকর্ষ হতে পারে এবং তা নিশ্চয়ই হিতকর। কিন্তু চেতনার চরম বিকাশ মুক্তিতেই নয়। মুক্তির পরেও আছে বোধি, আছে আত্মবোধ। তার জন্য চাই নিবৃত্তির সাধনা, নিজের মাঝে গুটিয়ে গিয়ে আপনাতে আপনি থাকবার অভ্যাস।

স্পষ্টতই এ-সাধনা একার। প্রবৃত্তিতে আমি সবার সঙ্গে মিলতে পারি, কিন্তু নিবৃত্তিতে একা হয়ে যাই। এই একাকিত্ব কখনও-কখনও সর্বনিরোধের পথ ধরে। নিরোধে সব ফাঁকা হয়ে যায়। তাকে বলে ব্রহ্মনির্বাণ। জ্ঞানযোগের এও একটা লক্ষ্য। কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য নয়। শূন্যকে না পেলে পূর্ণকে ঠিকমত পাওয়া যায় না, একথা সত্য। কিন্তু তা বলে শূন্যই সব নয়। শূন্যের বুকে পূর্ণ—এই হল সমগ্র সত্যের ছবি। গীতার 'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্'এর মাঝেই অনুভব করতে হবে প্রপঞ্চের উল্লাস।

এ-অনুভব ব্যক্তির। প্রত্যেকের কাছে আত্মসত্তাই মুখ্য। আমাকে কেন্দ্র করে

আমার জগৎ। আমি তার কেন্দ্র থেকেই পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ি। বাষ্টির সঙ্গে সমষ্টির এই সত্তাকার সম্পর্ক। আত্মকেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে তবে সবার মাঝে ছড়াতে হবে। নইলে যে ছড়াবে, সে শুধু আমার অহং জাতির অহং বা প্রবৃত্তির অহং। অহংকে কখনও বলতে পারি না ক্ষেমঙ্কর। এই অহংএর নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই সব ছেড়ে সব পাওয়ার সাধনা।

* * *

অহংএর শিকড় নেমেছে একেবারে পাতাল পর্যন্ত। চেতনার চলন মূঢ়তার মাঝে একধরনের অহং লুকিয়ে থাকে, যোগীরা যাকে বলেন 'অস্মিতারূপ ক্লেশ'। 'ক্লেশ' মানে চেতনার আচ্ছন্নতা এবং সঙ্কীর্ণতা। অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব একটা ক্লেশ। কিন্তু তাতে মানুষ তবুও সচেতন থাকে। এর চাইতেও দুর্জয় ক্লেশ হল 'অভিনিবেশ' বা চেতনার সুপ্তি—যেমন অসাড়তায় মোহে বা নিদ্রায়। চেতনা তখন ফিরে যায় আদিম অবিদ্যার অন্ধতমিস্রায়। বোধের সম্ভাবনা তখনও থাকে, নইলে আবার জেগে ওঠা সম্ভব হত না। কিন্তু সে-বোধ চেতনার কুক্ষিগত। এই বোধকে জড়িয়ে যে-অহং থাকে, তাকে বলতে পারি 'মূলাহন্তা' (Substratum Ego)।

মূলাহন্তার কোনও বিশেষণ নাই। কিন্তু স্বয়ং নির্বিশেষ হয়েও স্থূল অহন্তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সে বীজভূমি। এই মূলাহন্তা যেমন প্রকাশ পায় প্রাকৃত চেতনার মূঢ়তায় বা সুপ্তিতে, তেমনি যোগের পথেও সে প্রকাশ পায় এক গভীর তমিস্রায়—যোগীরা যাকে বলেন প্রকৃতিলয়। অনেক অপ্রজ্ঞার সমাধি এই প্রকৃতিলয় ছাড়া কিছুই নয়। এইসব সমাধি হতে ব্যুত্থানের পর চেতনার কোনও গভীর রূপান্তর হতে দেখা যায় না, অথচ সাধকের মনে আত্মপ্রসাদ জন্মে, আমি একটা কিছু পেয়েছি। এই মূঢ়তা প্রাকৃত অহঙ্কারের চাইতেও মারাত্মক।

অন্ধতমিস্রার গহ্বর হতে অহংএর শিকড়কে উপড়ে ফেলতে হবে, নতুবা চেতনার রূপান্তর ঘটবে না। যেমন আলোর ভুবনগুলিকে জয় করতে হবে, তেমনি করতে হবে আঁধারের ভুবনগুলিকেও। দুটি ভুবনই বিধৃত রয়েছে পরম পুরুষের মাঝে। আলোর ভুবনে তিনি ব্যক্ত, অন্ধকারের ভুবনে অব্যক্ত। অব্যক্তের মাঝে শক্তি কুণ্ডলিত হয়ে থাকে, আর সেই কুণ্ডলনের চাপেই ব্যক্ত ভুবনের প্রকাশ হয়। শক্তির অব্যক্ত কুহর হতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি ঘটানোই পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ জীবের। জীব অব্যক্ত আর ব্যক্তের মধ্য-বিন্দু। অব্যক্তের নিগূহিত শক্তি অভিব্যক্তির পথে তাই প্রকাশ পায় জীবচেতনাকেই আশ্রয় করে।

জীব চিদাভাসমাত্র নয়, চিদ্ঘন। দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি কিংবা তাদের সমষ্টিই জীব নয়। এগুলি প্রকৃতির সৃষ্ট জীবাধার মাত্র। আধারে নিষিক্ত চিদ্বীজই হল জীব। এই বীজ গোড়ায় বহু, কিন্তু পরিণামে এক। পরিণতির পর্বে-পর্বে বহুর উল্লাস।

চরমে ব্রহ্ম জীবঘন—যেন মোচাকের মত। একের বহুভাবনাই জীবভাবের হেতু।

বহুর মাঝে আপাতবিরোধ যেখানে, সেইখানে অহং। আমার অহংএ আর তোমার অহংএ তাই রেষারেষি। অথচ দুজনেই বুঝতে পারি, গরমিলটাই সত্য নয়, দুয়ের গভীরে কোথাও একটা মিল আছেই। যেখানে মিল, সেখানে আর অহং নয়, জীব বা আত্মা। তাকে নিয়েও বহুর উল্লাস চলতে পারে। তার মাঝে তখন আর বিরোধ থাকে না, থাকে বৈচিত্র্য। অবশেষে বহুর সবগুলি দল সমাহৃত হয় একের মাঝে। বলতে পারি, বিরোধে অহন্তা, বৈচিত্র্যে পূর্ণাহন্তা, আর সমাহারে পরাহন্তা। সমস্তটাই অহংএর বিকাশ আত্মাতে অথবা ব্রহ্মে।

* * *

অহন্তার সঙ্কোচ ঘুচিয়ে জীবকে পৌঁছতে হবে ব্রহ্মে। পৌঁছবার অনেকগুলি পথের কথা এদেশের সাধনশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাদের মোটামুটি দুটি ভাগ—একটি জ্ঞানপথ, আরেকটি ভক্তিপথ। জ্ঞানীরা ব্রহ্মকে বলেন নির্বিশেষ। তাঁদের পরম উপলব্ধি হল শূন্যতা অথবা 'একং সৎ'। এই উপলব্ধিতে জীব বা জগৎ কিছুই থাকে না। ভক্তের ব্রহ্ম সবিশেষ। জীব-জগৎকে তাঁরা মায়া বলে উড়িয়ে দেন না, বলেন তারা ব্রহ্মেরই পরিণাম। আবহমান কাল দুটি মতের মাঝে একটা বিরোধ চলে এসেছে। লক্ষণীয়, কর্মযোগ কোনও পথেই তার স্বাভাবিক মর্যাদা পায়নি। কর্ম সাধনার গোড়ার দিকে থাকতে পারে, কিন্তু সিদ্ধের কোনও কর্ম নাই, থাকলেও তা গৌণ।

বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের সাধনায় এমনতর কোনও একদেশিতা নাই। জ্ঞান ভক্তি আর কর্ম তিনের সাধনাই তার মাঝে ওতপ্রোত। আর প্রত্যেকটি সাধনায় ব্যক্তিগত বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তর—চেতনার এই তিনটি পর্বই পরিপূর্ণ মর্যাদা পায়। জ্ঞানের সাধনায় পূর্ণযোগী যেমন অন্তরাবৃত্ত হয়ে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি সে-অপরোক্ষানুভূতির বীর্যকে ছড়িয়ে দেন বিশ্বের সর্বত্র এবং ব্যাপ্তিচৈতন্যের ক্রমবিরলতায় সব-কিছুকে ছাপিয়ে থাকেন নৈঃশব্দ্যের মহারিক্ততায়। প্রেমের সান্দ্রতা তাঁকে নিয়ে যায় অদ্বৈতানুভবের তুঙ্গতায়, অথচ আত্মচৈতন্যের আততত্বীতে সেখানে কাঁপে বিলাসের মূর্ছনা, উপচিত হৃদয়ের আনন্দ উছলে চলে ভুবনের কূলে-কূলে। তাঁর কর্মপ্রেরণা সেই দিব্য সঙ্কল্পেরই পরীবাহ : আত্মসত্তার গহনে নৈষ্কর্ম্যে নিস্পন্দ হয়েও তিনি বিশ্বকর্মার অতন্দ্র আত্মবিচ্ছুরণের নিমিত্ত—প্রবেগে অবৃষ্য, রূপায়ণে ক্ষিপ্র, সেবায় মধুর।

প্রাকৃত চেতনার ক্ষুদ্র অহন্তা এমনি করে রূপান্তরিত হয় ভূমার, পূর্ণাহন্তা বিস্ফারিত হয় পরাহন্তার লোকোত্তর অনির্বচনীয়তায়।

* * *

অহন্তার এই রূপান্তরের জন্য সাধককে প্রথমটায় নেতিবাদের আশ্রয় নিতেই হয়। নেতিবাদ মোক্ষবাদেরই অঙ্গীভূত, আর তার সাধন হল মন। সংসারে বাঁধা পড়েছে মন,

সুতরাং বাঁধন খসাবার ভারও তাকেই নিতে হবে। বহুর সঙ্গে জড়িয়ে সে ছোট হয়ে আছে, তাকে মুক্তি দিতে হবে একের আনন্দে। এক আকাশ, অনন্ত আকাশ—আপনাতে আপনি শুদ্ধ হয়ে আছে, অনুস্যূত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সবার মাঝে। এই অন্তহীন একের ভাবনায় মনকে অভ্যস্ত করতে হবে। তাকে বারবার বলতে হবে, বহু সত্য নয়, সান্ত সত্য নয়—সত্য সেই অন্তহীন এক।

একের ভাবনা মনের পক্ষে সহজ নয়, কিন্তু বোধের পক্ষে সহজ, বোধের তা স্বধর্ম। মন আর বোধের তফাতটুকু সাধনার গোড়ায় বুঝে নেওয়া ভাল। মনের স্বভাব হচ্ছে টুকরা-টুকরা করে দেখা, আর বোধের স্বভাব হচ্ছে একরসপ্রত্যয় দ্বারা আস্বাদন করা। মনশ্চেতনা যেন আকাশে তারার ফুলকি, আর বোধ যেন সমস্ত আকাশ-ছাওয়া সবিতার আলো। স্ফুলিঙ্গ-চৈতন্যের পিছনেই আছে ব্যাপ্তিচৈতন্য, যা দেহ-প্রাণ-মন সবকিছুকে আবিষ্ট করে ইন্ধনে তাপ আর দীপ্তির মত জ্বলছে। মন যখন একেকে ভাবে, তখন এই বোধের একটুখানি আভাস পায়। আভাসকে প্রভাসে রূপান্তরিত করবার প্রাথমিক দায় তার।

এই দায় নির্বাহ করা যেতে পারে দুই উপায়ে—পুরুষকারের দ্বারা আর প্রসাদের দ্বারা। পুরুষকার চাইবে তীব্রসংবেগের ফলে শক্তিকে উজানমুখে ঠেলে তুলতে। মনের পক্ষে এটা কতকটা সহজ। কি চাই তা সে না বুঝুক, কিন্তু কি যে চাই না তা সে বেশ বুঝতে পারে। যা চাই না, তাকে সে সবলে প্রত্যাখ্যান করে চলল—এর নাম নেতিসাধনা। নেতিতে সব দৃশ্য মুছে ফাঁকা হয়ে গেল। সেই ফাঁকাকে এসে পূর্ণ করল অদৃশ্যের আলো। মন সে-আলোতে হারিয়ে গেল। যা থাকল, তা বিশুদ্ধ বোধ মাত্র।

বোধে মনের সমাধি। সমাধির পর আবার ব্যুত্থান হয়, মন আবার এখানে ফিরে আসে। কিন্তু প্রথমেই সে রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসতে পারে না। যেমন সে হুড়হুড় করে উপরে উঠে গিয়েছিল, তেমনি ধুপ করে আবার নীচে নেমে আসে। সমাধি আর ব্যুত্থানে তাই একটা বিরোধ দেখা দেয়। মনে হয়, সমাধি ওখানেই, এখানে নয়। তবে আর এখানে ফিরে আসা কেন? মন তখন ধরে সর্বনিরোধের পথ, পুরুষকারের যা চরম পরিণাম।

পুরুষকারে অহংএর খাঁজটুকু থেকেই যায়। সম্যক্-দর্শনের পক্ষে সেটা মস্ত বাধা। কিন্তু পুরুষকারকে প্রসাদের অধীন করলে আর এ-ভয় থাকে না। প্রসাদের অনুভব হয় বোধে। বাইরে আলো, ভিতরে আলো—সব আলোর আলোময়। তারই ছোঁয়ায় কমল ফুটছে। আভাস তিলে-তিলে প্রভাস হয়ে উঠছে। আমি কি নাই? আছি, কিন্তু তাঁর দ্বয়ে। পুরুষকার কি নাই? আছে, কিন্তু সে সেই পরমপুরুষেরই পুরুষকার। তাঁরই সাধনা আমার মাঝে। তাঁর হওয়াই আমার হওয়া।

এই হওয়ার মাঝেও একটা তীব্র সংবেগ আছে। কূলছাড়া অতলের পানে সমুদ্রের আকর্ষণ—এও আছে বই কি। কিন্তু যে-সমুদ্র অকূলে টানে, সেই সমুদ্রই আবার কূলে

ফিরিয়ে দেয়। বিন্দুতে তখন সিন্ধুর বৈভব, সমাধি আর ব্যুত্থানে একাকার। এই হল গীতার ব্রাহ্মী স্থিতি, বরবীরার সহজ সমাধি।

* * *

যেমন করেই হ'ক, কূলের মায়া ছাড়তেই হবে, সমুদ্রের অতলপানে ঝাঁপ দিতেই হবে। একদিকে আছে প্রকৃতির অতলান্ত—'অপ্রকেতং গহনং গভীরম্'; সেইখানে আমার অব্যাকৃত অহন্তার মূল। আরেকদিকে আছে পুরুষের অতলান্ত—অবর্ণ জ্যোতির পারাবার; সেইখানে আমার পরাহন্তার অনুপাখ্যতা। দুটি সিন্ধু এসে মিলেছে একটি বিন্দুতে। সেই বিন্দুতে অবগাহন না করলে অহংএর বিমুক্তি হয় না।

বিমুক্ত অহং রূপান্তরিত হয় আত্মভাবের চিদ্‌ঘনতায়। নারায়ণ তখন নরে, নরে-নারায়ণে এক যুগনদ্ধ অদ্বৈত সত্তা।

১০

সর্বাত্মভাব

জ্ঞানযোগের প্রথম সাধনা হল নিজেকে জানা। যে-আমি দেহ-প্রাণ-মনের নানা বিকারের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, সে-আমি সত্য নয়, আমার আত্মস্বরূপ নয়। আত্মা অপরা-প্রকৃতি হতে বিবিক্ত, কূটস্থ শাশ্বত অস্তিত্বের প্রত্যয়ে অবিচল। এই আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের মুখ্য পুরুষার্থ।

আগেই দেখেছি, অপরা-প্রকৃতি হতে আত্মচৈতন্যকে বিবিক্ত করতে গিয়ে একেবারে শূন্যতার অতল গহনে অবগাহন করতে হয়, নইলে মূলাহন্তার শিকড়কে উপড়ে ফেলা যায় না, সুতরাং বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের বিজ্ঞানও সম্ভব হয় না। প্রকৃতি হতে মুখ ফিরিয়ে এই গভীরে তলিয়ে যাওয়ার পথকে বলতে পারি বিনাশের পথ। এই পথ ধরলে, এখন আমাদের চেতনার উপরে জাগ্রতের যে-দৃঢ়নিষ্ঠ তা শিথিল হয়ে যায়, অতিপরিচিত এই দেখাশোনার জগৎটা ক্রমে আবছা হয়ে আসে, জোর ধরে অন্তরাবৃত্ত চেতনায় এক স্থির দীপ্তি। বাইরের জগৎ তখন স্বপ্নবৎ, যেন ছায়ার ছবি। অন্তশ্চেতনা আরও প্রগাঢ় হলে আর সে-ছবিও থাকে না, স্বপ্ন পরিণত হয় সুষুপ্তিতে। তখন জগৎ নাই, শুধু আমিই আছি; অথবা আমিও নাই, আছে এক প্রপঞ্চোপশম অস্তিত্বের শূন্যতা।

এই বিনাশের অনুভব চেতনার উত্তরায়ণের পরম কোটি। অনেকের মতে এই নীরূপ নির্বাস নৈঃশব্দ্যে অবগাহন করাই জ্ঞানযোগীর পরম পুরুষার্থ। বিনাশদ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হতেই হবে, আঁধারে ঝাঁপ দিয়ে আঁধারের গ্রন্থিকে বিকীর্ণ করতেই হবে, তাতে সন্দেহ

নাই। কিন্তু তবুও জানতে হবে, বিনাশ (Non-being) পরমার্থের একটি বিভাব মাত্র, তার তুল্যবল আরেকটি বিভাব হল সম্ভূতি (Becoming)। বিনাশ মৃত্যুতরণ; কিন্তু অমৃতের সম্ভোগ সম্ভূতিতেই। বৈবস্বত মৃত্যুর হৃদয় হতে অমৃতদ্যুতিকে ছিনিয়ে এনে মর্ত্যের প্রতীতিতে প্রতিষ্ঠিত করা—নচিকেতার দুঃসাহসী জৈত্র অভিযানের এই পরম তাৎপর্য।

* * *

অহন্তার সঙ্কোচ হতে মুক্ত হয়ে আত্মচৈতন্য বৃহৎ হবে এবং সেই বৃহৎ চৈতন্য জগৎকে আবৃত করবে—বস্তুত এই হল আমাদের পরম পুরুষার্থ। অপরা-প্রকৃতি হতে অতএব জগতের মায়ার খেলা হতে নিজেকে সরিয়ে নিই বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপকে পাবার জন্য। সেই প্রগাঢ় পাওয়ার সুষুপ্তিকে আবার এই জাগ্রতে ফিরিয়ে আনতে হবে, জাগ্রতে যে বহুর খেলা তার সর্বত্র অনুস্যূত এবং অবগাঢ় দেখতে হবে সেই পরম এককে। যিনি সবার অতীত, তিনিই সব-কিছু হয়েছেন, যিনি 'একং সৎ' 'তদ্ বৃহৎ' বা ব্রহ্ম, তিনিই এই বহুর খেলা বা বিশ্ব। সুতরাং ব্রহ্মের কাছে বিশ্ব ব্রহ্মের প্রতিষেধ নয়। এই বৃহৎকে যখন মানি আত্মচৈতন্যে পাই, যখন অনুভব করি 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', তখন জগৎকেও সেই অনুভবের বিচ্ছুরণরূপে পাই। সুষুপ্তির আনন্দঘন একরস প্রত্যয় তখন জাগ্রতের প্রত্যেকটি অনুভব হতে বিকীর্ণ করে পরমের হিরণ্যদ্যুতি। জগৎ তখন ব্রহ্ম; অর্থাৎ জগতের প্রতিটি অনুভব তখন সচ্চিদানন্দ-ঘন। অনুভব আমারই অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের তা প্রস্ফুরণ। অতএব যেমন 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—অনুভবের এই এক কোটি, তেমনি 'সর্বমাত্মৈব'—অনুভবের এই আরেক কোটি। সোজা কথায় ব্রহ্ম জগৎ এবং আত্মা একে তিন, তিনে এক। যে-আত্মচৈতন্য বৃহৎ হতে গিয়ে মহাশূন্যতায় হারিয়ে যায়, সে-ই আবার ফিরে আসে জগৎ হয়ে। এই উছিয়ে যাওয়া আর ভাটিয়ে আসাতেই অধ্যাত্মসাধনার পরিক্রমা পূর্ণ হয়।

যে-চেতনা উছিয়ে গেল, সেই চেতনায় ভাটিয়ে এসে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। চোখ বুজে অন্তরের গভীরে যাঁকে দেখছিলাম, চোখ মেলে বাইরে যে তাঁকেই দেখছি। দেখছি, 'এঁকেবেঁকে অকার এঁকে চলছে নিরাকার।' অন্তরে যাঁকে পাই, বাইরেও যদি তাঁকে না পাই, তাহলে তো পাওয়া পূর্ণ হল না।

অন্তরের পাওয়া যখন সত্যি-সত্যি গভীর হয়, তখন বাইরটা কিছুতেই তার স্বাদ সাধতে পারে না, অন্তরের রঙে বাইরটাও তখন রঙীন হয়ে ওঠে। বাইরের দোলায় অন্তরও তখন গভীরের কাঁপনে কেঁপে ওঠে। এটা অসম্ভব কিছুই নয়, চিদ্‌বিলাসের এই রীতি। প্রাকৃত জীবনেও দেখি এর ব্যত্যয় নাই। হৃদয় যখন পূর্ণ, জগৎ তখন মধময়; আর জগতের মাধুরীতে হৃদয়ের আরও উল্লাস। পুরুষ আর প্রকৃতিতে তখন বিরোধ নাই, তখন 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং'—ওও পূর্ণ, এও পূর্ণ।

শূন্যতার অনুভব থেকে এমনি করে পূর্ণতার উপচে ওঠা, সব-কিছুকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার সব-কিছুকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরা—এরই নাম সর্বাত্মভাব বা আত্মচৈতন্যের বিশ্ব-চৈতন্যে পরিব্যাপ্তি। এর জন্য দুটি সাধনার প্রয়োজন—এক সত্ত্বশুদ্ধি, আরেক অন্তরা-বৃত্তি বা নিজের গভীরে ডোবা। আপনাতে আপনি থাকা—এ হল মুখ্য সাধন। আত্মবোধকে জাগ্রত করতে হবে সবার আগে। এখন আমরা নির্বোধ, দুনিয়ার সব কাজই করছি বটে, কিন্তু হুঁশে করছি না। কাজের ভূত চিন্তার ভূত ঘাড়ে চেপে আছে, আর সে-ই সব করিয়ে বা ভাবিয়ে নিচ্ছে। তাকে বিদায় করি এ-সাধ্য আমার নাই। একমুহূর্ত আমি খেলা-চ্ছলেও নিষ্কর্মা বা নিশ্চুপ হতে পারি না। তাই আমার গভীরের আমিকে আমি জানি না। সত্য বলতে এটা আমার পৌরুষের পরাভব। আমি প্রকৃতির ক্রীড়নক।

এই পরাভবের গ্লানি দূর হতে পারে অন্তরাবৃত্তিতে, একাগ্রভূমিক ধ্যানচিত্ততায়। চেতনার স্রোত প্রবৃত্তির খাতে বয়ে চলেছে, তাকে বাঁধলেই তার শক্তি বাড়ে। গুম্ফিত চিত্তশক্তিকে অন্তর্মুখ করলে সে সূচীমুখ হয়ে আবিষ্কার করে চেতনার আরও গভীর স্তর। আত্মবোধ তখন জাগ্রত হয় এবং সেই বোধ প্রাকৃত চেতনার প্রশাস্তা হয়ে তার বৃত্তিগুলিকে পরিশুদ্ধ করে। বৃত্তির এই পরিশুদ্ধিকেই বলে সত্ত্ব শুদ্ধি। শুদ্ধ সত্ত্ব এই জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারকে মার্জিত করে। প্রাকৃত ব্যবহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনুরাগ বিরাগ এবং ভয়। এগুলি চিত্তের মল। এতে বস্তুর স্বরূপজ্ঞান বাধিত হয়। কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বের দৃষ্টি স্বচ্ছ উদ্ভাসন এবং প্রসন্ন। এই দৃষ্টিতে জগৎকে সহজরূপে দেখতে পাই। তখন আর জগতে বিকার দেখি না—দেখি বিভূতি, পরম অদ্বৈতের উৎস হতে উৎসারিত বহুর লীলায়ন। নিবৃত্তি তখন প্রবৃত্তির রাশ টেনে রাখে, তাই তার ছন্দ হয় সুষম, কোনও কারণে কোথাও বেচালে পা পড়ে না।

এমনি করে প্রপঞ্চোপশম আর প্রপঞ্চোল্লাস, ধ্যান আর কর্ম, নিবৃত্তি আর প্রবৃত্তি, সুষুপ্তি আর জাগ্রৎ—দুটিই যদি ওতপ্রোত হয়ে থাকে জীবনে, তাহলেই অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্ণতা।

* * *

আত্মচৈতন্যকে বিস্ফারিত করা ব্রহ্মচৈতন্যে এবং সেই চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করা বিশ্বচৈতন্যে—অদ্বৈতসিদ্ধির এই রীতি। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই প্রত্যাক্-বৃত্ত (subjective) অনুভব হতে পৌঁছনো 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই পরাক্-বৃত্ত (objective) অনুভবে। এই হতেই সিদ্ধ হয় 'সর্বমাত্মৈব'। আত্মা ব্রহ্ম আর জগৎ—সম্বোধিতে (integral knowledge) তিন এক হয়ে যায়।

অনুভবের কেন্দ্রে রয়েছে আত্মভাব, কেননা সমস্ত অনুভবের মাঝে একমাত্র আত্মানুভবই হল অপরোক্ষ। আমার যা-কিছু নিবিড়তমরূপে পাওয়া, সে হল আমার চেতনাতেই পাওয়া। অহংচেতনা সঙ্কীর্ণ, তাই সে পায় অল্পকে। আর আত্মচৈতন্য বৃহৎ, তাই সে পায় ভূমাকে। এইজন্য অহংচেতনার আত্মচৈতন্যে রূপান্তরই হল সকল সাধনার গোড়ার কথা।

আত্মচৈতন্যের সর্বাত্মভাবে পরিণামের তিনটি ধাপের কথা বলেছেন উপনিষদের ঋষিরা। অন্যত্র তাকে যাবতা অতিবানসের ত্রিপুটীরূপে বর্ণনা করেছি। তিনটি ধাপ হল আত্মাতে সর্বভূতের দর্শন, সর্বভূতে আত্মার দর্শন এবং সর্বভূতকে আত্মরূপে দর্শন। তিনটি অনুভবই অদ্বৈতানুভব, কিন্তু তাদের মাঝে গাঢ়তার তারতম্য আছে। গোড়াতে একথাও বলে রাখা ভাল, এ-দর্শন নিত্যজাগ্রত ভূমির বা সহজসমাধির দর্শন, নইলে সর্বভূতের কথা এখানে আসত না। জগৎ এখানে মিথ্যা নয়, সত্য এবং আত্মচৈতন্যের অপরোক্ষতার অনপলাপ্যরূপেই সত্য। তবে এও ঠিক, চোখ মেলে পরমার্থসৎকে প্রত্যক্ষ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আগে চোখ বুজতেই হয়। অন্তরের অনুভব পাকা না হলে বাইরের অনুভব সত্য হয় না।

প্রথম অনুভবটি হল আত্মাকে সমস্ত-কিছুর অধিষ্ঠানরূপে দর্শন করা। আত্মচৈতন্য তখন সাক্ষি-চৈতন্য। এই চৈতন্যে জগৎ ভাসছে। আকাশভাবনায় এই অনুভবটি আনা সহজ হয়। আকাশ প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল এবং প্রসন্ন—আলো যাঁধার ঝড় বর্ষণ বিদ্যুৎ সবই চলেছে তার বুকের উপর দিয়ে, কিন্তু তবুও সে অক্ষোভ্য। সাধনার প্রথম অবস্থায় আকাশ-ভাবনা ধরে তিতিক্ষার রূপ। সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের ঝড়ঝাপটা আমার উপর এসে পড়ছে, কিন্তু আমি টলছি না। এই অটলতার ইতির দিকটা হচ্ছে দেহ-প্রাণ-মনব্যাপী এক প্রশান্তির অনুভব। আর এই প্রশান্তি এক নিগূঢ় অস্তিত্বের দ্যোতক।

কিন্তু এই অস্তিত্ব ব্যাপ্তিধর্মা। আত্মচৈতন্যের কেন্দ্রে অস্তিত্বের অনুভবে জগতের প্রলয় হত। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, তখন আমার অস্তিতার বোধ যুগপৎ রয়েছে কেন্দ্রে এবং পরিধিতে। কেন্দ্রে চৈতন্য সংহত, পরিধিতে ব্যাপ্ত। আত্মদীপের প্রভা বিশ্বকে তখন আলোকিত করছে।

এ-দেখা যখন খোলা চোখের দেখা অর্থাৎ এ-দেখায় যখন আমার দেহ-প্রাণ-মন সক্রিয়, তখন এ-দৃষ্টির বীর্য আমার প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটাবে। আমি দেখব এক নতুন চোখ নিয়ে, নতুন প্রাণ নিয়ে সাড়া দেব, এক অনিরুদ্ধ শক্তির প্রপাতে আপনাকে প্লাবিত অনুভব করব।

এই শক্তিপাত অনুভবকে আরও গভীর ক'রে আমায় উত্তীর্ণ করবে দ্বিতীয় পর্যায়ে। তখন দেখব, যে-আমি আমাতে, সেই আমি সবাতে। বলাই বাহুল্য, আমার আমি তখন আর অহং নয়, কেননা অহং কখনও অপরের মাঝে নিজেকে দেখতে পায় না। আবার এ-আমি কূটস্থ আত্মসত্তাই নয় শুধু, এ-আমি সূত্রাত্মা অন্তর্যামী। আমার মাঝে যে পরম আমির অপরোক্ষ অনুভব পাচ্ছি, তাকেই দেখছি ঘটে-ঘটে অনুপ্রবিষ্ট পরিস্পন্দিত এবং বিভাব্যমান। আত্মার সর্বভূত শুধু আছে নয়, হচ্ছেও। বিশ্ব শুধু চৈতন্যে প্রকাশিত নয়, চৈতন্যে স্পন্দিত।

এই চিৎস্পন্দ বা হওয়ার প্রবেগকে একদিন আমার মাঝেও অনুভব করেছিলাম, নইলে অধিষ্ঠান-চৈতন্যে পৌঁছা আমার দ্বারা সম্ভব হত না। কিন্তু সে-অনুভব ছিল বিবিক্ত, বিশ্বেও

যে এই স্পন্দনের বেগ সমানে বয়ে চলেছে, এ-চেতনা আমার মাঝে স্পষ্ট ছিল না। আজ দেখছি বিশ্বের অধিষ্ঠান এবং বিশ্বের স্পন্দনের মূলে একই চৈতন্য। চৈতন্য আর শক্তি পৃথক নয়, স্বরূপেরই রূপায়ণ রূপে-রূপে, ভূতে-ভূতে কোনও ব্যবধান নাই। বহু কোষের সমবায়ে যেমন এক দেহ, তেমনি বহু জীবের সমবায়ে এক বিরাট। শক্তি চৈতন্যেরই তরঙ্গ, আর সেই তরঙ্গায়ণে চৈতন্যের রূপে সংঘনন। বিশ্বরূপ পরম আত্মভাবের চিদ্‌ঘনবিগ্রহ।

[ক্রমশ]

মহামানবের সাগরতীরে

(শ্রীঅরবিন্দের The Ideal of Human Unity—
"বিশ্বজনীন ঐক্যের আদর্শ" অবলম্বনে)

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন থেকে একটা ঘুরো ঘটেচে, মানুষকে এক হতে হবে, শুধু কোনো একটা বিশেষ সমাজের ধর্মের জাতির গণ্ডীর মধ্যে নয়, সারা জগতের মানুষকে। কথাটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে কি এর প্রয়োজন? তার পরের প্রশ্ন মানলুম না হয় দরকার একটা আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হবে কি রকম করে? কে এনে দেবে আমাদের ঐক্য? আর যদিও বা কোনো উপায়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে একটা গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলা যায়, টেকসই হবে কি জিনিষটা?

প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে একটু পুরোনো ইতিহাস ঘাঁটতে হয়। মানুষ যতই না কেন ভাবুক একটা নতুন কিছু করা দরকার, পেছনে যা ফেলে এসেচে তাকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে ফেলতে ক'জন পারে? তাছাড়া যা হোয়ে গেছে সেটাকে মুছে ফেলবার আগে একবার দেখতে দোষ কি তার থেকে কিছু শেখা যায় কি না। ইতিহাসের সার্থকতাই তো ওখানে।

ভারতবর্ষ থেকেই আরম্ভ করা যাক। ভারতের আদিযুগের ঋষি বোলছেন: সম্ গচ্ছধ্বম্ সম্ বদধ্বম্—তোমরা সব এক হও একভাবে কথা বলো—যথা বঃ সুসহাসতি, যেন তোমাদের একতায় কোনো ত্রুটি না হয়। তার পর উপনিষদের যুগে শুনলুম তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ—যিনি চরাচর সর্ব্বভূতকে নিজের বোলে জেনেচেন তাঁর কাছে কেবা আপন কেবা পর। বৌদ্ধযুগে যখন বেদ উপনিষদের মহ একটু ম্লান হোয়ে আসছে, তখনও কিন্তু শুনচি ওই একই কথা: উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্—যন যাদের উদার তাদের সারা পৃথিবীই কুটুম-বাড়ী। তারপর ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় জল বোয়ে গেল, তবুও সেই পুরোনো মন্ত্র শোনা যায় মাঝে মাঝে, কবীর নানক শ্রীচৈতন্যের মুখে, বিবেকানন্দের উচ্চ কণ্ঠে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী পরিকল্পনায়।

ভারতবর্ষ শুধু যদি বাণী দিয়েই ক্ষান্ত হোতো তাহোলে ভারত-ইতিহাসের বিশেষ কোনো সার্থকতা থাকতো না। অতি পুরাতন কাল থেকে দেখে আসচি ভারতের এমনকি রাজনৈতিক ইতিহাসের ঐকান্তিক চেষ্টা কিরকম কোরে তার ঐক্যের আদর্শকে জাতির জীবনে রূপ দেওয়া যায়।

বৈদিকযুগের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি তা থেকে মনে হয় তখন

সমস্ত ভারতবর্ষকে এক-ধর্মরাজ্যপাশে বাঁধা একরকম অসাধ্য ছিল। দেশটা ছিল অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত, তার একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই, আছে শুধু যুদ্ধবিগ্রহের সম্পর্ক। এরকম অবস্থায় জাতির ঐক্যস্থাপনের আশা দুরাশামাত্র। তাই সেযুগের ঋষিদের প্রধান চেষ্টা হোলো যাতে কলহটা একটু কমে, আর দেশের লোক বুঝতে শেখে তারা একই দেবতার উপাসক, একমাত্র মহৎ লক্ষ্য তাদের "আর্য্য" হওয়া, যাকে আমরা বলি মানুষের মতন মানুষ। তখনকার ঋষিরা বুঝেছিলেন সত্যিকারের ঐক্য হোচ্চে আন্তরিক একতা, যার ভিত্তি মনে নয়, আত্মার। তাই তাঁদের চেষ্টা ছিল আত্মার উপলব্ধি। তাঁরা জানতেন ভেতর থেকে মিলতে পারলেই হবে বাইরের মিলন স্থায়ীভাবে। তাঁরা যে খুব ভুল করেননি তার নিদর্শন রোয়েচে পৃথিবীর ইতিহাসে। পারস্যের সাম্রাজ্য, এ্যালেকজান্দারের সাম্রাজ্য, রোমের আধিপত্য কবে কোথায় তলিয়ে গেল কারণ তারা গড়তে চেয়েছিল বাইরে থেকে। বৈদিক ঋষির পরিকল্পিত ঐক্যের আদর্শ এখনও ম্লান হয় নি।

বেদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণযুগে কিন্তু দেখতে পাই বেশ একটা চেষ্টা চোলেচে সাম্রাজ্য গড়বার। রাজারা চেষ্টা কোরচেন রাজচক্রবর্ত্তী হবার, অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যে ঘোড়া পাঠাচ্চেন দেশবিদেশে, রাজসূয় যজ্ঞের সূত্রপাত হোয়েচে। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার একটা জিনিষ আছে। সেটা হোচ্চে এই যে, সাম্রাজ্যস্থাপন কোরতে হোলে যজ্ঞের দরকার, এবং সে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হবেন দেশের অন্যান্য নরপতিরা, তাঁরা মাথা পেতে নেবেন সম্রাটের আধিপত্য। তার মানে সাম্রাজ্য জয় কোরতে হোলে গায়ের জোর চাই, কিন্তু তার ভিত্তি হবে পরাজয়ের গ্লানি নয়, সুযোগ্যের প্রতি সম্মান। সেটা সম্ভব হোতে পারে একমাত্র সর্ত্তে যে সম্রাট যাঁদের জয় কোরবেন তাঁদের মর্য্যাদার হানি কোরবেন না। চাই ছিল প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ, ধর্ম্মরাজ্যের স্বরূপ।

আদর্শের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায় মহাভারতে বর্ণিত প্রাচীন ইতিহাসে। শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন (ইংরাজী "ব্যাস ও বাল্মীকি" পুস্তিকায়) কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের আগে চারবার অন্তত চেষ্টা হোয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করবার। তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পুরু হৈহয় এবং ইক্ষ্বাকুবংশের রাজারা, তাঁদের মধ্যে ভরত, দশরথ রামচন্দ্রের নাম সবাই জানেন। তার একটাও কিন্তু টেঁকেনি শেষ পর্য্যন্ত। কিসের জন্যে টেঁকে নি বলা শক্ত। আদর্শে ত্রুটি ছিল বোলে মনে হয় না। তখনকার ক্ষত্রিয়ের দল বড় বেশী আত্মম্ভর এবং যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, এটা একটা কারণ হোতে পারে। তা সত্ত্বেও তাঁরা যে ধর্ম্মরাজ্যের আদর্শটা নেনে নিয়েছিলেন এটাও বড় কম কথা নয়। তা না হোলে শিশুপালের মতন স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পদার্পণ করে?

শ্রীকৃষ্ণ হয় তো ভেবেছিলেন একটা শেষ চেষ্টা কোরে দেখা যাক যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য স্থায়ী হয় কি না। অনেক চেষ্টার ফলেও যখন তা সম্ভবপর হোলোনা তখন অগত্যা কুরুক্ষেত্র বাধাতেই হোলো। কুরুক্ষেত্রে অনেক ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হোলো বটে, কিন্তু তার ফলে

ভারতের ঐক্যবিধান অনেকটা সহজসাধ্য হোয়ে গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য ক্ষত্রিয়কুল ছিল ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায়। তারা বিনষ্ট হওয়াতে রাজ্যের পরিধি বাড়লো। কুরুক্ষেত্রের পরের যুগে ছোট ছোট রাজ্যের সংখ্যা কমে গেছে; মগধ, কোশল, কৌশাম্বী অবন্তী প্রমুখ ষোড়শ মহাজনপদের নাম সর্ব্বত্র, বৌদ্ধ জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে। এরা যদি খানিকটা সময় পেতো তাহলে হয় তো একদিন স্থায়ী ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হোতে পারতো ভারতবর্ষে, কিন্তু তা হোতে পারলো না। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত থেকে এক নূতন সমস্যা এলো, আজ প্রায় আড়াই হাজার বছর লেগে গেল সেই সমস্যার সমাধান কোরতে।

[ক্রমশ:]

বাসবদত্তা

[অনুবাদ]

শ্রীঅরবিন্দ

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহাসেন, অম্বালিকা, গোপালক, বৎস

গোপালক। অবন্তীরাজ চণ্ড মহাসেন!
আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছি আমি।
আপনার নিদারুণ শত্রু,
যে-বালক আপনার বিজয়ী ও অভিজ্ঞ সুদীর্ঘ বয়সের
সমকক্ষ হয়ে চলেছে
তাকে এই রেখে দিলাম বন্দী
আপনার পদতলে।

মহাসেন। গোপালক,
সাধুবাদ দিই তোমাকে,
তুমি আমার সুযোগ্য পুত্র।
বৎস,—

বৎস। পশ্চিমের সম্রাট!
আপনার জয় হোক।
সমান যুদ্ধে আগে দেখা হয়েছে আমাদের;
এখন একবার মরজি হল
অন্যভাবে আপনার মহত্ত্বের সম্মুখীন হই।

মহাসেন। মরজি হল তোমার, বাছাধন যুবক।
না, তুমি যে নেমেছিলে
তোমার চেয়ে সমৃদ্ধ সৌভাগ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে
এ তোমার সেই দুর্ভাগ্যের পরিণাম।

বৎস। মনে করুন তা-ই।
আপনার শাসনে এখানে আমি।
মহারাজ, আমাকে দিয়ে কী প্রয়োজন আপনার?
কেন জোর করে আপনার রাজগৃহে
আনিয়েছেন আমাকে?

মহাসেন। আমাকে একচ্ছত্র প্রভু রাজা সর্বেশ্বর বলে
পূজা করবার জন্য,
সিন্ধুনদী থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত
সকলের মতো আমার দাক্ষিণ্য আধিপত্য মেনে নিয়ে।

বৎস। ভুল করেছেন আপনি।
এখানে আপনার সম্মুখে পেয়েছেন
সুসমৃদ্ধ কৌশাম্বীর সম্রাটকে নয়,
পেয়েছেন শুধু বৎসকে,
দেবকুলজাত শতনীকের পুত্রকে।

মহাসেন। তাহলে কোথায় কৌশাম্বীর রাজসাম্রাজ্য
যদি এই হিরন্ময় আধারে তা না থাকে?

বৎস। উন্নতশির কৌশাম্বীর সিংহাসন যেখানে।
আপনার জানা উচিত সেকথা।
এক রাজকীয়তা আছে যা রাজাকে ছাড়িয়ে যায়;
বৎস অযোগ্য, বৎস বন্দী ও নিহত হতে পারে
কিন্তু একে বন্দী করা যায় না,
হত্যা করাও যায় না।
আমাদের তুচ্ছ মানবীয় আধারের বহু উর্ধ্বে এ,
এ হল একটা দেশের মহত্ত্ব।
রাজা! একদিন পরীক্ষিত ছিলেন তাই,
অর্জুনের বংশধর জন্মেজয় তাই,
শতনীক তাই,
তাই বৎস।

আর বৎস যখন থাকবে না
তখন মৃত্যুধীন তা বেঁচে থাকবে
আর শতসহস্র রাজার মধ্যে।

মহাসেন। দেখতে যেমন অপরিণত বালক
কথাও বলছ তেমনি
সুবৃহৎ সব ভাবের কথা ;
পরিণত মন মর্ত্যের যাহা নিম্নতন নিশ্চয়তাকে নিয়ে থাকে,
চায় স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি।
আমি এখানে তোমার সুঠাম দেহ পেয়েই সন্তুষ্ট—
রাজকীয়তার ওই নৃন্ময় রূপ ;
কারণ, ওই নিয়েই আমার কারবার,
কোনো সুউচ্চ নিরাকার চিন্তা নিয়ে নয়।

বৎস। আমার দেহ!
যা অভিরুচি হয় করুন একে নিয়ে।
এ আপনার ক্রীতদাস ও বন্দী—
যতখানি আপনার ততখানি আমারও ইচ্ছায়।
বৎসকে নিয়ে যা করতে পারেন,
মহারাজ, তা করুন।
কোনো কিছুতে কৌশাম্বীর রাজমর্যাদাকে
আমি প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ করব না ;
কিন্তু বৎস একান্তই আপনার
আপনার হাতের মধ্যে,
তাকে আমি আপনার লৌহকঠিন ইচ্ছার বিরুদ্ধে রক্ষা করব না।

মহাসেন। বন্দী, ওরকমে তুমি আমার উদ্দেশ্য
এড়িয়ে যেতে পারবে না।

বৎস। আলিঙ্গনে বাঁধছি তাকে।
পালিয়ে যাবার ইচ্ছাই যদি থাকত আমার
তবে আর এখন এখানে আমাকে দেখতে পেতেন না।

লোহার শিক আর কটক দিয়ে
আমাকে বাঁধা যায় না।

মহাসেন। কিন্তু তোমার জন্য রেখেছি অন্য সব কারারক্ষী, বালক।
তারা সশস্ত্র প্রহরীদের চেয়েও নিরাপদ,
তাদের বিরুদ্ধে অসহায় তোমার হাত
তুলবারও সাহস হবে না।

বৎস। রাখুন তাদের,
আমার কোনো আপত্তি নেই।

মহাসেন। তোমার উদ্ধত স্বভাবটি নম্র কর।
বৎসই হও
আর বিশ্ব-বিশ্রুত কৌশাম্বীর রাজাই হও,
এখানে তুমি শুধু আমার বন্দী ও ক্রীতদাস।

বৎস। আপনার কঠোর ভর্ৎসনা আমি গ্রহণ করলাম
যেমন গ্রহণ করেছি বহুদর্শী দেবতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল অবস্থা। আবার,
যেমন তাঁদেরই ভাবানুসারে চলে আমার মন ও কর্ম।

মহাসেন। বৎস, তুমি আমার রাজানুজ্ঞার বিরুদ্ধতা করেছ –
আমি চেয়েছিলাম সব দেশ হোক আমার নিজের ভূমি
নিজের রাজ-ইচ্ছায় কর্ষণ করব বলে।
তুমি নেমেছ সংগ্রামে
আর সংগ্রামে তোমাকে বশ করতে পারিনি,
তোমার অনেয় অতুল প্রতিদ্বন্দ্বী বলেও
নিজের পরিচয় দিতে পারিনি।
এখন আমার দুনিবার মহাসৌভাগ্য
তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে ;
তরুণ বীর, তোমাকে ক্রীতদাস হয়ে
আমার ইচ্ছা পালন করতেই হবে।
তুমি তো জান নিয়ম—
যিনি রাজসূয় যজ্ঞ উদ্‌যাপন করেন

মহান দেবতাদের উদ্দেশ্যে,
অধীন রাজারা ভৃত্যরূপে তাঁকে সেবা করে চলে ;
অনেক অহঙ্কারী রাজা বাধ্য হয়ে এরকম করেছে,
তাদের উজ্জ্বল সূচনা শেষে মহাকালে গিয়েছে তলিয়ে।
এবার আমি আমার পুণ্য দিনগুলি
এক সম্মানা নিরবচ্ছিন্ন রাজসূয়যজ্ঞে
পরিণত করব।
ভরতের উত্তরাধিকারী তুমি। পূর্বেকার অনেক সম্রাটের মহিমান্বিত অনুগামী
এবং মর্ত্যে আমার সমতুল্য।
তোমাকে তোমার চিরজীবন রাখব
আমার স্পর্ধিত মহত্বের অলঙ্কার এবং প্রতীক হিসাবে,
আমার গর্বিত রাজগৃহে
ভৃত্য হিসাবে।
বৎসরাজ, তোমার কচি বয়স অনুপাতেই
তোমাকে রাখলাম
আমার কন্যার দাসরূপে,
তার সখীরা তোমার রক্ষী,
তারা সব অটল প্রহরী—
তাদের গণ্ডী পার হয়ে চলে আসার
সাহসও হবে না তোমার।
রাজী আছ এতে?

বৎস। শুধু রাজী কেন,
সগর্বে সাগ্রহে বরণ করছি—
যেহেতু বাসবদত্তার সেবক হতে পারা
সম্মান, সুখ ও সৌভাগ্য।
আমার মহত্বকে এসব ভুলেই বসবে,
নীচে নামিয়ে ফেলবে না,
রাজা মহাসেন।

মহাসেন। তাহলে নিয়ে যাও, গোপালক,
আমার উপহার এই বন্দীকে

তোমার ভগ্নীর চরণপ্রান্তে।
এর সংগীতের জন্য তৃষিত দেববৃন্দ,
এর তুলিকার কাছে প্রকৃতি স্বয়ং হার মানে,
এর কণ্ঠে গান ভরে দিয়েছে
স্বর্গের জ্যোতির্ময়ী অপ্সরীরা নিজে।
কারণ যা এর, তা-সব তারও।
হাসছ তুমি, বালক।

বৎস। যা আপনি বললেন
তা নিছক সত্য।
তবু হাসলাম এই দেখে—
দৃঢ় ও উন্নত মন যাদের
তারা কেমন কল্পনা করে নেয়
তাদের সকল কর্মের কর্তা তারাই।

(গোপালক ও বৎস প্রস্থান করল যে দরজা দিয়ে তা দিয়ে বাসবদত্তার কক্ষাবলীর দিকে যাবার)

মহাসেন। অঙ্গারিকা! মোহন বালক এ শুধু,
কথার আস্ফালনে ভয় দেখায় আবার আত্মসমর্পণ করে!

অঙ্গারিকা। ও যা তোমাকে দেখিয়েছে, রাজা,
তুমি মাত্র সেইটুকুই দেখেছ।

মহাসেন। তুমি কি শেষে এই কমনীয় বালকটিকে,
রূপে প্রায় তরুণীর মতো যে তাকে
ভূষিত করবে গভীর সব চিন্তা
আর অভ্যস্ত কূটনীতির অধিকারী বলে?
আমি, আমার কাজ করেছি সুন্দর,
এক গভীর অনুপ্রেরণার বশে।

(কক্ষ থেকে প্রাসাদের বহির্ভাগে প্রস্থান)

অঙ্গারিকা। (তার দিকে তাকিয়ে) এরই জন্যে তুমি রেখেছ বাসবদত্তাকে।
নিজের উদ্দেশ্য সাধন করছি ভেবে
ভগবানের ইচ্ছাকেই কার্যত আমরা সফল করে চলি।

(ক্রমশঃ)

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

(১)

আনন্দই স্রষ্টা

প্রশ্ন : যথার্থ আত্মসমর্পণ করতে কি অনেকখানি আধ্যাত্মিক উন্নতির দরকার নয়? যারা অল্পবিস্তর অজ্ঞানের মধ্যেই বাস করছে তাদের আত্মসমর্পণ হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা মানসিক, তা খাঁটি জিনিস হয় না। আত্মসমর্পণ খাঁটি হবার উপায় কি? প্রথম থেকেই আত্মসমর্পণ কি সম্ভব?

উত্তর : ব্যক্তিবিশেষের উপর তা নির্ভর করে। কারো কারো মধ্যে চৈত্তিক বৃত্তির চেয়ে বুদ্ধিগত বোধশক্তির চেয়ে ভাবপ্রবণতার প্রবেগই বেশী প্রবল। বিশেষ কিছু না জেনে, না বুঝে, কিসের থেকে কি হচ্ছে তার কোনো হিসেব না রেখে এমনিতেই তারা ভগবানের প্রতি অন্বয় আকর্ষণ বোধ করে। তখন থাকে একটা প্রবেগ, একটা আকর্ষণ, একটা অভাব —একটা অপরিহার্য প্রয়োজনবোধ।

এরা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়—যদি ভগবৎ-কৃপার গুণে সেই সঙ্গে এমন মনটি তাদের থাকে যে মন কোনো প্রশ্ন করে না, তর্ক করে না, কারকারবার বিস্তার করে না।

সাধারণ বিচারে আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, চৈত্যসত্তার ভিতর দিয়ে যেমনি তারা আত্মনিবেদনের সেই অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছয় যেখানে ভগবৎ-সান্নিধ্য পেয়ে তারা তার সঙ্গে একাত্ম বোধ করছে, অমনি কোথা থেকে তাদের মধ্যে এমন এক অভূতপূর্ব প্রকাশশক্তি এসে যায়, যা তাদের প্রকৃতিতে কখনো জানাই ছিল না।

ফ্রান্সে থাকতে অনেক কাল আগে আমি এমনি একটি ছোটো মেয়েকে দেখেছিলাম। তার শিক্ষাদীক্ষা কিছুই ছিল না। সে অপেরাতে নাচতো, বেশ ভালোই নাচতো। তাদের ঘরের রীতি অনুসারে ছেলেবেলায় মাত্র আটবছর বয়স থেকেই ওতে তাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি না শিখে সে শিখলে নাচ। নিজের কথা কেমন ক'রে প্রকাশ করতে হয় সে তা মোটে জানতোই না। ভিতরে স্পষ্ট বুদ্ধি থাকলেও তার চর্চা হয়নি। কিন্তু সে ভগবানের দিকে ঝুঁকলো, ভগবানের কাছে তার আত্মনিবেদনের আগ্রহ একান্ত হয়ে উঠল।

নাচবার সময় সে এই কথা ভাবতে শুরু করলে যে ভগবানের জন্যই সে নাচছে, তার নাচও তাতে খুবই চমৎকার হতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ একসময় তার মনে হলো যে তার

অন্তরের অনুভূতিকে সে প্রকাশ করবে। তার পর থেকেই অতি আশ্চর্য কাব্যময় চিঠি তার হাত দিয়ে লেখা হতে থাকল। পাতার পর পাতা জুড়ে অবলীলাক্রমে সে লিখে যেতো এমন সব অসাধারণ সুন্দর কথা যা নিতান্তই বিস্ময়কর।

কিন্তু কোনো এক পিছটানের দরুন আবার যখন তার পূর্বপ্রকৃতি ফিরে এলো, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার সাধারণ চেতনাও ফিরে এলো, আর যেমনি দৈনন্দিন পার্থিব প্রয়োজনের দাবিগুলো মনের মধ্যে দখল নিলে অমনি তার সে ক্ষমতা মিলিয়ে গেল। আর সে তেমন ক'রে একটি লাইনও লিখতে পারলে না, যাও বা কিছু লিখতে গেল তাতে তার ফরাসী ভাষাতে ও বানানে অসংখ্য ভুল হতে দেখা গেল। আর লিখলেও যত নামুলী কথা।

এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে সত্য চেতনা এসে পড়লে তখন কোনো বাধার সমস্যাই থাকে না। তুমি যাই হও না কেন, যা জানবার তা ঠিকই তোমার জানা হয়ে যায়, যা করবার আছে তদুপযুক্ত শক্তিও ঠিকই এসে যায়। অক্ষমতা বলতে সবই তখন ঘুচে যায়।

যে মেয়েটির কথা বললাম তার পিছটান তার নিজস্ব নয়, তা এসেছিল অন্য একজনের দিক থেকে। দুঃখের কথা, এমনিই প্রায় হয়ে থাকে : জীবনের মধ্যে এমন কতকগুলো দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে বসো যে তোমার উন্নতির পথে তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে, কতক লোকের বেলাতে দেখলাম এমনি ভাবপ্রবণতার প্রবৃত্তি আবার কতক-লোক আগে বুঝে দেখে। তারা বুদ্ধিমান, লেখাপড়া তাদের প্রচুর, কথা আর ভাব নিয়ে কারবার করতে তারা ভালোই জানে। যতরকম দর্শনতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব আর মানবতত্ত্ব নিয়ে তারা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাও দিতে পারে, কিন্তু সামনে এক পা মাত্র অগ্রসর হতে তাদের কয়েক যুগ লেগে যাবে।

কারণ ব্যাপার এখানে সবটাই মগজী। বস্তুত মাথার মধ্যে অনেক কিছু হয়। আমি তোমাদের প্রায়ই বলি যে মাথা হলো সরকারি ময়দান; সকল রকম জিনিসই ওর মধ্যে আসা যাওয়া করছে, কাটাকাটি করছে, সব মিলে দারুণ তালগোল পাকিয়ে তুলছে। আর সেই মানুষেরই এগিয়ে যাবার বেশী বাধা যে এই খেলায় বেশ অভ্যস্ত। এ এমনই ভুলিয়ে দেবার খেলা যে তোমার মনে হবে তুমি তাহ'লে সাধারণ মানুষ নও, তোমার জীবন নিতান্ত হেঁজিপেঁজির মতো নয়। কিন্তু ওতেই তোমার ডানা কাটা গেল। মাথায় কোনো ডানা নেই, ডানা আছে হৃদয়ে।

হাঁ, সেই ডানাই সব চেয়ে বেশী দরকার, নিতান্ত অপরিহার্য। আর কিছুর দরকার নেই, শুধু ওটি থাকা চাই।

তারপর, শেষমেষ সমস্ত রকম বাধাবিঘ্ন আর বিপত্তিকে হেসে উড়িয়ে দিতে হবে। যতদূর পর্যন্তই ক্ষতি করবার সাধ্য তার থাকুক, তা অতি তুচ্ছ। কালের হিসাব নিরর্থক। ক্ষতি কি, পথ যদি হয় দীর্ঘ? সেই দীর্ঘকালই তোমার লেগে রইল আস্পৃহা আর নিবেদন আর আত্মদান, তারই আনন্দ ভোগ করতে থাকো।

সত্যিকার আনন্দ ওতেই।

সে আনন্দ যদি কমে আসে বা মিলিয়ে যায়, তাহ'লে জানবে যে তোমার অহংএর দিকের কোনো কিছু সেই নিবেদনের সঙ্গে মিশে গেছে—যাকে বলে প্রয়োজনের দাবি। নতুবা সে আনন্দ যাবার নয়।

প্রথম লাভও তাতেই, আর শেষ সিদ্ধিও তাতেই। বিজয়ের নিদর্শনই এই আনন্দ।

যতদিন পর্যন্ত একটা নিরন্তর অচঞ্চল শান্তি ও দীপ্তিময় অবিকল আনন্দ না আসছে, জানবে যে ততদিন পর্যন্ত তোমার আরো বিশুদ্ধির চেষ্টায় লেগে থাকা দরকার, হয়তো তার জন্য আরো বেশী খাটতে হবে। কিন্তু এই হলো ইঙ্গিত।

বিচ্ছেদ থেকেই আসে যত বেদনা ও দুঃখভোগ, দুর্দশা, অজ্ঞান, অশক্তি। কেবল আত্মদানেই, সম্পূর্ণ নিবেদনের ভিতর দিয়ে আত্মলোপেই ওগুলি ঘুচে গিয়ে তার জায়গাতে আসবে সেই আনন্দ, যা কোনো কিছুতেই চাপা পড়ে না।

এ আনন্দ যখন জগতে সুপ্রতিষ্ঠ হবে তখনই আসবে জগতের প্রকৃত রূপান্তর, তখনই দেখা দেবে নতুন জীবন, নতুন সৃষ্টি, নতুন উপলব্ধি। আগে চেতনার মধ্যে এর প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই, তবেই জড়ের হবে রূপান্তর, তার পূর্বে নয়।

কিন্তু যেন ভুল বুঝো না, লোকে যাকে বলে আনন্দ, তার কথা আমি বলিনি। আসল আনন্দের ব্যঙ্গ অনুকরণও নয়। সে একটা পথভোলানো ফাঁকি, আসে কেবল সুখ আর বিস্মৃতি আর অনন্যোপায় থেকে। আমি যার কথা বলছি সে আনন্দ হলো পূর্ণ শান্তি, ছায়াশূন্য আলো, পূর্ণ সঙ্গতি, ভরা সৌন্দর্য আর অদম্য শক্তি নিয়ে সে আনন্দ মানেই ভগবানের উপস্থিতি, তাঁরই নির্ঝর, তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর উপলব্ধি সমেত।

জগতে বিরুদ্ধ শক্তি আনে দুঃখ। তাকে জয় করতে পারে শুধু আনন্দ, আর কিছু তাকে নিঃসংশয়ে ও চিরতরে জয় করতে পারে না। আনন্দই স্রষ্টা, আনন্দই সিদ্ধিদাতা।

* * *

(২)

আনন্দই একমাত্র বিজেতা

প্রশ্ন : আপনি বললেন, কেবল আনন্দই বিরোধী শত্রুকে জয় করতে পারে, কিন্তু সে আনন্দ আসার জন্য তার আগেই কি শত্রুগুলোকে জয় করা দরকার হয় না?

উত্তর : তাকে ছাপিয়ে ওঠা দরকার, অগ্রাহ্য করা দরকার হয়।

সত্যকথা, প্রথমেই ও বিষয়ে একটি বিশেষ কাজ শুরু করা চাই : ওর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু এই প্রভাবমুক্তি আর জয় করার মধ্যে তফাৎ আছে।

এ শত্রুকে জয় করা সহজ কথা নয় ; ওকে জয় করতে হলে ওর চেয়ে বেশী শক্তি তোমার থাকা চাই। কিন্তু জয় না করেও এমনিতে তুমি তার প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে নিতে পারো ; তা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার আত্মদানও সম্পূর্ণ হতে পারবে, তখন তার থেকেই আসবে আনন্দ, শত্রু পরাজিত হয়ে সরবার অনেক আগেই।

জগতে এ শত্রুর প্রয়োজন ফুরোলে তখন ও আপনা হতেই সরবে। আমরা ভালো করেই জানি যে আপাতত সোনা যাচাইএর কষ্টিপাথর হিসাবে ওর থাকার প্রয়োজন রয়েছে —সোনা খাঁটি কি মেকি তা জানবার জন্য।

কিন্তু তুমি যদি সত্যই ঐকান্তিক হও—শ্রীঅরবিন্দ যাকে ঐকান্তিকতা বলেন সেই হিসাবে,—অর্থাৎ তোমার আশ্পৃহা ও আত্মনিবেদনের ইচ্ছাকে সত্তার ক্ষুদ্রতম অংশও কোনো বাধা না দেয়, তোমার ভিতরের কোনো গোপন অংশ স্বাধীনভাবে থাকতে ছদ্মবেশের আশ্রয় না নেয় (এখানে বলা দরকার যে তার জন্য ছদ্মবেশ আছে অসংখ্য রকমের, সেগুলো ছলনা ও বিদ্বেষে ভরা আর ঠকাতে পারে অক্লেশে, আর মানুষও এমন হয় যেন সে ঠকতেই চায়, আর যতই ঠকে ততই ঠকছি বলে বুঝতে অক্ষম হয়),—এমন ঐকান্তিকতা যদি যথার্থই তোমার থাকে, তাহ'লে শত্রু তোমার ধারেই ঘেঁসবে না। শত্রুতার কোনো চেষ্টা করতেও সে যাবে না, কারণ সে জানবে যে তা করতে গেলেই তার বিনাশ।

তবে কতক লোক এমন আছে যাদের লড়বার প্রবৃত্তিটাই খুব প্রবল, তারা শুধু প্রভাবমুক্ত হওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকে না। তারা জানে যে নিজেদের গায়ে জোর আছে এবং তারা লড়বে। কিন্তু এর জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত না থাকলে কখনো কখনো তারা বিপদে পড়ে যায়।

এদের সমস্যা খুব কঠিন।

এদের রক্ষা করতে পারে কেবল ভগবৎ-কৃপা। তারা দারুণ বোকামির কাজ করতে থাকলেও দেখা যায় যে শেষ মুহূর্তে একটা কিছু সাহায্য এসে পড়াতে তারা রক্ষা পেয়ে গেল, —একটা বেড়ালছানা যখন জলের উপর দিয়ে হেঁটে পার হতে গিয়ে হাবুডুবু খেয়ে জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে তার মা বাড়ি বেড়ালটা এসে তার ঘাড় কামড়ে ধরে জল থেকে টেনে তুললে, অনেকটা এমনিভাবে।

কিন্তু এ কথা চিরদিনই বলা হচ্ছে যে ভগবানকে পরীক্ষায় ফেলতে যেও না। ভগবান তোমাকে বিপদ থেকে সব সময়েই উদ্ধার করবেন এ কথা ভেবে ইচ্ছা ক'রে কোনো দুঃসাহসিক কাণ্ড কোরোনা। তাতে কাজের কোনো সুরাহা হয় না, বরং জটিলতা এসে পড়ে।

* * *

(৩)

সমবেত সাধনা

"যোগী যখন জীবনকে মেনে নেয় তখন তাকে শুধু নিজের ঝুক্‌কিটাই বইতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে জগতের অধিকাংশ বোঝাও তাকে বইতে হয়, তার গুরুভার তাতে আরো বেশী বেড়ে যায়। সেই কারণে অন্যের যোগের চেয়ে তার যোগ অনেকটা যুদ্ধের মতো হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু সে যুদ্ধ কেবল ব্যক্তিগত নয়, অনেকখানি ক্ষেত্র জুড়ে তা এক সমবেত যুদ্ধ। তার পক্ষে তখন কেবল নিজের অহংএর অসত্য ও অনাবশ্যককে জয় করলেই চলবে না, সমগ্র জগতে ঐ ধরনের যত অফুরন্ত বিরোধী শক্তি সক্রিয় হয়ে আছে তারই প্রতিনিধি-স্বরূপ নিজেরটিকে জেনে সেইভাবেই তাকে জয় করতে হবে। সেই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে বলেই সে জিনিস এমন দুর্বার হয়, তাকে বহুবার জয় করেও তার পুনঃপুনঃ আক্রমণ কিছুতে শেষ হতে চায় না। প্রায়ই দেখা যায় যে সাধককে ব্যক্তিগত সংগ্রামে সম্পূর্ণ জয়ী হয়েও আবার নতুন ক'রে সেই সংগ্রাম জয় করতে হয়, কারণ পূর্বেকার যতটা পর্যন্ত ওর আভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব ছিল তার সীমানা ইতিমধ্যে এতই বেশী বেড়ে গেছে যে আপন সত্তাটুকু মাত্র তার নিজস্ব প্রয়োজন ও অনুভূতি নিয়ে তার মধ্যে বসে নেই, অন্যান্য আরো অনেকের সত্তার সঙ্গে একত্রে মিলে তা জমাট বেঁধেছে, সারা বিশ্ব ঢুকে পড়েছে তার নিজের সীমানার মধ্যে।"

(শ্রীঅরবিন্দের "যোগ-সমন্বয়" The Synthesis of Yoga থেকে)

প্রশ্ন : সাধনা ব্যক্তিগত না হয়ে তা যখন সমবেত সাধনা হলে কেমনভাবে তাতে অগ্রসর হতে হবে?

উত্তর : নিজেকে অনেকখানি বাড়িয়ে অনেকটা বড়ো ক'রে নিতে হবে।

এ কাজ খুবই জটিল এবং কঠিনও বটে, এর জন্য বেশীরকম শক্তি চাই, তোমার থাকা চাই অধিকতর বিস্তার, অধিকতর ধৈর্য, অধিকতর ঘাতসহ সহ্যগুণ।

তবু এমনিতেও যদি প্রত্যেকে আপন আপন কাজগুলি পুরোপুরি ভাবে করে যেতে থাকে, তাতে এমন হয়ে দাঁড়াবে যেন সবাই মিলে একজন হয়ে সাধনা করছে প্রতিজনের জন্য। যদি পঞ্চাশ জনে মিলে পূর্ণযোগ নিয়ে থাকে ও তার মধ্যে একজন মাত্র কাজ করতে থাকে, তাহ'লে তার কাজগুলো হবে আর সকলের জন্য। আবার ঐ পঞ্চাশ জনের সকলেই যদি সেই কাজ করে সকলের জন্য, তাহ'লে তারা ফলতঃ একের কাজ করছে, যেহেতু সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য কর্মরত। এইভাবে অনেকের মধ্যে এমন এক জোরালো একত্ব গড়ে উঠবে যে এককে অপর থেকে পৃথক মনে হবে না। এই হলো সাধনার আদর্শ

পথ, সকলে মিলে এক দেহ, এক ব্যক্তিত্ব হয়ে একের জন্য ও সকলের জন্য কোনো তফাৎ না রেখে কাজ ক'রে যাওয়া।

বলতে গেলে এই প্রশ্নটাই প্রথমে ওঠে যখন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রশ্ন হলো, জগৎ থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ হয়ে কারো সঙ্গে কোনো সংস্রব না রেখে আগে আমরা শুধু লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তীব্র সাধনা করবো, তার পরে তাতে সফল হলে তখন অন্যদের কথা ভাবা যাবে; কিংবা তেমন না ক'রে যাদের একই আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাদের সবাইকে আমাদের কাছে আসতে দেবো, তাতে যদি স্বাভাবিক নিয়মে একটা গোষ্ঠি গড়ে ওঠে তো উঠুক, লক্ষ্যের দিকে আমরা অগ্রসর হবো সবাই মিলে একজোটে। দুটি সম্ভাবনাই ছিল সামনে।

সিদ্ধান্ত হলো মনের পছন্দ দিয়ে নয়, আদৌ নয়। ধীরে ধীরে একটা গোষ্ঠি দেখা দিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে, অপরিহার্য অবশ্যম্ভাবী রূপে। আমাদের পছন্দ অপছন্দের কোনো প্রশ্নই রইল না। আর, একবার ওরকমে যা শুরু হলো তা চূড়ান্ত, তা ধরে শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে।

সম্পূর্ণ একলা হয়ে যদি কাজ করো তাতে সমগ্র ধরনের সার্থকতা একেবারেই অসম্ভব, যেহেতু একলার সত্তাটি আংশিক ও সীমাবদ্ধ হবেই, যতই পূর্ণতা তার আসুক আর যতই তা উচ্চস্তরের হোক, এমন কি বিশিষ্ট কোনো কাজের জন্য নির্দিষ্ট সত্তা হলে তবুও। জগতে কেবল একটি সত্য একটি বিধানের প্রতিনিধি সে; যতই কিছু নিয়ে সে বিধান জটিল ও বিচিত্র করুক তবু তা একক বিধান—ভারতে যাকে বলেছে ধর্ম—তা দিয়ে অর্থাৎ সেই একের জোরে সর্বৈব রূপান্তর আসতে পারে না।

এই কারণেই বহুত্ব জিনিসটার সৃষ্টি, আপনা হতেই।

তুমি নিজের প্রয়োজনে নিজের পূর্ণসিদ্ধি আনতে পারো। আপন চেতনাতে তুমি আনন্দ্যে ও পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছতে পারো। আভ্যন্তরীণ উপলব্ধি তোমার অসীম হতে পারে। কিন্তু বাহ্য উপলব্ধি সীমাবদ্ধ থাকবেই। তাই যদি সর্বজনীন ও সমগ্র ক্রিয়া চাও তাহ'লে অন্তত অল্প কয়েকজনকে নিয়েও একত্র হওয়া দরকার।

প্রাচীন নিয়মে বনে যারো জনের কথা। কিন্তু এখনকার জীবন আরো জটিল, এর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন প্রতিনিধি গোষ্ঠি একটা।

তোমরা যদিও নিজেরা তা জানোনা, কিন্তু অপূর্ণতা যত রকমের আছে তার প্রত্যেকটির প্রতিনিধিত্ব করছ তোমরা জনে জনে, যাতে প্রত্যেক রকমেরই বাধাবিঘ্ন প্রকট হয় আর প্রত্যেকটিকে জয় ক'রে শেষে রূপান্তর আসে। এতেই নানারকম বাধাবিঘ্ন আর একাধিক বিপত্তির আবির্ভাব হয়েছে। কিছুকাল পূর্বেও তোমাদের বলেছি এ কথা, বলেছি যে প্রত্যেকেই তোমরা এক এক অসম্ভব সমস্যা, তার সমাধান হওয়া চাই। সকল অসম্ভবেরই যখন মীমাংসা হয়ে যাবে তখনই আসল কাজ পূর্ণ হবে।

কিন্তু এখন আমি আগের চেয়ে সদয়, এখন আর অসম্ভব শব্দটা ব্যবহার করছি না, বলছি কেবল বাধা ; অসম্ভবের মতো হয়তো এখন আর তা নেই।

সাধনা সমষ্টিগত হবে এ কথা আমি প্রথম থেকেই বলছি—এখন আমাদের গোষ্ঠী অনেকটা বেড়ে যাওয়াতে সে কথা বলার গুরুত্বও বেড়েছে। তাই যখনই কেউ এসে বলে, "বাইরে আমার বিস্তর বাধা, সেগুলোকে আমি জয় করতে পারিনা, এখানে যদি থাকতে দেন তাহ'লে আমার সুবিধা হয়"—আমি তখন তাকে বলি, "না বাপু, এখানে থাকলে তোমার আরো মুশকিল হবে, বাধাগুলো আরো অনেক বেড়ে যাবে, তোমার নিজের বাধার উপর যৌথ বাধা তোমার ঘাড়ে চাপবে। বহুরকম সংঘর্ষ, সংস্পর্শ, আর প্রতিক্রিয়াগুলো তোমায় সামলাতে হবে, বাইরের থেকে সবই গিয়ে ঢুকবে তোমার মধ্যে তোমায় পরীক্ষায় ফেলতে, তোমার সব চেয়ে দুর্বল ও নরম জায়গাটিতে তারা চেপে ধরবে। এমন সব কথা ও শব্দপ্রয়োগ তোমায় শুনতে হবে যা তুমি হয়তো মোটে পছন্দ করোনা, লোকেদের ব্যবহারে এমন ভঙ্গী দেখবে যাতে মন বিরূপ হয়ে উঠবে। হয়তো নিত্যই এমন সব ঘটনা আর এমন রকমের জিনিস তোমায় দেখতে হবে, তা যাই কেন হোক, তোমার মোটে সহ্য হয় না। তাতে সেইগুলোই আরো বেশী বেশী ক'রে হতে থাকবে। তার ভিতরকার কারণ এই যে তোমার একলা নিজের জন্য এখানকার যোগ নয়, আপনা হতেই তুমি যোগ শুরু করবে সকলের জন্য, যদিও নিজে সে কথা জানবে না।"

তাই লোকে এসে যখন বলে, "আমি এখানে আসতে চাইছি এখানকার শান্তির জন্য, নীরবতার জন্য, একটু নিশ্চিন্তে থেকে যাতে যোগের কাজ করতে পারি,"—আমি তখনই তাদের বলি, "একেবারেই না! এখনই অন্য কোথাও সরে পড়ো, যেখানেই যাও সেখানেই এ জায়গার চেয়ে তোমার বেশী শান্তি মিলবে।" কিন্তু ওর বদলে কেউ যদি এসে বলে, "ভগবানের কাছে আমি নিজেকে নিবেদন করতে চাই। আমি এখানে আসতে চাই কাজ করতে, নিজেকে কোনো কাজের ক'রে তুলতে, তার জন্য যে-কোনো কাজ মেনে নিতে আমি প্রস্তুত আছি", —তখন তাকে আমি বলি, "সেটা ভালো কথা, যদি তোমার তেমন সদিচ্ছা থাকে, সহ্যশক্তি আর সামর্থ্য থাকে। কিন্তু যদি আপন আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য নির্জনতা চাও, তাহ'লে অন্য কোথাও যাও। যদি আপনার শান্তি ও নির্জনতা আপনার মধ্যেই গড়ে নিতে না পারো, যদি নিজেকে ঐকান্তিক ক'রে নিজের মধ্যে ঢুকতে না পারো—সাধারণ জীবনে তা যদি না পেয়ে থাকো, তাহ'লে এখানেও তা কিছুতে পারবে না ; এখানে প্রথম বাধা এমনই আসবে যে মনে হবে যেন সকলে মিলে তোমাকে চারদিক থেকে এসে ছেঁকে ধরেছে, একলা হতে আর পারছো না।"

সকলের বেলাই এ কথা। যাদের কিছু বিকৃত স্বভাব, যেমন কেউ হয়তো খুব রাগী আর বদমেজাজী, তারা এখানে এলেই তাদের রাগ আরো বেশী বেড়ে যাবে, কারণ বাইরের সাধারণ জীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজনের গণ্ডিকে তাদের অনেকটা সংযত থাকতে বাধ্য হতে

হয়—যেমন মনে করো অফিসের কর্তার উপর রাগ দেখালেই সেখানে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এখানে কেউ তাড়াবার নেই, কেবল এইটুকু বলবে, "সংযত থাকতে চেষ্টা করো।"

বাধাগুলো এখানে বাড়ে কেন, তার আরো এক কারণ, এটা সিদ্ধির ক্ষেত্র। সাধারণ জীবনে তোমরা থাকো অচেতনার অবস্থায়, এলোমেলো রকমের কিছু অর্ধচেতনা নিয়ে। বাইরের যতটা পরিচয় তা ছাড়া নিজের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানোনা ; যে নির্দিষ্ট কাজের জন্য তোমার জন্ম সে কাজটি পূরণ করতেও যাও না, এবং তার সামর্থ্যও রাখো না, চেষ্টার মূল কেন্দ্রে তোমায় ঢুকতেই হয় না, কাজেই বাধাও কিছু দেখা দেয় না ; বাইরের চেহারাটাই তোমার অস্তিত্ব, চেহারার মধ্যেই অবস্থান। তোমার দোষও অল্প গুণও অল্প, সামর্থ্যও মামুলী আর বাধাও মামুলী। সর্বদাই তুমি পুরোদস্তুর মামুলী।

কিন্তু এখানে উপলব্ধির রাস্তায় পা দিতে এলেই তখন তোমার ঘুমন্ত সম্ভাবনাগুলো বাস্তব হয়ে প্রকট হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে বাধাও অনেক বেড়ে যায়। সব দিক দিয়ে স্বভাবতই বাড়াবাড়ি আসে।

* * *

প্রশ্ন আপনি বললেন, আমরা প্রত্যেকেই অসম্ভবের প্রতিনিধি হয়ে আছি। তাই যদি হয় তবে প্রত্যেকেরই কি আপন আপন অসম্ভবের প্রশ্ন নিয়ে অন্বিত হওয়া দরকার নয় ?

উত্তর কেবল অন্বিত হয়ে কোনো লাভ নেই। তবে প্রত্যেককেই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তার সম্মুখীন হতে হবে। সেও একটা সমস্যা।

আমি আগেই তোমাদের বলেছিলাম, যেখানে যে বিষয়ে বিকাশের সম্ভাবনা তোমার মধ্যে রয়েছে, সেখানে তার ঠিক উল্টো জিনিসটাও আছে, আর তাই নিয়েই হয় তোমার সর্বক্ষণের যন্ত্রণা।

প্রত্যেকেরই নিজস্ব এক একটা বাধা আছে। যার একদিক দিয়ে অদম্য সাহসের প্রতিমূর্তি হবার কথা, তারই উপযোগী যথেষ্টশৌর্য রয়েছে, সবরকম বিপদে ও সংগ্রামে অটল থাকার মতো শক্তি রয়েছে, অন্যদিক দিয়ে দেখা যায় যে তার সত্তার কোনো একটা অংশে সে নিতান্তই ভীরু। এই যে দুর্বলতা, এর বিরুদ্ধে তাকে প্রতি পদে লড়াই করতে হয়। এর কারণ ঐদিকের জয়টাই সে করতে এসেছে।

তেমনি একদিকে যে খুব ভালো মানুষ, দয়াদাক্ষিণ্য উদারতা সবই আছে, অন্যদিকে সে নিষ্করুণ, কুটিল হয়ে আছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে তাকে পুরোপুরি ভালো হতে হবে। এমনি সকল বিষয়েই, এমন কি সামান্য খুঁটিনাটিতে পর্যন্ত।

আবার, কোথাও যখন দেখবে ছায়ার অন্ধকার—খুবই অন্ধকার—প্রকৃতই যা প্রাণান্তকর, নিশ্চয় জেনো যে তার উল্টো রকমের আলোর সম্ভাবনাও তোমার মধ্যেই আছে।

* * *

(৪)

অহমিকা ও অহং

অহমিকা প্রায় অনায়াসেই সংশোধন করা যায়, কারণ সকলেই বোঝে জিনিসটা কি। একে ধরে ফেলাও সহজ আর দূর করাও সহজ—যদি যথার্থই তা চাও আর তার জন্য তোমার চেষ্টা থাকে।

কিন্তু তোমার মধ্যে যে অহং আছে তাকে ধরতে পারা খুব কঠিন, কারণ ভিতর থেকে যখন উপরে বেরিয়ে আসে তখনই তাকে চেনা যায়, নতুবা তা ধরা পড়ে না। অথচ মানুষ আগাগোড়া ঐ দিয়ে গড়া ; মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত, বাহির থেকে অন্তর পর্যন্ত, দৈহিক থেকে আধ্যাত্মিক পর্যন্ত, সব জায়গাতেই অহং। সব কিছুর মধ্যে এটি মিশে আছে অথচ তা জানতে দিচ্ছে না। ওর এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে অন্তত আংশিক ভাবেও ওকে জয় ক'রে নিজেকে মুক্ত হতে হবে। অন্তত সত্তার একটা কোনো সামান্য অংশেও তা করতে পারা চাই, তবেই জানা যাবে অহং কাকে বলে।

অহং হলো সেই জিনিস যা দিয়ে আকার পায় আমাদের ব্যক্তিত্ব আর যা আমাদের দিব্যত্বে পৌঁছিবার প্রতিবন্ধক। এই দুটি ব্যাপারকে একত্রে যোগ ক'রে নাও, তাহ'লেই অহং কাকে বলে তা বুঝতে পারবে। বর্তমান জগতে অহং বাদ গেলে ব্যক্তিত্বই নেই, আর ওটি আছে বলেই জগৎ দিব্যত্বে যেতে পারছে না।

তাহ'লে সাধারণ বিচারে এই কথাই তোমরা বলবে, "বেশ, তবে আগে আমরা ব্যক্তিগত চেতনাই অর্জন করি, তখন সেই চেতনার জোরে অহংকে দূর ক'রে দিয়ে দিব্য হতে পারবো।" কিন্তু ব্যক্তিগত চেতনা লাভেও আমরা অহং পোষণ ক'রে থাকতে এতই বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে ওকে সহসায় ধরতেই পারি না, ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে কিনা জানবার জন্য অনেক মেহনত করতে হয়।

অপরপক্ষে অহমিকা কাকে বলে, অর্থাৎ স্বার্থপরতা কি জিনিস তা সকলেরই জানা ; সব জিনিসকে কেবল নিজের কোলের দিকে টানা, অন্যের কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে খেয়ালই নেই, একেই বলে স্বার্থপরতা ; নিজেকেই সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ জ্ঞান ক'রে এমন ভাবটি নেওয়া যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক যার নেই তার কোনো অস্তিত্বই নেই,—এই হলো স্বার্থপরতা। কিন্তু একে স্পষ্টই চেনা যায়, নিতান্ত অন্ধ হয়ে না থাকলে আমি যে স্বার্থপর হচ্ছি তা দেখতে পেতে কারো বাকী থাকে না। যদিও সকলেই অল্পবিস্তর স্বার্থপর—সাধারণত কতক পরিমাণে তা মেনেই নিতে হয়—কিন্তু বেশীমাত্রায় হলে সাধারণ জীবনে নাকের উপর ঘা খেতে হয়, কারণ অহমিকা জিনিসটা সকলেরই যখন রয়েছে তখন একের অহমিকা অন্যে বরদাস্ত করে না।

এ পর্যন্ত বোঝাই যায়। এটা লোকনীতির অন্তর্গত। থাকে থাক একটু অহমিকা, কিন্তু মাত্রাটা যেন না বাড়ে, কারো চোখে যেন ধরা না পড়ে। কিন্তু অহং সম্বন্ধে কেউই কিছু বলবে না, কারণ কেউই তা জানতে পারে না। নিত্যসঙ্গীর মতো এমনভাবে তা লেপ্টে থাকে যে ওর অস্তিত্ব অজ্ঞাতই থেকে যায়, অথচ যতক্ষণ তা রয়ে গেছে ততক্ষণ তোমার দিব্যচেতনা মিলবে না।

এই অহং তোমাকে নিত্য স্মরণ করাচ্ছে যে সকলের থেকে তুমি হলে একজন আলাদা। এই অহং না থাকলে তোমার সে বোধই আসতো না যে সবার থেকে তুমি স্বতন্ত্র। যা তোমার বোধ হতো তা এই যে তুমি এক আস্ত জিনিসের অল্প একটু অংশ—খুব বিশাল বিরাট বস্তুর ছোট্ট একটি কণা। বাস্তবিক কিন্তু মনে মনে তোমরা প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে জানছো যে আমি এক স্বতন্ত্র মানুষ। এ ভাব তোমাদের মধ্যে এনে দিয়েছে ঐ অহং। এই ভাবটি নিয়ে যতক্ষণ আত্মচেতন হয়ে থাকবে ততক্ষণ জানবে যে অহং তোমার ঘোচেনি।

যখন এই কথা বোধ করতে শুরু করবে যে সমস্তই তুমি, যখন জানবে যে তোমার ঐ অহং হলো একই ব্যক্তিসত্তার অযুত হাজার হাজার অহংবিন্দুর মধ্যে সামান্য একটি বিন্দু মাত্র, যখন জানবে যে তুমিই ছড়িয়ে আছো সর্বত্র, যখন বোধ আসবে যে সবের মধ্যেই তুমি, বিচ্ছেদ কোথাও নেই, তখনই জানবে যে অহং তোমার ঘুচে যেতে শুরু করেছে।

এমন এক সময় আসতে পারে যখন তোমার ভাবাই অসম্ভব হবে যে "অমুক জিনিসটা আমি নয়", যতক্ষণ তুমি বলছ যে সবই তুমি বা তুমিই সব বা তুমিই ভগবান বা ভগবানই তুমি, ততক্ষণ ওর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে তবুও কিছুটা হতে বাকী রয়ে গেছে।

এমন সময় এক আসতে পারে—যদিও তা আসে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো আর অল্পক্ষণই স্থায়ী—যখন সব কিছু জানছেও সর্বময়, ভাবছেও সর্বময়, বোধও করছে সর্বময়, বেঁচেও আছে সর্বময়। আমি সেখানে নেই, আমি যে ঐ অবস্থায় পৌঁছেছি সে ধারণাও আর নেই।

তখন ও অবস্থায় সব ঠিক হলো, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত অহংএর ছিটে কোথাও থেকে যায়: প্রায়ই তা হয় সাক্ষীর তরফে, সাক্ষী হয়ে যে দেখছে।

তাই বলি, কখনো এমন দাবি করতে যেও না যে তোমার অহং আর নেই। তা বললেই ভুল বলা হবে। বরং বলো অহং বর্জন করবে, তাই বলা ঠিক।

এখনও হয়তো এ ভাব তোমাদের মধ্যে আসেনি। কিন্তু যদি সত্যই অতিমানসকে জানতে চাও তাহ'লে এটি অপরিহার্য। অতিমানবত্ব যদি চাও তাহ'লে নিজের অহংকে ত্যাগ করতে, তাকে অতিক্রম ক'রে যেতে দৃঢ়সংকল্প হও, কারণ যতক্ষণ ওকে পোষণ করবে ততক্ষণ অতিমানস তোমার কাছে সুদূরপরাহত।

যদি সত্তার সামান্যতম অংশেও চেষ্টা, আত্মসংযম ও আত্মাধিকারের সাহায্যে অহংকে দমন করে তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারো, তাহ'লে তোমার একদিকের একটি ছোটো জানালা খুলে যাবে, তার ভিতর দিয়ে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলে অতিমানসের কিছু আভাস পেতে

পারবে ; এমন অঙ্গীকার দেওয়াই আছে। আর, একবার একটু তার আভাস পেলেই সে জিনিস এমন সুন্দর বলে মনে হবে যে অহংএর সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে আপনা হতেই ছেড়ে দিতে চাইবে।

কিন্তু জেনে রাখো, এমন কথা আমি বলছিনা যে আগে সমস্তটা অহং ছেড়ে দাও তবে অতিমানসের আভাস মিলবে, তা প্রায় অসম্ভব কথা। তা নয়, তবে সামান্য কোনো জায়গাতেও তোমার অহংশূন্য হওয়া চাই, সত্তার কিম্বা, এমন কি, মনের একটা কোণে ; মনের ও প্রাণের হলেও তা ভালো কথা ; কিন্তু কোনোপ্রকারে—দৈবাৎ নয়, চেষ্টার জোরে যদি চৈত্যের সংস্পর্শ মিলে যায়, তখন দরজা পুরোপুরি খুলে যাবে। চৈত্যের ভিতর দিয়ে তখন স্পষ্ট দেখবে অতিমানস কি জিনিস, যদিও তা দেখা মাত্র, উপলব্ধি নয়। সেই হলো বেরোবার দুয়ার। কিন্তু এ উপলব্ধি না এলেও যদি মন প্রাণের কোনো অংশকে মুক্তি দিতে পারো, তাতেও দরজার মাঝে একটা ফোকর মিলবে, চাবির ফোকর। তারই ভিতর দিয়ে একটু কিছু দেখা যাবে। কিন্তু সেই একটুমাত্র হলেও তা খুবই মনোরম, খুবই চমকপ্রদ।

(৫)

প্রকৃত কারণ

সত্যের পথে যারা চলবে তাদের প্রতিকূল আক্রমণ সহ্য করতেই হবে, যারা আক্রমণ করে তারা জিনিসটা শুধু যে বোঝে না তাই নয়, যা বোঝে না তার প্রতি তাদের একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ থাকে।

একটা অন্ধ আক্রোশে কে কি তোমার সম্বন্ধে বলছে, এতেই যদি তুমি ক্ষুণ্ণ কিংবা বিচলিত হও কিংবা দমে যাও, তাহ'লে এ পথে বেশী দূর এগোতে পারবে না। যদি মনে করো যে তুমি ভাগ্যহীন বলে কিংবা তোমার মন্দভাগ্য বলে ঐগুলো তোমাকে এসে আঘাত করছে, সেটি তোমার ভুল ধারণা ; বরং এই কথাই জানবে যে দিব্যচেতনা ও ভগবৎ-কৃপা তোমার সংকল্পকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে, তাই ঐ সব জিনিসের কষ্টিপাথর দিয়ে তোমাকে যাচাই ক'রে দেখা হচ্ছে যে তোমার সংকল্প ঐকান্তিক কিনা, বাধাগুলোকে সহ্য করার মতো শক্তি তোমার আছে কিনা।

সুতরাং কেউ যদি তোমার কোনো দোষত্রুটি নিয়ে উপহাস করে কিংবা নিন্দাসূচক কোনো কঠোর মন্তব্য করে, তাহ'লে লোকে তোমার কদর করলে না বা মূল্য বুঝলে না বলে শোক বা দুঃখ কোরো না কিংবা বিরস হয়ো না ; তার বদলে সর্বাগ্রে নিজেরই ভিতরের দিকে চাইবে, খুঁজে দেখবে যে কোথায় কোন দুর্বলতা বা অপূর্ণতা রয়ে গেছে যার জন্য ওরূপ হতে

পারল ; বরং তখন ভগবৎ-কৃপাকে ধন্যবাদ দেবে যে ঐ অজুহাতে নিজের দুর্বলতা অপূর্ণতা বা ত্রুটিগুলো জেনে তা শুধরে নেবার সুযোগ পেলে।

অতএব ক্ষুব্ধ না হয়ে তুমি সন্তোষের সঙ্গেই সেই সুযোগটি নিয়ে নেবে, যা দিয়ে অন্যে তোমার কিছু অনিষ্ট করতে চাইছিল তাই দিয়েই নিলবে তোমার এই মস্ত সুযোগ।

আর যথার্থই যদি যোগের এই পথ ধরতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে তা যেন কখনই কারো প্রশংসা বা শ্রদ্ধা কুড়োবার জন্য করা না হয় ; এটা মনে রাখবে যে তোমার সত্তার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে বলেই তা করছ ; এ পথে চলা ছাড়া তোমার কোনো তৃপ্তি নেই বলেই তা করছ। তোমার কাজের মূল্য কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক, তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। আগের থেকেই নিজেকে সতর্ক ক'রে রাখবে যে সাধারণ মানুষের চেয়ে যতই তুমি অন্যরকম হয়ে দাঁড়াবে, তোমার রীতিনীতি যতই তফাৎ হয়ে পড়বে, ততই লোকে বিরূপ হবে ; তোমাকে তারা বুঝবেই না। কিন্তু আবার বলছি, তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না।

প্রকৃত ঐকান্তিকতা জিনিসটার মানেই তাই যে এ না করে উপায় নেই বলেই তুমি এই পথ অবলম্বন করেছ। তুমি নিজেকে নিবেদন ক'রে দিয়েছ দিব্যজীবনের উদ্দেশে, যেহেতু এ ছাড়া আর কোনো উপায় দেখতে পাওনি। তুমি যে আপন সত্তার রূপান্তর কামনা ক'রে আলোর রাজ্যে বেরিয়ে আসতে চাইছ, তার কারণ এ ছাড়া তোমার আর কোনো গত্যন্তর নেই। তোমার জীবনের এই যে অস্তিত্ব, এর প্রকৃত কারণই তাই।

এ-ভাব যখন আসবে তখন নিঃসন্দেহে জানবে তুমি ঠিক পথ ধরেছ।

* * *

(৬)

প্রগতির আনন্দ

কোনো বিষয়ে চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তখনই তার ফল চাও। সকল ব্যাপারেই তোমাদের তাড়াতাড়ি, যা হবার তা এখনই হয়ে যাক।

এর কারণ আর কিছুই নয়, চেষ্টার তলে তলে এই প্রগতির আনন্দ নেই। সে আনন্দ-বোধ যদি থাকে, এমন কি কোনো লক্ষ্যে আমি পৌঁছতে চাই তাও যদি আগের থেকে উপলব্ধি করা যায়, যেমন এই পৃথিবীতেই আমার অতিমানস জীবন হবে, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও ভাবনার মধ্যে এসে পড়বে, "শাশ্বত কালের মধ্যে তাও হবে একটি ধাপ মাত্র ; তার পরে আরো কিছু আসবে, তার পর আবার আরো নতুন কিছু—এমনি চলবে অনির্দিষ্ট কাল ধরে, অগ্রগতির পর অগ্রগতি" ; এই ভাবতে থাকলেই তো তাতে আনন্দে ভরে ওঠার কথা।

অপরপক্ষে যদি এমন হয়, যা হবার তা হয়ে গেছে, যা পাবার ছিল তা মিলে গেছে, যা মিলেছে তাই এর পর ভোগ করতে থাকি বসে বসে—এই দারুণ একঘেয়ে অবস্থা কতটা বিরক্তিকর বলো দেখি। তখনই তুমি বুড়িয়ে যাবে, গুটিয়ে যাবে।

শাশ্বত যৌবন কথাটার মানে কি? নিত্যই আমি বেড়ে চলেছি, প্রগতি আমার থামবার নয়। বেড়ে চলেছি আমার সামর্থ্যে, সম্ভাবনায়, কর্মের ক্ষেত্রে, চেতনার বিস্তারে, উপলব্ধির পর্বে পর্বে পা বাড়িয়ে।

মানুষের জীবন এমনি করে ধাপে ধাপে এগোয় প্রগতির দিকে। যতই এগিয়ে যায় ততই তার আগেকার জিনিস সেকেলে হয়ে গিয়ে তার আকার বদলায়, আগের চেহারা বদলে একালের নতুন চেহারা নেয়।

তারপর সিঁড়ির শেষ ধাপে ওঠবার পর, স্বভাবতই নেমে আসতে হয়। এমন যদিও খুবই দুর্ভাগ্যের কথা, একটা বদ অভ্যাসের মতো। যেমন মনে করো যখন তোমার দেহের বাড় থেমে গেল, তখন সেই শক্তি লেগে যায় দেহকে পূর্ণতা দেবার কাজে, সেই দেহকে আরো মজবুত ক'রে তোলে, স্বাস্থ্যকে উত্তরোত্তর আরো যাতসহ ক'রে তোলে। তার উপর ব্যায়াম অভ্যাস ক'রে তাকে তোমরা সৌন্দর্যের আধার ক'রে তোলো। সেই সঙ্গে তোমার চরিত্র, চেতনা, জ্ঞান, শক্তি, সব দিক থেকেই পূর্ণতা আসতে থাকে, আর শেষ পর্যন্ত তুমি গিয়ে পৌঁছতে পারো মঙ্গলে সত্যে ও পূর্ণ প্রেমে ভগবৎ-উপলব্ধিতে।

যখন তুমি উৎকর্ষের চূড়ায় পৌঁছবে তখন জগতের বর্তমান অবস্থার চেয়ে আরো এক নতুনতর শক্তিকে উপর থেকে নামিয়ে আনবে, আর তারই ছাঁচে জগতের নব রূপান্তর এনে ফেলবে।

কিন্তু অলসদের পক্ষে সে কথা নয়। যারা প্রগতি চায় তাদের সম্বন্ধেই বলছি। যারা আমার কাছে এসে বলে, "দেখুন, সারাজীবন ধরে আমি অনেক খাটলাম, এখন একটু বিশ্রাম চাই, স্থান পাবো কি আশ্রমে?"—তাদের জন্য ও কথা নয়। তাদের বলি, "এখানে না বাপু, এটা বিশ্রামের জায়গা নয়, যদিও অনেক খেটে এসেছ; এখানে এলে আরো বেশী খাটতে হবে।"

আগের দিনে তাদের আমি রমণ মহর্ষির কাছে পাঠিয়ে বলেছি, "ঐখানে যাও, ধ্যান করবে আর বিশ্রাম পাবে"। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়, তাই এখন হিমালয় পাহাড়ে যেতে পরামর্শ দিয়ে বলি, "সেখানে বসো গিয়ে চিরন্তন তুষারশৃঙ্গের সামনে! তাতে তোমার উপকার হবে।"*

---

*অনুবাদক—শ্রীপতপতি ভট্টাচার্য।

শ্রীমা প্রসঙ্গ*

ডক্টর কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

(১)

শ্রীমার লেখার মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধও আছে যাদের আলোচ্য বিষয় হ'ল—চিন্তা, স্বপ্ন, দুঃখ-বেদনার দান, ঈশ্বরের আংশিক-পরিচয় ইত্যাদি। এগুলি শুধু চাতুর্যপূর্ণ প্রবন্ধ নয়। অকপট মনীষাদীপ্ত আলোকোজ্জ্বল এ রচনাবলি; এগুলি যুগপৎ আশ্পৃহার নত্য ও অনুভূতির প্রখর মুকুল। উপকথারই মত এ প্রবন্ধগুলিও অধ্যাত্ম-অন্বেষুদের উদ্দেশ্য করে লিখিত।

"চিন্তা...এ তো এক বিশাল বিষয়।" লক্ষ্যহীন, স্বেচ্ছাচারী, বিশৃঙ্খল চিন্তাগুলি তাদের আসল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে, লক্ষ্যকে সত্যভ্রষ্ট করে, চিন্তার অসংখ্য ধারাকে বিকৃত করে। আমরা যদি চিন্তাগুলিকে বিশৃঙ্খলভাবে দাপা শুরু করতে ছেড়ে দিই তাহ'লে এক বীভৎস বিপরীত সম্ভাবনার আক্রমণের সামনে ধরা পড়ব এবং পরে আপন-সৃষ্ট এক বিরাট কোলাহলের মধ্য বাস করব। সেইজন্য প্রথম প্রয়োজনীয় হ'ল "প্রশান্তি"। "আমাদের মস্তিষ্ককে বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো মানসিক চাঞ্চল্য থেকে মুক্ত করতে হবে।"(১) আমাদের চিন্তাকে সত্যাকারে ও একান্তভাবে নিজের করে নিতে হ'লে তাকে চলিতরুচির ঘূর্ণিহাওয়ার প্রতিধ্বনি হলেই চলবে না, হতে হবে সেই সুসঙ্গত সমন্বয়ের অঙ্গ যাকে সমস্ত জীবন ধরে পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা ও সারসিদ্ধান্ত কিম্বা গভীর ধ্যান বা চিন্তা দিয়ে তুমি গড়ে তুলেছ।"(২)

স্থিরতা, ধ্যান—এ দুইই দুঃসাধ্য জিনিস। সেজন্য ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে রূপকথার গল্প হিসাবে ধ্যানের বর্ণনা করা হয়েছে।(৩) চিন্তাকে স্থিরতার সলিলে যখন পবিত্র করা যায় আর ধ্যানের কুটে শান্ত করা হয়, তখন এক নূতন দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পরম শক্তি অর্জন করে, আত্ম-বিভাজন ও বন্ধ্যাত্ব পরিহার করে এবং হয়ে উঠে অখণ্ড সত্যের প্রবাহ—এক স্বপ্রতিষ্ঠ বিশ্বজনীন সত্য। তারপর কুয়াসা বিদূরিত হয়, আর মনের মালভূমিতে নেমে আসে আলোর বন্যা। সেন্ট টেরেসা যেমন বলেছিলেন "যখন সূর্যের রশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন মাকড়সার জাল একটিও নজর এড়ায় না।"(৪)

---

*On the Mother—Chaps. V-VI

(1.) Words of Long Ago—P.21

(2.) Words of Long Ago—P.23

(3.) Words of Long Ago—PP.26-28

(4.) Life of St Teresa (Written by herself)—Translated by D. Lewis—Chap. XIX

হ্যামলেট বলেছিলেন, "নিদ্রা, বোধ হয় স্বপ্নের লোভে, ইঃ, ওইখানেই তো মুসকিলের মূল।" স্বপ্ন কি তবে শুধুই মানসিক চঞ্চলতা, অজীর্ণের চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়? স্বপ্ন কি শুধু মিথ্যা, বৃথা আশা ও বাস্তব রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়? স্যামুয়েল দানিয়েলের কাছে স্বপ্নের কোন প্রয়োজনই ছিল না, তাই তিনি বলেন:

"থামাও স্বপ্ন, বাসনার যত প্রতিমূর্তি তার সব
যদি চাও সুস্থ রূপ দিতে আগামী কালের কামনা-বাসনার
নবোদিত সূর্যকে কখনই দিও না মিথ্যা এদের সমর্থন করতে,
এরা আমার দুঃখকে বাড়িয়ে তীব্র করে তোলে।"

তা হ'লে শ্রীমার তের বৎসর বয়সের স্বপ্ন সম্বন্ধে কি বলা যায়? সেগুলি কি স্বপ্নাতীত—অন্ততঃপক্ষে সময়ে সময়ে—তা কি অলৌকিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নির্দেশ?

বাস্তবিকই এ সমস্যার সমাধান বিশেষ প্রয়োজন। স্বপ্ন কি তা'হলে শরীরেরই একটা অস্বাভাবিক উপবৃদ্ধি যাকে জীবন থেকে পরিহার করতে হবে কিম্বা এ কি বরং মানুষের এক অপরিণত মস্তিষ্ক বোধ যাকে যত্নে পোষণ ও পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে? প্রসঙ্গটি বিচার-সাপেক্ষ এবং শ্রীমা তাঁর 'স্বপ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধের সমাপ্তি টানেন এই বলে যে যদি সুষ্ঠুভাবে স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রিত ও সমৃদ্ধ করা যায় তাহ'লে তা "এইভাবে সুস্পষ্ট সূক্ষ্মদর্শনের রূপ পরিগ্রহ করবে এবং কখনো কখনো তা হ'বে ভবিষ্যতের সাক্ষাৎদর্শন। ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ সব জিনিসের একটা প্রয়োজনীয় আলস্য ধারাবাহিক জ্ঞান আয়ত্তে এসে যাবে।"(৫)

স্বভাবতই স্বপ্নাবেশে চেতনা থাকে নিম্নস্তরে। অপরদিকে স্বপ্ন-জগৎ তমসাচ্ছন্ন ও অপরিচিত জগৎকে নিয়ে, যা আমাদের চেতনাকে বিপরীতভাবে অভিভূত করে। যতই আমরা জাগ্রত চেতনাকে আয়ত্তাধীনে আনতে পারি ততই এই নিকৃষ্ট স্বপ্নবস্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তারপর বিশুদ্ধ স্বপ্নের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে, "আমাদের ও অপরের প্রকৃতির গুপ্ত রহস্যটি প্রকট হয়ে উঠবে।"(৬) এই সকল স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়; বরং "স্বপ্ন-সমাধি—স্বপ্নাবস্থায় আন্তর সত্তার এক সচেতন উপলব্ধি।"(৭)

(২)

"আমার অন্তর কষ্ট পেয়েছে, কাতরোক্তি করেছে, দারুণ দুঃখের ভারে প্রায় ভেঙ্গে পড়বার মত, দুঃসহ যন্ত্রণার তলায় তলিয়ে যাবার মত। কিন্তু আমি তোমাকে ডেকেছি:

(5.) Words of Long Ago—P.11
(6.) Sri Aurobindo's "Bases of Yoga"—P. 128 (1941).
(7.) Letters of Sri Aurobindo, 2nd series—P. 166

যে শান্তিদাতা ভগবান, সকল অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করেছি, আর তখনি তোমার দীপ্যমান জ্যোতি দেখা দিয়েছে, নব জীবন দান করেছে আমাকে।"(৮)

শ্রীমার এই বাণীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই দুঃখের অবানিশা থেকে নব জ্যোতি ও জীবনের জ্যোতির্ময় অনুতনয় উষার আত্মার উত্তরণের একটা নমুনা-বিবৃতি। আধ্যাত্মিক ঘটনার এই যে অনুক্রম তা হল প্রকৃতির জড়তত্ত্বেরই মত বাস্তবতার পূর্ণ, আমাদের সঙ্গে তার আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আমরা দুঃখভোগ করি কেন? আমাদের দুঃখভোগ করতে হবেই বা কেন? এর কারণ কি প্রকৃতি অন্ধ বলেই অকারণে অনুদ্দেশ্যে আমাদের আঘাত দেন? প্রকৃতি কি তাহলে এক দুষ্টা দানবী যে চক্রান্ত করে আমাদের লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করেন? মানসিক বা দৈহিক বেদনা হল 'আদম'-এর বংশ-পরিচয় মাত্র। সুকৃতি ও পুরস্কার, দুষ্কৃতি ও দুঃখের মধ্যে অনিবার্য কোনো কার্য-কারণ সম্বন্ধ কি আমরা আবিষ্কার করতে পারি? এই বিভাগ কি অঘোষ, না এরা কতকগুলি অস্পষ্ট আপেক্ষিক শব্দমাত্র?

কেন তবে পাপীর পথ হ'য়ে চলে সমৃদ্ধ? কেন আমার সমস্ত প্রচেষ্টার সমাপ্তি হবেই নৈরাশ্যে?

ভদ্রে, আপনার জন্য
জীবনের আমি যত খরচ করি
তার চেয়ে মুহূর্তের অবকাশক্ষণে বেশি লাভ করে কাননার ক্রীতদাস...(৯)

এ জগতে আমরা রসাল ফলের জন্য ঘুরে বেড়াই বা ভারাক্রান্ত চোখে বসে থাকি আর পরস্পরের কাতরানি শুনি। এই যে রসময়-ফলের জীবন তার অভ্রান্তনিত আঘাত ও বিবিধ যাতনা থেকে রেহাই পাবার কোন পথ নেই কি?

"দুঃখ আছেই"—আর এ ইউক্লিডীয় জগতের এমন অবাঞ্ছিত সংস্পর্শ থেকে নিস্তারের সহজ পথ নেই। দুঃখ অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত, কিন্তু যখন আমরা পিছন ফিরে দূরে তাকিয়ে দেখি তখন দুঃখ ও পার্থিব জীবনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে একটা অর্থও সম্বন্ধের সূত্র খুঁজে পাই। একি হতে পারে যে যাকে আমরা দুঃখ বলি তা মানবের বহির্জীবনের বিকাশ ও আন্তর জীবনের ফুল ফুটানর দিকে একটা বিশেষ, এমন কি, একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধন করে? হপ্‌কিন্‌সের কথা

যেমন সশব্দে লোহা পেটায় তেমনি
আর আগুন দিয়ে তার মধ্যে তোমার ইচ্ছাকে গড়ে তোল,
কিম্বা, না হয় কিম্বা, বসন্তের মত চুপি চুপি চুরি করে তার ভিতরে এসে
তাকে গলিয়ে ফেল আর হও তার অধীশ্বর।

(8.) Words of Long Ago—P. 12
(9.) Gerard Manley Hopkins

সেন্ট জন্ অব্ দি ক্রশ এসে বললেন—

ওগো দাহন, তুমি যে দগ্ধ দিয়ে সব নিরাময় করো,
ওগো সুখ-শিহরণের চেয়ে স্নিগ্ধ আঘাত,
ওগো কমল-কলি হাত, ওগো কোমল পরশ,
নূতন জীবনের সন্ধান দাও তো তুমিই,
তোমার করুণার নাই তো সীমানা।
আর নিধনের শান্তি দিয়ে মৃত্যুকে নিয়ে যাও জীবনে। (১০)

অপরপক্ষে সন্ন্যাসীর নেতিবাদের সব অত্যুক্তি স্বীকার করাও অপ্রয়োজনীয়, এমন কি নির্বুদ্ধিতা ও বিপজ্জনক। শ্রীমা বলেন, "দুঃখভোগ করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা কিছু নেই, আর তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে যখন আমাদের কাছে এসে পড়ে তখন তা কত সাহায্যই না করতে পারে।"(১১) নির্বিচারে দুঃখকে প্রশ্রয় দেওয়া—দেহের বা মনের উপর অপর্যাপ্ত যাতনা প্রয়োগ করা—এ হ'ল ততটাই দাসাত্মক ভাবালুতা যতটা অন্য কোন আবেগাচ্ছন্ন অবস্থার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। প্রয়োজন হল সাফল্য বা অসাফল্য আনন্দ বা দুঃখের সামনে আত্মপ্রশ্রয়ের চেয়ে আত্ম-প্রভুত্ব এবং এইভাবে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি-গুলিকে "দিব্যতা, সংযম, শুদ্ধিকর সংযম দমনের (১২) দ্বারা রূপায়িত করতে হবে।

বেশ, তাহ'লে যখন দুঃখ বেদনাকে স্বাগত করবার প্রয়োজন নেই, তখন তাকে ভয় করাও নিষ্প্রয়োজন। যদি সে আসে, আসবে সুদূর ভবিষ্যতের কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বর্তমানের সংকুচিত উদ্বেগলোক মধ্য থেকে মন্থন করে তাকে আবিষ্কার করাই আমাদের কাজ; আমরা তাই আমাদের বিশ্বাসে সন্দিহান হব না বা আত্ম-আবিষ্কারের অক্লান্ত পরিশ্রম থেকেও বিরত হব না।

"তোমরা যারা অশ্রুপাত করছ, যারা কষ্ট পাচ্ছ, যারা ভয়ার্ত, জান না কতদিন চলবে তোমাদের এই দুর্দৈব, এ দুঃখের কি ফল, তাকিয়ে দেখ এমন রাত্রি নেই যার শেষে প্রভাত আসে না, অন্ধকার যখন ঘনীভূত হয় তখনই প্রভাত আসন্ন; এমন কুয়াসা নেই সূর্যালোক যাকে সে উদ্ভাসন করে তোলে না; এমন অশ্রু নেই যাকে একদিন সে শুকিয়ে ফেলতে পারে না, এমন ঝড় নেই যার শেষে এঁকে ধরে না তার বিজয়ের ইন্দ্রধনু, এমন তুষার নেই যাকে সে গলিয়ে ফেলে না, এমন শীত নেই যাকে সে রঙীন বসন্তে পরিণত না করে।

"তোমাদের ক্ষেত্রেও তেমনি, নেই এমন দুঃখ যন্ত্রণা যা প্রতিদানে নিয়ে আসে না ঐশ্বর্যের ভারা, নেই এমন বেদনা যা রূপান্তরিত না হয় আনন্দে, নেই এমন পরাজয় যা শেষে

(10.) Arthur Symons
(11.) Words of Long Ago—P.42
(12.) Letters of Sri Aurobindo—P.213

দাঁড়ায় না বিজয়ে, এমন পতন যা হয়ে উঠে না আরো ঊর্ধ্বারোহণ, এমন নিঃসঙ্গতা যা কখনো হয়ে উঠে না জীবনের নীড়, এমন বিশৃঙ্খলা যা হয়ে উঠে না সুসঙ্গতি।"(১৩)

এর পর আরও আছে : শ্রীমা আমাদের আশ্বাস দেন যে দুঃখের শেষ প্রান্ত হ'ল আত্মোন্মীলনের গৌরবচন্দ্রিকা যা আমাদের সত্যের দরজায় নিয়ে যায় :

"প্রতিবার যখন বোধ হয় হৃদয় বুঝি বিদীর্ণ হয়ে গেল, নিজের ভিতরে আরো গভীরে তখন একটা দরজা খুলে যায় আর উন্মুক্ত হয় নবতর দিগন্ত-রেখা—প্রতিবার নিয়ে আসে অধিকতর প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্য—তারা আসে মুমূর্ষু জীবের মধ্যে আবার এক নবীন প্রখর প্রাণধারা ঢেলে দিতে।

"হে ভগবান, আর এই পুনঃপুনঃ অবতরণের মধ্যে দিয়ে চলে এসে, শেষে যবনিকা যখন অপসৃত হয় তখন তোমাকে দেখি সাক্ষাৎ,—কে প্রকাশ করবে সে-মহাপ্রাণের প্রখরতা যাতে সমস্ত সত্তা অনুপ্রবিষ্ট, সেই জ্যোতি যাতে সে পরিপ্লাবিত, সেই প্রেমের মহিমা যাতে সে চিরতরে রূপান্তরিত।"(১৪)

"আঘাত" আমাদের জীবনে প্রায়শ এমনই প্রয়োজনীয় উপাদান—সংঘর্ষ আমাদের অকস্মাৎ সজাগ করে দেয়, আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করে দেয়, দেহের ও মনের তামসিকতার জমাট আসর ভেঙে দেয়, মন নব আবিষ্কার উদ্ভাবনার পথে নিয়ে যায়। রাজকুমার সিদ্ধার্থ অনেক আঘাতের পরে বের হয়েছিলেন বহুদূরের পথ ধরে বোধিগাছটির তলে নীরব গোপন পীঠস্থানের উদ্দেশে। সাধারণত আমরা অনাধ্যাত্মিক আচ্ছন্নতার মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে বাস ও চলাফেরা করি তা আমাদের আসল সত্তাকে চিনতে দেয় না, ভিতরের ও বাহিরের ঐশ্বর্যকে ধরতে দেয় না, ব্যক্তিগত নিয়তিকে দেখতে চিনতে দেয় না। অকস্মাৎ দুঃখের আঘাত কখন কখন সম্পূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দেয়—দেহে যখন এসে ধাক্কা লাগে চক্ষু তখন বিস্ময়ে পায় নবোন্মেষ—খোলসটি যেন গা থেকে খসে পড়ে—অবশেষে শুরু হয় পুনর্জন্মের। শ্রীমার অভয়বাণী কাব্যের উদ্দীপনা ও ওজস্বিতা নিয়ে প্রমূর্ত হয় আমাদের সামনে—

"আলো শোন যে মুহূর্তে এই পৃথিবীর উপর মানুষ তার ভাগবত উৎস থেকে বিযুক্ত হয়েছে তখনকার মত সঙ্কীর্ণতম অবস্থা আর কখনো হতে পারে না। মাথার উপর তার তস্কর শত্রুর রাজ্য সীমানা, দিগন্তের দুয়ারে আগুনের তরবারি হাতে কারা-প্রহরী। তাই তো ঊর্ধ্বে জীবনের উৎসে সে যখন উঠে যেতে পারল না, সে-উৎস তখন তার মধ্যেই উৎসারিত হল ; উপর থেকে আলো গ্রহণ করতে পারল না, তাই তার সত্তার অন্তঃস্থলে ফুটে উঠলো সে আলো ; বিশ্বাতীত প্রেমের সাথে যোগসাধন করতে পারল না, তাই সে প্রেম নিজেকে পূর্ণাহুতি দিল, করল আত্মদান, তার আবাস তার বন্দিরূপে বরণ করে নিল প্রত্যেকটি পার্থিব জীবকে।

(13.) Words of Long Ago—P.49
(14.) Words of Long Ago—P.42

"এই রকমে এই অবহেলিত অথচ উর্ব্বর, পরিত্যক্ত অথচ পুণ্যবান জড়ের প্রতিটি পরমাণুতে রয়েছে এক ভাগবত চৈতন্য, প্রত্যেক জীব তার অন্তরে নিয়ে চলেছে ভগবানকে, তাই যেমন মানুষের মত দুর্বল আর কেউ নেই, তাই আবার তার মত স্বর্গীয়ও কিছু নেই।

"এক যা সত্য, অতি সত্য, দীনতা হীনতার অন্তরেই লালিত পালিত হয় মহান মহিমা।"(১৫)

(১৫) Words of Long Ago—P.52

বর্ষ—২০ সংখ্যা—৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ আগষ্ট, ১৯৫০)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

১।	চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২।	শ্রীঅরবিন্দ ও মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য		৩
৩।	মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৮
৪।	বাসবদত্তা	শ্রীঅরবিন্দ	২৭
৫।	শ্রীমা প্রসঙ্গ	ডাঃ কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	৪৭
৬।	মহামানবের সাগরতীরে	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯
৭।	যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	৬৬
৮।	বিভূতিভূষণের শিল্পদৃষ্টি	শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	৭৬
৯।	দুখানি পত্র		৭৯
১০।	তোমার জন্মদিনের সুর (কবিতা)	নিশিকান্ত	৮২

বার্তাকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৩, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—২৲ টাকা

454-'60-750

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

১৫ আগস্ট ১৯৬০

ভগবৎ-জননী

সচেতন সনাতন শক্তি এক রয়েছে এখানে,
দুঃখের আর মর্ত্যজন্মের পশ্চাতে,
ভ্রান্ত-বুদ্ধির আর কালের বিভ্রান্ত মন্থরতার পশ্চাতে—
বিধাতার জননী সে, ভগ্নী সে, পত্নী সে,
তাঁর জ্ঞানের তনয়া, তাঁর শক্তির সঙ্গিনী,
বিশ্বাতীতের প্রচ্ছন্ন বুকের ভিতর থেকে উৎক্রান্ত হয়েছে,
মনের প্রাণের রামধনু-জগৎসব নির্ম্মাণের জন্য
একদিকে পরাচেতনার অনুত্তর জ্যোতি,
অন্য দিকে অচেতনার বিপুল চিন্তাহারা প্রয়াস—
জড়ের সুপ্তির এলায়িত নৈমিত্তিক ধারায়,
আর নক্ষত্ররাজির নিদ্রামগ্ন গতিভঙ্গে—
মাঝখানে শূন্যের মধ্যে সবলে এনে ধরে সে
তার জীবনের অভিযান, তার লালসার স্বপ্ন।
তামসীশক্তির ক্রিয়ার মধ্যে সে রয়েছে এখানে,
ব্যোম-প্রসারে যত প্রমাদ যত পাপ তা নিরাময় করতে,
অজ্ঞানময় জগতের করুণ বিচ্ছেদ-গাথা
আনন্দের দিব্য মহামিলনে আর
ভাগবত রভসের হাসি ও উল্লাসে পরিণত করতে।
ভাগবতী জননী হলেন আমাদের অন্তরাত্মার প্রভু,
কালের ধারায় ভগবানের যে জন্ম তার লীলাসঙ্গী আমরা,
তাঁর উত্তরাধিকারী, তাঁর আনন্দের অংশী।

শ্রীঅরবিন্দ

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীঅরবিন্দ

৮

কর্ম্ম

ভগবান মানুষকে সুপথে নিয়ে চলে, মানুষ নিজেকে নিজে নিয়ে চলে অপথে। ঊর্দ্ধতন প্রকৃতি নিম্নতন মর্ত্ত্যধর্ম্মের পদস্খলন সব সাক্ষী হয়ে দেখছে—এই হল সেই দ্বন্দ্ব আর বিরোধ, তা পার হয়ে আমাদের উঠতে হবে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যে, আত্মঐক্যের মধ্যে একমাত্র যেখানে সম্ভব নির্দ্দোষ ক্রিয়া।

*

জীবের উপর করুণা তোমার থাকবে, ভাল কথা ; কিন্তু ভাল কথা নয়, যদি তোমার করুণার তুমি দাস হয়ে পড়। কারো-কিছুরই দাস হবে না, একমাত্র ভগবান ছাড়া—এমন কি তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময় প্রতিভূদেরও নয়।

*

আনন্দ হল মানবজাতির জন্য ভগবানের লক্ষ্য—এই পরম শ্রেয় নিজের জন্য তুমি প্রথমে আহরণ কর, যাতে পরে সম্পূর্ণভাবে তা তুমি বিতরণ করতে পার বিশ্বজনে।

*

কেবল নিজের জন্য আহরণ করা হল পাপ আহরণ—যদি বা তাকে স্বর্গ ও পুণ্য বলতে পার।

*

আমার অজ্ঞানে আমি মনে করছি ক্রোধ মহান হতে পারে, প্রতিহিংসা হতে পারে মহিমাময়—কিন্তু এখন যখন দেখি মহাক্রোধ-বিক্ষুব্ধ বীর একিলিসকে তখন চোখে পড়ে রোষসুন্দর সুন্দর এক শিশু যেন—আমি তাতে আনন্দ পাই, আমোদ পাই।

*

শক্তি মহান হয়ে ওঠে, যখন সে ক্রোধ ছাড়িয়ে উপরে উঠে দাঁড়ায়। ধ্বংস-সাধন মহিমাময় বটে কিন্তু হয়ে পড়ে কালিমাময় যদি তার উৎস হয় প্রতিহিংসা। এ সব বিসর্জ্জন দাও, এরা নিম্নতন মানবত্বের জিনিস।

*

কবিরা মৃত্যু আর বাহ্য দুঃখ-কষ্ট খুব বড় করে দেখেন, কিন্তু একমাত্র করুণ নাট্য হল অন্তরাত্মার ব্যথতা, আর একমাত্র মহাকাব্য হল দেবত্বের দিকে মানুষের বিজয়ী উত্তরণ।

*

প্রাণের ও দেহের যত করুণ-গাথা তা হল শিশুর ক্রন্দন তার ছোটছোট বেদনা আর ভগ্ন খেলনা নিয়ে। অন্তরে হাসো, কিন্তু শিশুদের সান্ত্বনা দিও, আর যদি পার তাদের খেলাতেও যোগ দাও।

*

"প্রতিভাবান মানুষরা সকলেই কেমন অস্বাভাবিক অধাতস্থ যেন।" কেন হবে না? প্রতিভা জিনিসটার জন্ম হল অস্বাভাবিক, সাধারণ ধাতের বাহিরে তার স্থান।

*

প্রতিভা হল প্রকৃতির প্রথম চেষ্টা তার যে মানুষী ছাঁচ তা থেকে বন্দী দেবতাকে মুক্ত করবার জন্যে—সে প্রক্রিয়ায় ছাঁচটাকে কষ্টভোগ ত করতেই হয়। কাটল যে এত কম ও বৎসামান্য তাই আশ্চর্য্যের কথা।

*

তার নিজের বাধায় প্রকৃতি নিজেই ক্ষেপে যায়, তখন মস্তিষ্ককে ক্ষতি করেও অন্তঃ-প্রেরণাকে মুক্ত করে দিতে চায়—এই যে চেষ্টা তার প্রধান শত্রু হল একান্ত সাধারণ জড় মস্তিষ্ক। এর-ওর পাগলামীর দিকটায় নজর দেবে না, তাদের প্রেরণা থেকে কি লাভ করতে পার তাই দেখ।

*

কালী যখন অধারের মধ্যে তাঁর রুদ্র শক্তি নিয়ে, তাঁর অনন্ত দেবত্ব নিয়ে সবেগে প্রবেশ করেন, কে তা সহ্য করতে পারে—যে মানুষকে কৃষ্ণ অধিকার করে রয়েছে সে ছাড়া?

*

উৎপাড়ককে বিদ্বেষ করবে না, কারণ সে যদি শক্তিমান হয় তবে তোমার বিদ্বেষ তার বাধার শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে, আর সে যদি দুর্ব্বল হয়, তবে তোমার বিদ্বেষ নিষ্প্রয়োজন।

*

বিদ্বেষে আছে তরবারীর শক্তি—কিন্তু সে তরবারী দুদিকে ধারাল। তা হল প্রাচীন মন্ত্রবাদীদের ক্রিয়ার মত, যদি শীকার না ধরতে পারে, তবে ক্রিয়াকারকের উপর সরোষে ফিরে পড়ে গিয়ে।

*

তোমার শত্রুর অন্তরে যে ভগবান তাঁকে ভালবাস, যখন তুমি তাকে আঘাত কর তখনও, তা হলে তোমার বা তার কারই নরকভোগ হবে না।

*

২

লোকে তাদের শত্রুর কথা বলে। কিন্তু কোথায় শত্রু? আমি ত দেখছি বিশ্বের বিপুল ক্রীড়াঙ্গনে একদল কি আর এক দলের মত্ত সব।

*

সাধুরা, এঞ্জেলরাই একমাত্র দেবশক্তি নয়—অসুরদের দৈত্যদেরও সম্মান দেবে।

*

প্রাচীন শাস্ত্রে অসুরদের বলা হত বৃদ্ধতর আদি দেবতা—এখনো তারা তাই রয়েছে, কোন দেবতাই পূর্ণ দেবতা হতে পারে না, যদি না তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এক অসুর।

*

আমি যদি রাম না হতে পারি, তবে রাবণ হতে চাই, কারণ রাবণ হল বিষ্ণুর ছায়ার দিক।

*

আত্মবলি, আত্মবলি, আত্মবলি চাই সর্ব্বদা—তবে ভগবানের জন্যে, মানবজাতির জন্যে, শুধু আত্মবলির জন্য নয়।

*

স্বার্থপরতা অন্তরাত্মাকে হত্যা করে। কিন্তু সাবধান, পরার্থপরতা যেন অপরের অন্তরাত্মা হত্যা না করে।

*

প্রায় সর্ব্বদাই পরার্থপরতা হল স্বাপরর্থতারই সর্ব্বোত্তম রূপ।

*

ভগবান যখন আদেশ দিয়েছেন তখন যদি হত্যা না করা হয় তবে জগতের মধ্যে করা হয় অপরিসীম বিশৃঙ্খলা।

*

যতক্ষণ পার মানুষের জীবন সম্মান করে চল, কিন্তু সর্ব্বদাই বেশি সম্মান করো মানবজাতির জীবন।

*

মানুষ হত্যা করে, অসংযত ক্রোধ, বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার বশে—প্রতিক্রিয়ার ভোগ তার হবেই এখন হোক পরে হোক। অথবা মানুষ হত্যা করে কোন স্বার্থসাধনের জন্য, বিবেচনা করে—ভগবান তাকে মার্জনা করবেন না। মানুষ যদি হত্যা করে, তবে প্রথমে অন্য দিকটা দেখার জন্য তাকে জানতে হবে মৃত্যুকে, দেখতে হবে ভগবানকে হন্তের মধ্যে, হননের মধ্যে, হননকারীর মধ্যে।

*

সাহস আর প্রীতিই কেবল অপরিহার্য্য সদ্ধর্ম্ম—আর সব গুলিই যদি অস্তমিত বা সুপ্তি-কবলিত হয়ে যায়, তবুও ঐ দুটিতেই মানুষের অন্তঃপুরুষকে বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখবে।

*

নীচতা আর স্বার্থপরতা এই দুটি পাপকে ক্ষমা করা কঠিন আমার পক্ষে, কিন্তু এই দুটিই প্রায় সার্ব্বজনীন। তাহলে অপরের মধ্যে এ দুটিকেও বিদ্বেষ করবে না, কিন্তু নিজের মধ্যে নির্মূল করে ফেলবে।

*

মহত্ত্ব আর ঔদার্য্য হল অন্তরাত্মার স্বর্গীয় পরিবেশ—এদুটিকে বাদ দিলে মনে হয় যেন দেখছি অন্ধকূপের মধ্যে কীট এক।

*

তোমার গুণ মানুষের প্রশংসা পুরস্কারের উপর যেন নির্ভর না করে, তারা থাকবে তোমার উৎকর্ষ সাধনের জন্য, আর তোমার প্রকৃতির অন্তঃস্থ ভগবান তোমার কাছ থেকে তাদের চায় বলে।

*

পরার্থপরতা, কর্ত্তব্য, পরিবার, দেশ, মানবজাতি সব হল অন্তরাত্মার কারাগার যদি তারা অন্তরাত্মার যন্ত্র বা করণ না হয়ে উঠতে পারে।

*

আমাদের দেশ হলো ভাগবতী জননী, তাঁর সম্বন্ধে কটুবাক্য বলবে না, যদি তা প্রেমে ও সমাদরের সঙ্গে না করতে পার।

নিজের লাভ করবার উদ্দেশ্যে মানুষ হয় দেশদ্রোহী, অথচ তারা মনে করে এই মাতৃদ্রোহ থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরাবার অধিকার তাদের আছে।

*

অতীতের ছাঁচ ভেঙ্গে ফেল, কিন্তু তার নিজস্ব প্রতিভাকে, তার অন্তরাত্মাকে বাঁচিয়ে রাখ, নতুবা তোমার ভবিষৎ নাই।

*

বিপ্লব অতীতকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে, ফেলে দেয় একটা কুটন্ত কটাহে, কিন্তু ফলে যা বের হয়ে এসেছে তা সেই পুরাণো মানুষটিই নূতন একটা রূপ নিয়ে।

*

জগতে খুব বেশি আধ ডজন সফল বিপ্লব ঘটেছিল কিন্তু তারও মধ্যে প্রায় সবগুলিই প্রায়-ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল—কিন্তু এ রকম মহান ও সমুচ্চ ব্যর্থতা ধরেই মানবজাতি এগিয়ে চলে।*

*

*অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দ ও মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা কাব্য"

[কবি হিসাবে মধুসূদন শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মধুসূদনের উপর শ্রীঅরবিন্দের কবিতাটি অনেকের পরিচিত, যেমন পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তাঁর কবিতাটি। দুটি কবিতাই কবি দত্তোজ দত্ত অনুবাদ করেছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যের দুটি কবিতার উপর শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি—আমাদের পাঠকবর্গকে তা উপহার দিলাম এখানে। ঘরোয়ার বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যখন শ্রীঅরবিন্দ ঘনিষ্ঠতর পরিচয় গ্রহণ করছিলেন তখনকার লেখা।

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য লাতিন কবি ওভিদ (Ovid) কৃত Heroides-এর অনুসরণে রচিত। পৌরাণিক কাহিনীর কয়েকজন বিখ্যাত নায়িকা তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযোগ-অভিযোগ জানিয়ে তাঁদের প্রেমাস্পদদের কাছে পত্র লিখেছেন—সেই কাল্পনিক পত্রগুচ্ছ হল কাব্যখানি।—ব. স.]

I

SHAKUNTALA TO DUSHYANTA

A Virgilian elegance and a Virgilian sweetness and majesty of diction ennoble the finer Epistles of these Heroides; there is too a Virgilian pathos, sad and noble, breaking out in detached lines and passages, as in Shacountala's sorrowful address to the leaf[1] and the single melancholy line এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরুশাখে— but the more essential poetical gifts, creative force, depth or firmness of meditation, passionate feeling, a grasp of the object, consistent purity of characterisation are still absent. They

---

১ কবি পত্রে,—'খোল্ পত্র,—সহসা দেখিলে
তোরে, সখীসম আসি মাতে তোরে নরে
প্রেমালোকে; কিন্তু যবে শুকাইল্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে;—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি?'

were not in the poet's nature and such gifts if denied by Nature, are denied for ever. What exists even faintly can be developed, transformed and strengthened, but what does not exist cannot be produced by labour *nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah*

II

TARA TO SOMA

The Epistle of Tara is perhaps less satisfactory ; the fiery outbursts of a monstrous and lawless passion needed a stronger imagination than Madhusudan's to conceive and execute them. The elegances of the Epistle with its graceful rephrasing of outworn classical images and its stately love-conceits are out of place where the volcanic sheerness of a Webster could alone have been appropriate. Nevertheless the passage'[1], in which Tara complains of the unclean love she cannot avoid or control is not without a noble dignity of passion and shows with what charm the poet could invest the plainest and the most hackneyed images. And there are lines in this latter part which have the true note of that terrific passion, her cry—দেহ ভিক্ষা. দেহ ভিক্ষা,[2]

---

১ ……কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিশার প্রহরী, আমি চাহে নিবাইতে
তোমার পাপিনী তারা !…

২ তুমেছ তনয় যম : দুঃখিনী দাসে ;
তব-পত্নী চাহে ভিক্ষা,—ভিক্ষা দেহ তারে—
দেহ ভিক্ষা,—হারাজপে থাকি তব সহে
নিবানিশি ;…

the magnificent distichs কলঙ্কী শশাঙ্ক[3] etc. and লিখিনু লেখন[4] etc. and the powerful closing line[5] have all a dramatic simplicity, fire and force which belong to the highest poetry only. Would that Madhusudan had written not only stray lines, distichs, passages[6] but whole poems in this spirit ! The deplorable want of a discerning criticism and false conceptions of poetry early imbibed have done untold harm to our best and most promising writers.

---

3 'কলঙ্কী শশাঙ্ক', হেলা করে সর্ব্বজনে ;
কহ দাসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে
তারাদাস···

4 লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ডরে কাঁপি খেদে, মরিয়া সরমে।

5 জীবন মরণ আমি তব হাতে।

6 ·····জনম মম মহাব্ধিকূলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ! কহিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা —পাপ-প্রবাহিনী—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

(১)

প্রশ্ন : আন্তর্লৌকিক (psychological) সিদ্ধি কাকে বলে ?

উত্তর : একজন জিজ্ঞাসা করলে, চাঁপাফুলকে যে আমি "আন্তর্লৌকিক সিদ্ধির" প্রতীক বলি, সে জিনিসটা কি। এই আন্তর্লৌকিক সিদ্ধি মাত্র একটি জিনিস নয়—মোটের উপর পাঁচটি, চাঁপাফুলের যেমন পাঁচটি পাপড়ি থাকে তেমনি। আমরা সিদ্ধির সেই পাঁচটিকে বলেছি : ঐকান্তিকতা, বিশ্বাস, ভক্তি, আশ্পৃহা ও সমর্পণ। কিন্তু যখনই যাকে আমি এই চাঁপাফুল দিচ্ছি তখনই তা যে ঐ একই রকম প্রতীকের অর্থে দেওয়া হচ্ছে এমন কথা নয়। প্রতীক জিনিসটা খুবই গৌণ, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতীক বদ্‌লে দেওয়া যায়।

তবে ক্ষেত্র যেমনই বিভিন্ন হোক, পূর্বোক্ত পাঁচটির মধ্যে প্রথমটি সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজন, যাকে বলেছি ঐকান্তিকতা। ওটি অবশ্যই থাকা দরকার, কারণ ঐকান্তিকতা ছাড়া কেউ কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারেনা, এমন কি আধ কদমও নয়।

এই ঐকান্তিকতার আরো এক নাম দেওয়া যায় স্বচ্ছতা। কেন তা বুঝিয়ে বলি। আমার কাছে কেউ এলেই আমি আগে তার চোখের দিকে চেয়ে দেখি। লোকটি যদি ঐকান্তিক হয় অর্থাৎ তার অন্তর যদি স্বচ্ছ হয়, তাহলে আমার দৃষ্টি তার চোখের ভিতর দিয়ে সোজা চলে যায় তার অন্তস্তল পর্যন্ত, তার অন্তরাত্মাকে তখন আমি পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু কারো কারো বেলা দেখি, মাঝে বাধা রয়েছে একটা ছোট্ট বেষ। তবু আমি এগিয়ে যাই, কিন্তু সামনে দেখি এক পর্দার আড়াল। তবুও এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখি একটা দেয়ালের বাধা, যা ঘনিয়ে আছে কালো নিরেট অন্ধকারের মতো। তাকে ভেদ করে দৃষ্টি পাঠাতে হলে ছিদ্র কেটে যাবার দরকার হয়, কিন্তু তাও যদি করতে যাই তবে শেষ পর্যন্ত পথরোধ করে দাঁড়ায় কঠিন ধাতুর নিরেট এক দরজা, সে দরজা এমনই পুরু যে তাকে ভেদ করে গিয়ে ভিতরের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেখানেই আমার জানা হয়ে যায় যে ঐকান্তিকতা জিনিসটি ওর মধ্যে নেই, ভাষান্তরে বলব ওর মধ্যে স্বচ্ছতা নেই। এই হলো প্রথম কথা।

তারপর, সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে হলে আরো একটি জিনিস থাকা নিতান্ত অপরিহার্য—বিশ্বাস। এরও একটা অপর নাম দেওয়া যায়—আস্থা। কারণ—এ হলো অনুভূতির

রাজ্যের কথা—ভগবান সম্বন্ধে বিশ্বাস করলেও যদি তাঁর উপর তোমার পূর্ণ আস্থা না থাকে, তাহলে কেবল বিশ্বাসটি নিয়েই তুমি বসে রইলে, এদিকে ভগবানের শক্তি যে তোমার মধ্যে কাজ করছে কিংবা তিনি মঙ্গলই করছেন সে বিষয়ে আস্থাটি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকল, তিনি যে তোমার উপর একটা আস্থা রাখেন সে সম্বন্ধে আস্থাও আর রইল না,—এই তিন রকম মারাত্মক প্রতিবন্ধক এখানে রয়েছে।

প্রথম দফায়, এমন এক দল লোক আছে যারা বলে যে ভগবানের উপর বিশ্বাস তাদের অটল ; তারা বলবে, "ভগবানই সব কিছু করেন আর সব কিছু করতে পারেন। আমার তোমার মধ্যে যা কিছু হচ্ছে, সর্বত্রই যা কিছু ঘটছে, সবই হলো তাঁরই কর্ম। তিনি ছাড়া কোনো কিছুই নয়।" কিন্তু মুখে এ কথা বললেও যখন তারা যুক্তি দিয়ে নিজের মনে ভেবে দেখে, তখন ভগবানের অনেক কিছু কুকর্মও তারা আবিষ্কার করে, ভগবানের দোষ দেখিয়ে বলে, "জগতের এই সব অনিষ্টও তো তাঁরই দ্বারা ঘটছে। সুতরাং তিনি ভগবান হয়েও যেন রাক্ষসের মতো নিষ্ঠুর,—আস্থা না থাকলে এই হয়।

কিংবা ভগবানে বিশ্বাস যদিও থাকে, তবু তারা বলে, "হাঁ, ভগবানের উপর বিশ্বাস করি বৈকি, কিন্তু এই জগতের হালচাল জানতে আমার বাকী নেই। প্রথমেই দেখ এই জগতে এসে আমি কত যন্ত্রণা পাচ্ছি, আমার মতো অসুখী ও দুর্ভাগা আর কেউ নেই (প্রত্যেকেই তাই বলবে যে সেই হলো সব চেয়ে বেশী অসুখী)। জীবন আমার উপর বড়ই বিমুখ। কিন্তু কথা এই যে ভগবান তো রয়েছেন, যিনি সর্বমঙ্গলময় ও অপার করুণার আধার, তিনি থাকতে আমার এ দুর্দশা কেন? তাহলে বলতে হয় যে তাঁর নিজের কোনো ক্ষমতা নেই, নইলে তিনি অমন করুণাময় হলেও আমার এ লাঞ্ছনা কেন?" এইরকম কথা হলো দ্বিতীয় দফার প্রতিবন্ধক।

আবার তৃতীয় রকমও আছে। এখানে তাদের সম্বন্ধেই বলছি যারা অতিমাত্রায় হীন হয়ে দীনতা ও নম্রতার বাড়াবাড়ি করে, তারা আবার বলবে, "আমি এতই অপদার্থ যে ভগবানের দয়ার যোগ্য হয়ে গেছি, আমার দ্বারা কিছুই হবার নয় দেখে তিনিও হাল ছেড়ে আমাকে বাদ দিয়ে রেখেছেন, যার সম্বন্ধে কোনোই আশা নেই তেমন অনুপযুক্তকে নিয়ে তিনি কিই-বা করতে পারেন।"

ভগবানে বিশ্বাস থাকলেও এই সব কথা। সুতরাং কেবল বিশ্বাসেই কিছু হয়না, তার সঙ্গে থাকা চাই তাঁর কৃপার উপর ষোল আনা পরিপূর্ণ আস্থা। নতুবা বিপত্তি হবেই।

আধ্যাত্মিক সিদ্ধির তৃতীয় জিনিস হলো ভক্তি। হাঁ, এই ভক্তি জিনিসটা খুবই উৎকৃষ্ট তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সঙ্গে আরো আনুষঙ্গিক বিশেষ কিছু থাকা দরকার, নতুবা এ জিনিসও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, এর মধ্যে অনেক ত্রুটি এসে ঢুকতে পারে।

মনে করো ভক্তি যথেষ্টই আছে, কিন্তু তার পিছনে রয়ে গেছে তোমার আপন অহং-ভাবটি। ভক্তির কাজ সবই তুমি করছ বটে, কিন্তু তার পিছনে রয়েছে তোমার ব্যক্তিগত

অহংএর প্রেরণা, সুতরাং তোমার সকল কাজই হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই আমিত্বের দ্বারা রঞ্জিত। অর্থাৎ ভক্তি করতে করতেও তুমি ভাবছ নিজের দিকের কথাই, অন্য কোন দিকের নয়, জগতের দিক বা কর্মের দিক বা করণীয়ের দিক তুমি দেখছ না,—কেবল ভাবছ, আমি ভক্তি করছি, এ হলো আমার ভক্তি, আমার নিজের তৈরি ভক্তি। এও পুরো স্বার্থপরতা।

তারপর যেমনি দেখলে যে কোনো কিছু কারণে ভগবানের তরফ থেকে তোমার ঐ ভক্তির যথোচিত সাড়া এলো না, তখন অমনি আশাভঙ্গ হয়ে ঐ তিনরকম বিপত্তির খাদের মধ্যে গিয়ে পড়বে, যার কথা এখনই বললাম। হয় ভগবানকে বলবে নির্দয় নিষ্ঠুর—গল্পের মধ্যে এমন অনেক পড়েছি, ভক্ত বলছে যে ভগবানের দয়া আর আগের মতো নেই, তিনি এখন অনেক দূরে সরে গেছেন; ভগবানকে সম্বোধন করে সে বলছে, "কেন তুমি আমায় পায়ে ঠেললে? হে নির্মম ভয়ংকর, কেন তুমি আমায় পথে বসালে?" এমন কথা অনেকের হয়তো মুখে বলতে সাহস হয় না, কিন্তু মনে মনে বলে; কিংবা অন্যভাবে হয়তো বলে, "ও, তবে আমিই কোনো কিছু মারাত্মক দোষ করে ফেলেছি, তাই তিনি শাস্তিস্বরূপ আমায় এমন করে ত্যাগ করেছেন," এইরকম বলে তারা হতাশার গহ্বরে গিয়ে পড়ে।

তাই বলছি, ভক্তির সঙ্গে আরো একটা বিশেষ জিনিস থাকা খুব দরকার—কৃতজ্ঞতা। কিসের জন্য কৃতজ্ঞতা? এই বিশ্বজগতে ভগবান বলে কিছু যে আছে, তিনি যে উপস্থিত থেকে সর্বক্ষণই এখানে বিরাজ করছেন, এখানে যত কিছু বিসদৃশ ব্যাপার দেখা যায় তাই যে এখানকার একমাত্র পরিচয় নয়, ভগবান বলে একজন উপরওয়ালা রয়েছেন এর মধ্যে, তিনি যে তথাপি আছেন এই পরম বিস্ময়, এরই জন্য কৃতজ্ঞতা—শুধু এই কারণে যে আছেন তিনি, আমাদের আশেপাশে রয়েছেন তিনি। সামান্য সামান্য চিহ্নের দ্বারা যতবারই তাঁর অস্তিত্বের বাস্তবতা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে জানান দিয়ে যাচ্ছে, ততবারই এক বিস্ময়কর তীব্র আনন্দে তোমার হৃদয় কানায় কানায় উছলে উঠছে, এর দরুন কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। আর এই কৃতজ্ঞতার আস্বাদ অন্যান্য সকল জিনিসের আস্বাদের চেয়ে অনেকগুণে রমণীয়। কৃতজ্ঞতার ভাবটির স্পর্শ যতখানি আনন্দ এনে দিতে পারে, অন্য কিছুতেই ততখানি সম্ভব নয়। তুমি চমৎকার একটি পাখির ডাক শুনলে, সুন্দর একটি ফোটা ফুল দেখলে, ফুটফুটে নধরকান্তি একটি শিশুকে দেখলে, কিংবা কোনো মানুষের হৃদয়ের বদান্যতা তোমার চোখে পড়ল, বই পড়তে পড়তে অপরূপ একটি নতুন কথা মিলে গেল, কিংবা বর্ণনাতীত এক সূর্যাস্ত দেখলে,—এই সব অপূর্ব জিনিস যতই তোমাকে অভিভূত করে ফেলবে, হৃদয়ে তোমার বিচিত্র ভাবতরঙ্গ ততই কানায় কানায় ভরে উঠতে থাকবে। সে ভাব যেমন গভীর তেমনি জীবন্ত, কারণ তুমি চোখ ফুটে দেখতে থাকবে যে ওগুলি তাঁরই অভিব্যক্তি, তাঁর এমন কত অভিব্যক্তিতে সারা জগৎ ওতপ্রোত, তুমি একে একে দেখতে পাবে তখন জগতের সকল কিছুর পিছনেই রয়েছেন তিনি। এরই কৃতজ্ঞতা।

ভক্তির সঙ্গে এটি চাই। আমি তাই বলি যে এই কৃতজ্ঞতা না থাকলে ভক্তি হয় অপূর্ণ।

তারপর সিদ্ধির চতুর্থ জিনিস—আশ্পৃহা। এই জিনিসের আরো একটি নাম দিচ্ছি —শৌর্য। অর্থাৎ নির্ভীকতা। সে এমন নির্ভীকতা যার মধ্যে থাকবে দুস্তর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সাহস ও তেজ। অমনি চরম অ্যাড্‌ভেঞ্চারের আবেগই হলো আশ্পৃহা—তা এমনই তোমাকে পেয়ে বসবে যার মধ্যে কোনো হিসাব থাকবে না, রেখে ঢেকে করবার কিছু থাকবে না, ফিরে যাবার কোনো রাস্তা থাকবে না ; কারণ তুমি চলেছ তখন চরমের চরম ভগবান আবিষ্কারে, তাঁর সাক্ষাৎ পেতে, তার চেয়েও বড়ো কথা তাঁকে উপলব্ধির মহা অ্যাড্‌ভেঞ্চারে ; সাহস করে ওর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া চাই একবারও পিছু ফিরে না চেয়ে, এক মিনিটের জন্যও এমন প্রশ্ন না ভেবে যে "এর ফল কি হবে?" কারণ ওরূপ প্রশ্ন মনে জাগলে তুমি যাত্রা মোটে শুরু করতেই পারবে না, যেখানে পা দিয়ে যেমন অবস্থায় এখন আছো সেইরকমই থেকে যাবে, আর কেবল ভয় হতে থাকবে পাছে ভয়ানক কিছু ক্ষতি হয়ে যায়, পাছে নিজের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

আমি শৌর্যের কথা বললাম ঐ কারণেই, যদিও আশ্পৃহা বলতে প্রকৃতপক্ষে দুই জিনিসই তার মধ্যে আছে। প্রকৃত আশ্পৃহা মানেই পুরো সাহসিকতা।

এবার সিদ্ধির পঞ্চম কথা—সমর্পণ। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলেছেন যে এই যোগের পক্ষে সমর্পণই হলো সব চেয়ে প্রথম অপরিহার্য প্রয়োজন। সুতরাং একে শুধু পাঁচটির মধ্যে একটি বলাই যথেষ্ট নয়, যোগ শুরু করতে হলে সবার আগেই এটি অপরিহার্যরূপে থাকা চাই। পূর্ণ সমর্পণ করতে যদি মনস্থ করে না থাকো, তাহ'লে এই যোগের কাজ তোমার আরম্ভই হবে না। কিন্তু পূর্ণ সমর্পণ করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে আরো চারটি তখন এসে পড়বে—ঐকান্তিকতা, বিশ্বাস, ভক্তি, আশ্পৃহা।

এখানে ওর মধ্যে আরো একটি জিনিস আমি যোগ করে দিচ্ছি—সহিষ্ণুতা। বিলম্বে কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে তোমার সকল বাধার সম্মুখীন হতে হবে, কাজটা বড়ো কঠিন বলে হাল ছেড়ে না দিয়ে আপন প্রয়াসে অটলভাবে লেগে থাকতে হবে, আঘাতের পর আঘাত এলেও সবস্তই নির্বিবাদে যাকে বলে "পকেটস্থ" করে নিয়ে অবিচল চিত্তে আপন পথে অগ্রসর হতে থাকবে, এ কথা জেনে রাখবে যে দোষত্রুটি যতক্ষণ তোমার মধ্যে আছে ততক্ষণ ঐ সব আঘাত আসবেই, এ অবস্থায় সহিষ্ণু হয়ে না থাকলে বেশী দূর এগোতেই পারবে না ; প্রথমেই এক মোড়ের বাধায় গিয়ে যেমনি দেখবে যে তোমার সংকীর্ণ মামুলী জীবন আর নেই, অমনি হতাশ হয়ে সব সংকল্প ছেড়ে দিয়ে সেখানেই বসে পড়বে।

এই সহিষ্ণুতার সক্রিয় বাস্তব রূপ হলো অধ্যবসায়। দরকার হলে একই কাজ পুনঃ-পুনঃ হাজার বার করবে, এবং প্রত্যেকবারই সমান যত্নের সঙ্গে তা নতুন করে শুরু করবে এমন দৃঢ়সংকল্প না থাকলে তুমি শেষ পর্যন্ত কোথাও গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। অনেকেই আসে আমার কাছে, হতাশভাবে বলে, "আমি মনে করতাম যে অমুক গ্রন্থিটা নিশ্চিত পার হয়ে এসেছি, কিন্তু এখন আবার তাই নিয়েই নতুন করে কেঁচেগণ্ডুষ করতে হচ্ছে।" তখন যদি

তাদের বলি, "তাতে কি হয়েছে, আরো হয়তো একশো দুশো, হাজার বার তাই করতে হবে," তাহলে তখনই তারা নিরাশ হয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে। এক ধাপ এগিয়েই তোমরা ভাবো যে এটুকু নিয়েই কাজ হলো, কিন্তু আরো খানিক এগিয়ে দেখতে পাবে যে কোনো কিছু নিয়ন্তের অজুহাতে আবার সেই আগেকার বাধাটাই সামনে হাজির হয়েছে। তোমার হয়তো খুব দৃঢ়বিশ্বাস যে অমুক সমস্যাটার তুমি পুরো সমাধান করে ফেলেছ, কিন্তু তবুও পরে দেখবে সেই সমস্যা নিয়েই আবার তোমায় নতুন করে সমাধান করতে হচ্ছে; হয়তো তার চেহারার কিছু অদলবদল হতে পারে, কিন্তু আসলে জিনিসটা একই।

আরো দেখ, যাদের কোনো সূক্ষ্মানুভূতি স্পষ্টভাবে নিলে যায়, তারা অমনি বলে ওঠে, "এবার আমি ঠিক জিনিসটা পেয়ে গেছি।" কিন্তু পরে সে অনুভূতি মিলিয়ে আসে, ঝাপ্সা হয়ে ক্রমশ যবনিকার অন্তরালে চলে যায়; অপ্রত্যাশিত রকমে অনেক অবান্তর জিনিস এসে তখন জোটে যা নিতান্ত মামুলী ও তুচ্ছ, সেইগুলোই তোমার পথে আড়াল করে দাঁড়ায়। তখন মনে এই বলে অনুতাপ আসে, "আগে যতখানি উন্নতি দেখেছিলাম তাতে আমার ফল কি হলো, আবার তো এই সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে গোড়া থেকে সমস্ত শুরু করতে হচ্ছে। এ কেন হবে? কত চেষ্টা যত্ন করে একটু যদি সফল হলাম, অনেক কষ্টে একটু উঁচু জায়গাতে পৌঁছলাম, কিন্তু এখন দেখছি তা কোনো কাজেরই হয়নি, সমস্তই ব্যর্থ!" তার মানে আর কিছুই নয়, তোমার সেই আমিত্ব, এখনো টিকে আছে, সে "আমিত্ব" কোনো সহিষ্ণুতা নেই।

কিন্তু সহিষ্ণুতা যদি থাকে, তখন তুমি বলবে, "ঠিক আছে, দরকার হলে বারেবারেই চেষ্টা চালিয়ে যাবো, হাজার, লক্ষ বারই তাই করবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে যেতেই হবে, কিছুতে আমায় থামাতে পারবে না।"

সহিষ্ণুতার এই ভাবটি থাকাই নিতান্ত দরকার।

তাহলে এখন ওর সবগুলিকে একত্রে জড়ো করে সবচেয়ে প্রথম স্থান দেওয়া হোক সমর্পণকে। গোড়াতেই আমরা শিরোধার্য করে নিলাম যে পূর্ণযোগের পক্ষে ভগবানের কাছে পূর্ণ সমর্পণের সঙ্কল্প প্রথম থেকেই করা চাই, একমাত্র পথই হলো তাই, ও ছাড়া অন্য পথ নেই। ওর পরে হলো পাঁচটি মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধির পর্যায়

ঐকান্তিকতা বা স্বচ্ছতা
বিশ্বাস বা আস্থা
ভক্তি বা কৃতজ্ঞতা
আস্পৃহা বা অদম্য সাহস
সহিষ্ণুতা বা অধ্যবসায়।

এই সহিষ্ণুতা আরো একরকম হয়, যার নাম নিষ্ঠা। একটা সংকল্প নিয়ে অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে সেটিকে বজায় রাখা, এও সহিষ্ণুতা। নিষ্ঠার সঙ্গে ওতেই লেগে থাকলে একটা সময় আসবে যখন সার্থক জয়লাভ সুনিশ্চিত।

সনির্বন্ধ নিষ্ঠা যার আছে, বিজয়মালা তারই প্রাপ্য।

* * *

(২)

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন (The Synthesis of Yoga—Chap III) "প্রাণের প্রবৃত্তিকে দমন করার প্রণালী কেবল মনের জোর দিয়ে নয়, এখানে দরকার অনন্ত আত্মার সুদৃঢ় অটলতা,"—এ কথার আসল মানে কি?

উত্তর এর মানে দিনের আলোর মতো সোজা। মৃত্যুহীন যে আত্মা তারই অবিচল শক্তি এখানে প্রকৃত কাজ করবে, বাকী সব কিছুই অবান্তর। অর্থাৎ আত্মা যখন জানবে যে বাস্তবিকই সে অনন্ত, তখন সে দৃঢ়তায় আপনিই অটল থাকবে।

তার কারণ এই হলো বাস্তব সত্য। আত্মা যখন নিজের অনন্তত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, তখনই সে আপন পূর্ণশক্তিতে অটল হতে পারে। সেই অটলতা মানে জড়তার কিংবা অক্ষমতার অনড়তা নয়, সে এক অকম্প অবিচলতা যা হবে সকল কর্মের ভিত্তিস্বরূপ। তখন যা কিছু তুমি করবে তা হবে তোমার আপন অনন্ত আত্মার শক্তিলব্ধ দৃঢ় অটলতার ভিত্তিতে।

কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে তোমায় তা বোঝানো যাবে না এখানে নিজের উপলব্ধি চাই।

সকল ক্ষেত্রে ঐ একই কথা। আমাদের এই বাধাটা, যার বাধার মধ্যে এই ক্ষুদ্র বস্তিকটা আসলে কিছুই বোঝে না। কিন্তু যখন উপলব্ধি আসে তখন আপনা হতেই সব কথা বুঝতে পারো, তার আগে নয়। কতকটা কল্পনাশক্তি তোমার থাকতে পারে, কিন্তু তাতে প্রকৃত বোধ আসে না। বোধ আনতে হলে নিজে তার মধ্যে ঢুকে তারই মধ্যে বাস করতে হবে। আত্মার অনন্তত্ব সম্বন্ধে যখন তোমার চেতনা আসবে, তখন তার এই সুদৃঢ় অটলতার রহস্যটাও তুমি সহজে বুঝে নেবে। নতুবা তা মুখের কথায় বললে কেবল বলাই সার হবে।

কিন্তু অটলতার সঙ্গে আবার দৃঢ়তার কথা কেন বলা হয়েছে, তা হয়তো তোমরা বুঝতে পারোনি। এতে তোমাদের মনে গণ্ডগোল বাধছে তো? আমি তোমাদের বলি শোনো, অটলতার মধ্যেই রয়েছে সব চেয়ে প্রচণ্ড শক্তি। তাই হলো সকল শক্তির উপরকার শক্তি।

সামান্য একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে বলি। কেউ যদি এসে তোমাকে অপমান করে কিংবা কোনো বিশ্রী রকমের কটু কথা বলে, আর তুমি যদি তাতে রাগ কিংবা বিদ্বেষে

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠো, তাহলে চিত্তদৌর্বল্যে অনুক্ষত হয়ে তুমি তখন নির্বোধের মতো অনেক যা তা কাণ্ড করে বসবে। কিন্তু তার বদলে যদি তুমি আত্মস্থ হয়ে সম্পূর্ণ অবিচল থাকতে পারো, মাথা ঠাণ্ডা রেখে যদি এমন অটলতা অবলম্বন করতে পারো যাতে ওর কোনো আঘাতই গায়ে না লেগে সমস্ত আক্রমণ প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যায়, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে যে সেই অটলতা থেকে এমন শক্তি তোমার মধ্যে এসেছে যার জোরে কোনো কিছুই তোমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। আর তুমি যদি সর্বদাই এমনি ধীর স্থির ও শান্ত হয়ে থাকতে পারো, এমন কি দৈহিক ক্রিয়াতেও নিরুদ্বিগ্ন ও অচঞ্চল থাকো, ভিতরে বাইরে যদি এমন আত্মস্থ হও যে বাইরের কোনো ধাক্কা ভিতরে কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়ার স্পন্দন না তোলে, তাহলে দেখবে যে তোমার সেই অটল দৃঢ়তার শক্তি প্রভাব কেবল নিজের উপরেই নয় কিন্তু অন্যেদের উপরেও যথেষ্ট কাজ করছে।

এতেই বুঝবে যে অটলতার তেজ কতখানি। আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে এ খুব বড়ো জিনিস নয়, কিন্তু বাইরের বাস্তব জীবনের পক্ষে খুবই বড়ো কথা। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে এর ফল হাতেহাতেই প্রত্যক্ষ করবে।

মনের অটলতা, ইন্দ্রিয়ের অটলতা, দেহের অটলতা, এর প্রচণ্ড শক্তি। যদি নিরেট গাঁথা দেয়ালের মতো একেবারে নিথর হয়ে থাকতে পারো, তবে যে-কেউ তোমাকে আঘাত দিতে আসবে, তার সেই আঘাত প্রতিহত হয়ে ফিরে তার নিজেরই উপর গিয়ে পড়বে, আর তা অবিলম্বেই ঘটবে। এমন কি হত্যাকারীর হাতও এইভাবে নিরস্ত হতে পারে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁপতে শুরু করে বাইরে দেখাতে থাকলে যে তুমি অটল, এমন হলে চলবে না। তেমন অটলতার কোনো দাম নেই, আমি বলছি ভিতরে বাইরে পূর্ণ অটলতার কথা।

* * *

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ যে অন্তরস্থ সমতার কথা বলেছেন, এ কি সেই জিনিস?

উত্তর : অন্তরের সমতা হলো পন্থা, ওর উপায় স্বরূপ। সেটা লক্ষ্যও হতে পারে, কিন্তু চরম লক্ষ্য তাই নয়।

আগেই বলেছি, অনেকের ধারণা যা-কিছু ঘটছে সমস্তই ভগবৎ-ইচ্ছার বিকাশ। জগৎ যেমন অবস্থায় রয়েছে, জগতে যা-কিছু অবস্থিত রয়েছে, সমস্তই হয়েছে ভগবৎ-ইচ্ছার ক্রিয়াতে। তাই তারা বলে, সব চেয়ে সুবুদ্ধির কাজ হবে বিনা ওজরে ও বিনা প্রতিবাদে যা দেখছি তা সবই মেনে নেওয়া, সব-কিছু ভগবানের ইচ্ছাতেই ঘটছে বলে সমস্তকেই নত-মস্তকে নির্বিবাদে গ্রহণ করছি। এর থেকেই আসে সমতা।

এ ভাবটি যদি তোমার থাকে অন্তরের মধ্যে আপনিই সমতা আসবে। কিন্তু এর বিপরীত দিকের কথাকেও কর্তব্যের মধ্যে এনে উভয় দিকের একটা সমন্বয় যদি না করো,

তাহলে নিকর্মা হয়ে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া জীবনে কিছুই তোমার করণীয় থাকে না। অন্তত জগৎ-প্রগতির দিক দিয়ে কিছুই তুমি প্রয়াস করতে যাও না।

বহু বছর আগে আমি আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা একখানি বই পড়েছিলাম, তাঁর বুদ্ধি সকল দিক দিয়েই ছিল প্রখর। যতদূর মনে হয় সেই বইখানি ছিল "জেরোম কোয়ানার" (Jerome Coignard) সম্বন্ধে। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, মানুষ যদি তাদের জীবনের আরো উন্নতি আনবার জন্য এতখানি ব্যগ্রতা না করে, তাহলে তারা বেশ স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারে। নিজেদের ও পৃথিবীর আরো বেশী উন্নতি করতে হবে, উন্নতি কিছু ঘটাতেই হবে, আমাদের এই দুরন্ত কামনা থেকেই যত কিছু বিড়ম্বনার সূত্রপাত। আমিও তাই তোমাদের বলছিলাম, যদিও অন্যরকম ভাবে, সুখে শান্তিতে যদি থাকতে চাও, অন্তরে সন্তোষ ও সমতা নিয়ে যদি থাকতে চাও, তাহলে এটা দৃঢ়বিশ্বাস করতে হবে যে, জগতে যা হচ্ছে তা ঠিকই হচ্ছে, যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমনই হচ্ছে। যদি ধর্মের দিকে মতি থাকে তাহলে বলবে, "সবই হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছায়, অতএব যখন যা হচ্ছে তা ভালোর জন্যই হচ্ছে"। আমাদের পক্ষে একমাত্র করণীয় হলো শান্ত হয়ে থাকা, কারণ অশান্ত হয়ে বৃথা ছুটে বেড়ানোর চেয়ে তা অনেক ভালো। আনাতোল ফ্রাঁস এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন, যদিও তা ঘুরিয়ে বলেছেন জীবনটা খুবই সুখের ও সহনীয় ও উপভোগ্য হতে পারে, মানুষ যদি একে অন্যরকম জিনিস করে তুলতে নিজেদের মাথা না ঘামায়। যে মুহূর্তে তারা অসন্তোষের বীজ বপন করল, সেই মুহূর্ত থেকে কেউ আর জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট রইলনা।

সবাই যদি অনুকূল মনে এমন কথা বলতে পারে—জগতে যখন যেমন হওয়া দরকার তাই হচ্ছে মরা দরকার বলেই মরতে হয়, রোগ হওয়া দরকার থাকে বলেই রোগ হয়, বিচ্ছেদ হওয়া দরকার ছিল বলেই প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় ইত্যাদি, তেমনি আবার দরিদ্র হওয়া দরকার ছিল বলেই আমি দরিদ্র হয়েছি —এমনি সকল বিষয়েই ঐ কথা—সুতরাং তাই নিয়ে বিলাপ করেও লাভ নেই আর বিদ্রোহ করেও লাভ নেই, তা করতে যাওয়া আমাদের নিছক বোকামি। তখনই প্রকৃত দুঃখভোগ শুরু হয় যখন আপন বর্তমান অবস্থাটি বদলাতে ইচ্ছা করে তার জন্য নানারূপ ব্যগ্র প্রচেষ্টা করতে থাকো। রোগে ভুগতে হলেও তাকে কি নির্বিবাদে মেনে নেওয়া যায় না? যদি তখন বলতে পারো, "ঠিক আছে, ভগবানের ইচ্ছায় যখন রোগ হয়েছে তখন তাই আমি মেনে নিচ্ছি", তাহলে ততখানি বেশী কাতর হতে হয় না, যতখানি হয় রোগকে অসহ্য মনে করে তার উপর বিরূপ হয়ে উঠলে। ঐরূপ যদি আপন মনে বলো, তাহলে অন্ততপক্ষে তুমি কতকটা শান্ত হয়ে থাকতে পারো, তাতে আরোগ্যের পক্ষেও অনেক সুবিধা হয়। অপরপক্ষে যাকে দরিদ্র হতে হয়েছে সে ধনী হতেই বা চাইবে কেন, যে সন্তানহারা হয়েছে বা যার প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটেছে সে তার বিরোধিতাই বা করতে চাইবে কেন? যখন যেমন ঘটছে তাকে যদি নির্বিবাদে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে প্রত্যেকেরই সুখী হতে কোনো বাধা থাকে না।

এ হলো এক দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু অপরপক্ষে এমনও হতে পারে যে তুমি যেমন ভাবছ ভগবানের তেমন ইচ্ছাই নয়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী আনা অনেকটা যেন তোমাদের জানিত সেই পুরানো গল্পের মতো : হাতি আসছে দেখেও ব্রাহ্মণ রাস্তার মাঝখান থেকে সরতে চাইলে না, বললে "না, আমার মধ্যে যিনি ভগবান রয়েছেন তিনি আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই বলছেন।" তখন মাহুত বললে, "কিন্তু আমার মধ্যেও ভগবান আছেন, তিনি বলছেন তুমি পথ থেকে সরে যাও।"

তাহলে আনাতোল ফ্রাঁসের ও কথার পাল্টা জবাব এই হবে যে, মানুষের চেয়েও উপরের যে ইচ্ছা সেই চাইছে উন্নতি, সেই চাইছে পরিবর্তন। তার তাগিদ মানুষকে মানতেই হয়, পরিবর্তনের দিকে তাকে এগিয়ে যেতেই হয়।

* * *

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন (The Synthesis of Yoga—Ch. III) "কর্মের পথে ক্রিয়াসক্তি হলো গ্রন্থি, সে গ্রন্থিকে আগে মোচন করা চাই।" কিন্তু ক্রিয়া কেন গ্রন্থি হবে?

উত্তর : যেহেতু সেখানে রয়েছে তোমার আসক্তি।

ও গ্রন্থি আসলে অহমিকার গ্রন্থি। তুমি ক্রিয়া করো আপন কামনার তাগিদে, তাকে বলো তোমার প্রয়োজন, কর্তব্য, অথবা আরো কিছু তার অন্য নাম দাও—কিন্তু ঐখানেই গ্রন্থি। সেখানে রয়েছে কামনা, তাকে মোচানো চাই।

অথচ কাউকে যদি বলা হয়, "কর্ম করো ফল সম্বন্ধে নিরাসক্ত হয়ে, এই চেতনা নিজের মধ্যে আনো যে কর্ম তুমি করছ না, ভগবান করছেন," তাহলে শতকরা ষাড়ে নিরানব্বই জায়গাতে জবাব এই শুনবে, "অমন কথা যদি বাস্তবিক মনে করি তাহলে আর আমার হাত পা চলবে না, কোনো কাজই আমার দ্বারা হবে না।" অর্থাৎ সকলেই কাজ করে ঐ প্রয়োজনবোধ থেকে, ঐ ব্যক্তিগত কামনা ও তারই প্রেরণা থেকে।

সেইজন্যই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে গীতার নির্দেশ উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই দরকার, কর্মের সঙ্গে কামনার যে গ্রন্থি লেগে আছে সেটিকে খুলে দেওয়া। একরকম আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া আছে যার দ্বারা তা করা যায়, তাতেই এখানে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে সক্ষম হলে তখন দেখবে যে বিন্দুমাত্র স্বার্থঘটিত উদ্দেশ্য না নিয়েই তুমি সব কাজ করে যাচ্ছো, তোমার আপন অহংশক্তির চেয়েও উচ্চতর ও প্রবলতর এক শক্তি তোমাকে দিয়ে তা করাচ্ছে। আর যে কাজই তুমি করছ তার কোনো ফলাফল তোমার নিজের উপর এসে বর্শাচ্ছে না।

চেতনার ভিতরকার এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং তা পরোপুরি বাস্তব। সাধারণত জীবনে তুমি ভালো বা মন্দ বা মামুলী যা কিছুই করো তার ফলাফলের পরম্পরা তোমাতেই

এসে বর্তায়। আর কোনো কিছু ফল পাবার জন্যই তুমি তা করে থাকো। প্রত্যেক কাজের ফল তো একটা আছেই, যেমন ধরো, আমার এই হাতখানা যদি এই মাইক যন্ত্রটার উপর একবার রাখি, অমনি তখনই একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে।

কিন্তু কামনার গ্রন্থি খুলে দিয়ে যদি উচ্চতর শক্তিকে তোমার মধ্যে কাজ করতে দাও আর কেবল তার দ্বারাই চালিত হতে থাকো, তবে তোমার কাজের ফল যথারীতি হতে থাকলেও তা আর তোমাতে বর্তাবে না, কারণ তুমি কর্মকারক হলেও উচ্চশক্তিই সেখানে উদ্‌যোক্তা ও কর্মকর্তা। কাজেই ফলও সেখানেই গিয়ে পৌঁছবে, কিংবা তারই দ্বারা রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। তুমি নিজে পুরোপুরি মুক্ত বোধ করবে।

কর্মের এই ফলমুক্তির অনুভূতি প্রথমে আসে ক্ষণিক বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো, তখনই এসে তখনই মিলিয়ে যায়। কেবল রূপান্তরের জন্য যখন তুমি প্রস্তুত হয়ে উঠবে তখনই সেটা স্থায়ী হতে পারবে। কিন্তু ক্বচিৎ এমনও হয় যে কেউ কেউ তাদের জীবনে মাত্র কিছু সময়ের জন্য এই অনুভূতি পেয়ে থাকে, তারপর সেটা সরে গিয়ে বারান্তরে তেমন অবস্থা আর না ঘটলেও স্মৃতিটা তার থেকে যায়। সেই অতীত স্মৃতি নিয়েই তারা তার বিদ্যা নকল করতে থাকে। আর যদি বেশ গুছিয়ে সেই ভাবটি মুখে ব্যক্ত করতে জানে, তাহলে শিষ্যদের কাছে এরূপ মর্মে বোঝাতে থাকে, "কামনার গ্রন্থি খুলে গেলে যখন ভগবানই তোমার মাধ্যমে সব কিছু করবেন, তখন সে কর্মের নৈতিক বা অন্য কোনো দায়িত্বই তোমার থাকবে না। তখন তুমি সেই সুযোগে যা খুশি তাই করতে পারো, এমন কি প্রতিবেশীকে হত্যা, নারী-ধর্ষণ, সবই চলবে, ভগবানের তাতে হাত আছে বলে তার কোনো ফলাফল তোমাতে বর্তাবে না।"

নিজেরাও তারা তাই করে, আর অন্যায় অত্যাচারগুলোকে সেই অতীত অনুভূতির দোহাই দিয়ে ঢাকে। তোমাদের কাছে তা বলছি এই কারণে, যাতে ঐ ধরনের ভণ্ড ও নকল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তোমরা সতর্ক হতে পারো।

অমন কাজের শেষ পর্যন্ত যা ফল হয় তা খুবই সোজা কথা, তাদের মিথ্যাচারের প্রতিফল পেতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

ঐ ধরনের এক সন্ন্যাসীর কথা আমি নিজেই জানি। কোনো ব্যক্তি তার শিষ্যত্ব স্বীকার না করায় তার উপর সন্ন্যাসীর খুবই রাগ হয়—যদিও এতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে গুরু হবার সে উপযুক্ত ছিল না। তথাপি সে বিশেষ একরকম ক্ষমতার অধিকারী ছিল, সেই ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সে এমন ক্রিয়া করে বসলো যার উদ্দেশ্য ঐ অনিচ্ছুক লোকটির জীবননাশ। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে লোকটি স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয় পেয়েছিল। তাতে শেষ পর্যন্ত এই হলো যে সন্ন্যাসীর নিজের ক্ষমতার ক্রিয়া ফিরে গিয়ে তাকেই প্রত্যাঘাত করলে, তাতে তারই জীবননাশ হলো। সেই শক্তির সত্তাকে তার যথাস্থানে ফিরে পাঠানো ছাড়া কিছুই করবার দরকার হলো না।

এ গল্পের তাৎপর্য কেবল এই যে, তুমি যা হতে চাও তার ভান করতে যেও না, বাস্তবিক তাই হতে হবে। নিজের ভিতরকার কোনো কামনাকে সূক্ষ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে ঢাকতে যেও না, তোমায় পুরোপুরি ঐকান্তিক হতে হবে।

এমন অনেককে দেখতে পাই যারা মুখে বলে তারা মুক্ত আর অন্তরে পূর্ণ সমতাপ্রাপ্ত, প্রত্যেক কাজেই তারা নিজেদের কামনার কথা বাদ দিয়ে আওড়াতে থাকে,"সকলই তাঁর ইচ্ছা," কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ইচ্ছা তাদের নিজেরই, মুখে যা বলছে কাজে তা আদৌ নয়। তারা অলস ও নিরুদ্যম হয়ে থাকে, প্রকৃতির তাকে রূপান্তর আনতে চায় না, আপন প্রকৃতিকে না বদ্‌লে একইভাবে রেখে দেয়।

* * *

প্রশ্ন এরাও কি প্রকৃত কোনো শক্তির অধিকারী হয়?

উত্তর হাঁ, কারো কারো প্রচুর শক্তি থাকে। কিন্তু তা প্রাণময় শক্তি, প্রাণরাজ্যের সত্তাদের কাছে পাওয়া। শক্তি অনেক রকমই হতে পারে। কিন্তু আসল ভাগবতী শক্তির কাছে কোনোটাই দাঁড়াতে পারে না। তবে সাধারণ মানুষদের উপর ঐ সব শক্তির কার্যকারিতা খুব বেশী।

* * *

প্রশ্ন তাহলে এই সব লোকেরা সেই শক্তির দ্বারা অনেক অনিষ্টও তো করতে পারে?

উত্তর খুবই পারে। শুধু পারে নয়, বাস্তবিক তা করেও থাকে অনেক সময়। যারা ঐ সব তথাকথিত সন্ন্যাসীদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে, তাদের নিগ্রহ ও দুর্গতির সীমা থাকেনা (আমি বলছি বাইরে গৈরিকধারী ও ভিতরে অহংকামনায় ভরা মিথ্যা সন্ন্যাসীদের কথা, প্রকৃত ভগবৎসমর্পিত শুদ্ধহৃদয় সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে নয়)। এমন লোকেরা এ রাস্তায় দীক্ষিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রাণরাজ্যের শক্তি এসে এদের উপর ভর করে, সেটাই হয় বিপদের কথা। সর্বদা না হলেও প্রায়ই এমন হয়।

সবার চেয়ে দুর্লভ জিনিস হলো ঐকান্তিকতা। একেই সর্বাপেক্ষা দামী জিনিস বলে জানবে, যেখানে এর সাক্ষাৎ মিলবে সেখানেই এর কাছে মাথা নত করবে। আমরা ঐকান্তিকতা তাকেই বলি যার মধ্যে আছে পূর্ণ সততা ও স্বচ্ছতা ও খাঁটিত্ব; এই ঐকান্তিকতাই খাঁটি হওয়া চাই, তার মধ্যে কিছুমাত্র যেন মেকি ভান বা লুকোচুরি না থাকে, যা বাস্তবিক নেই তাই নিয়ে মিথ্যা ভণ্ডামি না থাকে।

* * *

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলেছেন (The Synthesis of Yoga—Ch. IV) এই সব আভ্যন্তরীণ শত্রুকে নির্মমভাবে নির্মূল করা চাই, যদিও তাড়াতে গেলেই সাধকের চেতনার উপর তারা বেদনার কালো ছায়া দিয়ে নিত্য ঘিরে ফেলতে থাকে,"—এখানে কোন রকম চেতনার কথা বলা হচ্ছে ?

উত্তর : তেমন বেদনা কি তোমরা নিজে কখনো পাওনি ? এমন কোনো জিনিসের স্পন্দন-প্রবাহ তোমার নিজের মধ্যে এসে ঢুকল যা তুমি পছন্দ করছ না, যেমন ধরো তোমার মধ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ দেখা দিল কিংবা একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ কিংবা কপট মনোভাব, আর তুমি সেটাকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাইলে, তাকে তাড়াবার জন্য এমনভাবে চেষ্টা করতে থাকলে যাতে তেমন জিনিস কখনই আর তোমার মধ্যে না ঢোকে, তখন সে অবস্থায় তোমার অন্তরের মধ্যে একটা বেদনা টন্ টন্ করে ওঠে কিনা ? নিশ্চয় তখন একটা যন্ত্রণা হতে থাকে, ভিতর থেকে কোনো জিনিসকে টেনে উপড়ে ফেলতে গেলে যেমন ব্যথা লাগে। শ্রীঅরবিন্দ এরই কথা বলেছেন। নিজের ভিতর থেকে ঐসব মন্দ জিনিসকে দূর করতে চাইলেই তা অমনি করে নাড়ি ছুঁড়তে থাকে।

তোমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে বেদনা জিনিসটা বুঝি নিজেরই ভিতরকার কিছু। কিন্তু তা ঠিক নয়, বেদনা এসে আরোপিত হয় তোমার উপর। তোমরা দেখবে, হয়ত একই জিনিস যা একসময় যথেষ্ট বেদনা দিয়েছে, তা অন্যসময় আদৌ বেদনা দিচ্ছে না, সেই জিনিসই বেদনার বদলে বরং তখন অপার আনন্দ দিচ্ছে। অথচ নিমিত্তটা সেই একই, ঘটনাবলী সেই একই। তফাৎ কেবল এই যে একটা অবস্থাতে কোনো বিরোধী শক্তি এসে তোমার মধ্যে ঢুকেছে আর তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করছ, কিন্তু অন্যরকম অবস্থাতে তুমি তার থেকে এতই তফাতে রয়েছ যে তখন সে তোমার নাগালই পাচ্ছে না। কাজেই তখন তুমি সেই বিজাতীয় শত্রুর নেতিবাচক প্রভাবে ক্লিষ্ট হওয়ার বদলে ভগবানের ইতিবাচক প্রভাবই তোমার চেতনার অনুভবের মধ্যে আসছে ; ভগবৎ-কৃপা তো উপস্থিত আছেই, সেই তোমাকে আরো অগ্রসর করিয়ে দিচ্ছে, তাতেই সঙ্গে সঙ্গে তুমি তার দিব্যানন্দও বোধ করতে পারছ। এমন অবশ্য সাধারণপক্ষে হয় না, যেহেতু ঐ কৃপার সঙ্গে একাত্ম না হয়ে তোমরা অবাঞ্ছিত আদিব্য শক্তির সঙ্গেই একাত্ম হয়ে থাকো, তারই ভাবে ভাবিত হয়ে পড়ার কষ্ট দুঃখ পেতে থাকো।

একটু সচেতন হয়ে লক্ষ্য করলেই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সহজে মিলবে। নিজের কোনো দুর্বলতা বা বিকৃতিকে ভিতর থেকে টেনে বের করে দেখতে চেষ্টা করো, তাহলেই হবে। তার সঙ্গে নিজেকে যেমনি কিছুমাত্র একাত্ম বোধ করতে থাকবে অমনি ঐরূপ শিকড় উপড়ানোর মতো ব্যথা বোধ করবে ; কিন্তু ওর পরিবর্তে যদি ভগবৎশক্তির সঙ্গে একাত্ম হও, তাহলে তখন পেতে থাকবে তাঁর কৃপার আনন্দ, আর উন্নতি হচ্ছে দেখে পরম পুলকিত হয়ে উঠবে।

অর্থাৎ নিম্নশক্তির সঙ্গে একাত্ম হলেই দুঃখ, উচ্চশক্তির সঙ্গে একাত্ম হলেই সুখ। এ সুখ মানে ভোগসুখের কথা বলছি না। মনে সুখ অনুভব করে যখন তুমি লাফিয়ে কিংবা নেচে বেড়াচ্ছ, অস্থির হয়ে কলরবে মুখর হচ্ছ, তখন যে তুমি দিব্যের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তা করছ এমন কোনো কথা নেই। তা হতেও পারে, আবার তা নাও হতে পারে। সে জিনিসের কথা বলছি না, এখানে বলছি আসল দিব্যানন্দের কথা, অনিম্ন আভ্যন্তরীণ হর্ষের কথা।

যতবারই দেখবে ভিতরে কোনো ছায়া পড়ছে, সতর্ক হয়ে বলবে, "এ আমার শত্রু।"

শত্রু আছে সকল স্তরেই, ছোটো ব্যাপার থেকে বড়ো ব্যাপারে পর্যন্ত, সামান্য অস্বস্তি থেকে অসহ্য বেদনাতে পর্যন্ত ; এ সব শত্রুরই কাজ।

* * *

প্রশ্ন : এখানে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন (The Synthesis of Yoga Ch. V), "কর্মের যদি স্তরভেদ করতে হয়, তবে যেগুলি মূল কেন্দ্রস্থ পূত বহ্নিশিখার সর্বাপেক্ষা নিকটের, তার সঙ্গে তফাৎ করতে হবে যেগুলি তার থেকে অনেক দূরবর্তী হওয়াতে সেই বহ্নির আভাতে খুব কমই আলোকিত . অথবা যে সকল সমিধ অগ্নিস্পর্শ মাত্রই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, তার সঙ্গে তফাৎ করতে হবে যত ভিজে ও ভারী রকমের গুঁড়িকাঠকে, একত্রে চাপিয়ে অনেকগুলি জড়ো করা হলেও যার মধ্যে আগুন জ্বলতে পারে না।" এ উপমার যে অর্থ তা আমাদের জীবনের মনস্তত্ত্বে কোনখানে খাটে ?

উত্তর বোধ করি প্রত্যেকের বেলাতেই তা স্বতন্ত্র। প্রত্যেককেই নিজের দিক থেকে দেখতে হবে যে কোন কাজে তার আত্মপ্রদা এবং তার চেতনা ও গভীরতর জ্ঞান উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, আর কোন কাজ যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়ে কেবল পার্থিব সম্পর্কেই বেড়ে উঠতে থাকে। এর কোনো সাধারণ নিয়ম করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে কাজের কোনো নিজস্ব গুরুত্ব নেই, যে ভাবে তা সম্পন্ন করা হয় তারই গুরুত্ব।

অতি তুচ্ছ একটা পার্থিব কাজ, যেমন ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা, এতেও গভীরতর চেতনা জেগে উঠতে পারে, যদি তা পূর্ণ শ্রদ্ধা ও উন্নয়নের মনোভাব নিয়ে করা যায় ; অপরপক্ষে রীতিমত উচ্চস্তরের কাজ, যেমন অধ্যয়ন কিংবা সাহিত্য-রচনা কিংবা ললিত কলা সৃষ্টি, তাও যদি করা হয় যশ বা আত্মবিনোদনের জন্য কিংবা কিছু লাভের আশায়, তাহলে তেমন দামী কাজেও আভ্যন্তরীণ উন্নতি কিছুমাত্র হবে না। অতএব কর্মের স্তরভেদ তার বাহ্য বিচারের উপর নির্ভর করে না, বিশেষ করে তা নির্ভর করে ভিতরকার মনোভাবের উপর, আর সকল বিষয়েই এ কথা প্রযোজ্য।

আর ঐ সকল লাভজনক কাজ যা করা হয় ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিয়ে, যেমন জীবিকার্জনের কাজ, তারই তুলনা হবে শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন স্তূপাকার ভিজে কাঠের গুঁড়ি তার সঙ্গে, আলানি অনেক হলেও তার ভিতর দিয়ে আগুন ভালো করে জ্বলবে না। কারণ তার সমস্তটাই ভিজে ও নিষ্প্রভ।

এখানে আমি আবার বলব সেই কথাই যা আগেও অনেকবার বলেছি। আমার বর্তমান পার্থিব অস্তিত্বের গোড়া থেকেই আমি এমন অনেক লোক দেখলাম, যারা মুখে বলে তাদের ভিতরকার আত্মা খুব বড়ো, গভীর সত্যের সন্ধানে তারা উন্মুখ হয়ে আছে, কেবল তাদের হাত পা বাঁধা বলেই এগোতে পারছে না, কারণ জীবিকার জন্য কর্মের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়ে কঠিন দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সর্বদা তাতেই তাদের লেগে থাকতে হচ্ছে, এমন কোনো সময় সুযোগ বা ফুরসৎ নেই যাতে বাহ্য কিংবা আভ্যন্তরীণ অন্য কোনো কাজে মন দিতে পারে। এই ধরনের কথা আমি অনেকের মুখে শুনেছি, আর দেখেছিও সেই সব গরিব বেচারাদের—অর্থের দিক দিয়ে তারা গরিব নয়, কিন্তু পার্থিব চাহিদার মারাত্মক নিগড়ে বাঁধা পড়েছে বলে নিতাই অক্ষম বোধ করছে, সেইজন্যই তাদের বলছি গরিব বেচারা।

যখন আমার বয়স খুব কম ছিল, তখন থেকেই আমি নিজের মনে সংকল্প এঁটে রেখেছিলাম যে সম্ভব হলে এমন একটি ছোটো জগৎ গড়ে তুলব—সে যত ছোটোই হোক—যেখানে খাওয়া পরা আর থাকার ভাবনা কাউকে ভাবতে হবে না, এই নিত্য প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে পাকা বন্দোবস্ত করা থাকলে সেদিকের চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে লোকে স্বচ্ছন্দে দিব্যজীবন লাভ ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি করার দিকে কতখানি অগ্রসর হতে পারে তাই আমি একবার দেখবো।

তারপর মধ্যবয়সে—অর্থাৎ এই জীবনের মাঝামাঝি সময়ে—তেমন সুযোগ আমার বাস্তবিকই মিলল। যেমন তখন সংকল্প করেছিলাম ঠিক সেইরকম ধরনের একটা জগৎই গড়ে তুলতে পারলাম। কিন্তু অতঃপর বাস্তবের ব্যাপার দেখে আমার এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ঐ তথাকথিত জরুরী প্রয়োজনগুলির চাপেই যে মানুষের আভ্যন্তরীণ বিকাশ বাধা পায়, তা নয়, সে বাধার আসল কারণ হলো ভীতস্পৃহা, শৈথিল্য, তামসিকতা, "যাকগে যাকগে" গোছের মনোভাব, যথাহ্যের মনোভাব। ওর চেয়ে বরং যাদের কঠোর জীবন ও যন্ত্রণের অবস্থা, তাদেরই মধ্যে কখনো কখনো ওর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তারই ভিতর থেকে তীব্র আত্মস্পৃহা জাগে।

আমার এই সিদ্ধান্ত যে ভুল, তা দেখতে পেলে আমি খুশি হবো, কিন্তু আজ পর্যন্ত তেমন দেখিনি। অন্ন আহরণের জন্য যখন কোনো চেষ্টা করতে হচ্ছে না, পরবার কাপড় আর মাথার আচ্ছাদনের জন্য কিছু ভাবতে হচ্ছে না, এগুলির সম্বন্ধে যখন নিশ্চিন্ত থাকা যায়, লোকের অনেকখানি কর্মশক্তি তখন অব্যবহারে নিষ্ক্রিয় থেকে যায়, সেটাকে তখন যত বাজে কাজে খরচ করা হয়। তার মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক জিনিস হলো জিভের অপব্যবহার।

কেবল বাজে আড্ডা জমানো আর খোশগল্প ও গুজব নিয়ে অনাবশ্যক বাক্যব্যয় করতে থাকা। তার মানে আর কিছুই নয়, অনিযুক্ত কর্মশক্তির অযৌক্তিক উচ্ছলন।

সেই কারণেই বলছি, কর্মের যেমন শ্রেণীবিভাগ তোমরা সাধারণত করে থাকো, তা বোধ হয় ঠিক নয়...

* * *

(৩)

প্রশ্ন : যোগ আর ধর্ম, এ দুইএর মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর : সে কি গো ছেলে, তার চেয়ে বলোনা কেন যে সিংহ আর কুকুর, এ দুইএর মধ্যে তফাৎ কি?

বলি শোনো। মনে করো কেউ হয়তো কারো কাছে শুনলো কিংবা নিজে নিজেই বোধ করতে লাগল যে ভগবান বলে কেউ একটা বা কিছু একটা আছে। এই কথাটি জানার পর থেকে সে সত্যসত্যই ভগবানকে খুঁজতে শুরু করে দিলে—আপন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা, সর্বক্ষণের সাধনার দ্বারা, যথার্থ একাগ্রতার দ্বারা সেই জিনিসকে জানতে এবং আয়ত্ত করতে চাইলে, আবিষ্কার করতে চাইলে যে তা কোন জিনিস, তার নাগাল তাকে পেতেই হবে, তার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে। একেই বলব যোগ, বলব যে অমুক লোকটি যোগ করছে।

কিন্তু আবার সেই লোকটি যদি যোগসিদ্ধির পরে তার নিজের প্রণালীগুলিকে একজোট করে একটা বাঁধা নিয়মের মধ্যে এনে দাঁড় করায়, যে রাস্তা সে আবিষ্কার করেছিল তাকেই একটা নিয়মানুবর্তিতায় প্রবর্তিত করে যদি সে বলে যে ভগবান হলো ঠিক এই রকমের জিনিস, আর তাকে আয়ত্ত করতে হলে তোমায় ঠিক এই এই কাজগুলি করতে হবে, অমুক অমুক প্রক্রিয়া আর অনুষ্ঠানগুলি পালন করতে হবে, আর বলতে হবে "আমি একেই একমাত্র সত্য জেনে আমার শিরোধার্য করলাম, এই পথই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ," আর এই কথাগুলি যদি শাস্ত্র হিসাবে লেখা হয়, তাকে বাঁধা বিধানে ও বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয়, তখন তাই হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম।

* * *

প্রশ্ন : ধর্মের ঐরূপ প্রণালী অনুসরণ করলে কি ভগবানের উপলব্ধি মেলে?

উত্তর : সে কথা স্বতন্ত্র, কারণ ভগবানের উপলব্ধি পেতেই যারা জন্মেছে, যাদের সেইরূপই নিয়তি যে ভগবৎ-চেতনা লাভ করে তার মধ্যেই অবস্থান করবে, তারা যেমন পথই অবলম্বন করুক, তাদের সেই নিয়তি আপনা হতেই ফলবে। ধর্মের পথ ধরেও অনেকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করে,—সেটা সেই ধর্মের গুণে নয়, ধর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও তাদের তা হয়ে থাকে,—আভ্যন্তরীণ আস্পৃহা ও ঐকান্তিকতার জোরে তারা সব কিছু প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়ে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়। সব কিছুই তাদের পক্ষে অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই সকল ব্যক্তিরাই যখন নিজেদের অনুভূতিকে ভাষায় ব্যক্ত করতে যায় তখন অনন্যোপায় হয়ে তাদের ধর্মের সেই পূর্বশ্রুত পুরাণো কথাগুলিই প্রয়োগ করতে হয়; তাতে তাদের অনুভূতিগুলি সীমাবদ্ধ আকার নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সাম্প্রদায়িক জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। অথচ তাদের নিজেদের বেলা উপলব্ধি আসার কোনো বাঁধা রাস্তা ছিল না, তার কোনো গণ্ডীও ছিল না বা রীতিপদ্ধতিও ছিল না, নির্দিষ্ট কোনো বিধি অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ সহজভাবেই তারা অকৃত্রিম অনুভূতি লাভ করেছিল।

* * *

প্রশ্ন বর্তমান জগতের অধিকাংশ লোকে কোনো না কোনো ধর্মপথ অনুসরণ করে থাকে, তাতে কি তাদের কোনো কাজ হয় না?

উত্তর : এখনকার দিনে অনেকেই হয়তো ধর্ম মানছে, কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বহুকাল যাবৎ লোকে ধর্মকে অস্বীকার করেছিল, অন্তত শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম মানেনি, কারণ তাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। কিন্তু কেবল ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে নিছক বাস্তব প্রত্যক্ষবাদ ছাড়াও লোকের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরেছে।

মানুষ একটা ধর্ম নেনে নেয় সামাজিক অভ্যাস অনুযায়ী, যাতে কেউ তোমায় খারাপ চোখে না দেখে। অনেক গ্রামাঞ্চলে দেখবে, সেখানে কোনো ধর্মানুষ্ঠানের উৎসবাদি হলে তাতে যদি তুমি যোগ না দাও তাহলে সেখানে তোমার পক্ষে বাস করা কঠিন হবে, সকলেই তোমার দিকে আঙুল দেখিয়ে নানারকম প্রতিকূল মন্তব্য করতে থাকবে। কিন্তু এ ব্যাপারের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আমি একটা গল্প বলি শোনো। প্রথম যেবার আমি ভারতে আসি, সেবার এসেছিলাম এক জাপানী জাহাজে। সেই জাহাজে দুই স্বতন্ত্র ক্রীশ্চান সম্প্রদায়ের দুজন পাদ্রী ছিলেন, একজন বোধহয় anglican, একজন presbyterian।

একদিন রবিবার এসে পড়াতে সেদিন জাহাজে এক ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো, সভ্য জাপানীদের মতো আমাদেরও অধার্মিক দেখায়। সেই কারণেই এই

রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন, কিন্তু পাদ্রী আছেন দুজন, তার মধ্যে কাকে পরিচালনার ভার দেওয়া হবে? এই নিয়ে প্রায় ঝগড়া বাধার মতো অবস্থা। শেষে একজন সরে দাঁড়ালেন, বোধহয় সেই anglican, তখন অপরজন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন।

জাহাজে সেলুনের হলঘরে বৈঠকটি বসেছিল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে সেখানে প্রবেশ করতে হয়। বিশেষ সাজপোষাক করে সকলেই গায়ে কোট চাপিয়ে এসেছে—যদিও সম্ভবত লোহিত সাগরে রয়েছি বলে আবহাওয়া খুবই গরম—তথাপি সকলেরই গায়ে ওয়েষ্ট-কোট, গলায় কলার আঁটা তার উপর নেকটাই নিপুণভাবে বাঁধা, পায়ে চামড়ার পুরো জুতো, মাথায় হ্যাট, আর প্রত্যেকের হাতে একখানি করে বই। গাড়ি বেঁধে ডেক থেকে নেমে সকলেই সেই হলঘরে জড়ো হলো। মেয়েরাও মাথায় হ্যাট চাপিয়েছে, কারো কারো সঙ্গে ছাতাও আছে, আর হাতে একখানি করে প্রার্থনা পুস্তক।

সেই গৃহগহ্বরের মধ্যে এতগুলি মানুষ গিয়ে ভিড় জমালে। পাদ্রী যথারীতি তাঁর বক্তৃতা দিলেন, অর্থাৎ কিছু উপদেশবাণী দিলেন, ধর্মভাব নিয়ে ভক্তিভরে সকলেই তা শুনলো। অনুষ্ঠান সমাধা হলে সকলেই আপন আপন কর্তব্য পালন করেছে এই ভঙ্গী নিয়ে প্রসন্নমুখে সিঁড়ির ধাপগুলি ভেঙে ডেকের উপর গিয়ে উঠল; অতঃপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জনে জনে বারে গিয়ে মদ্যপান করে ফূর্তির সঙ্গে তাস খেলতে শুরু করলে, অনতিপূর্বের সেই ধর্মানুষ্ঠানের কথাটা ভুলেই গেল। কর্তব্য করা হয়ে গেছে, সেখানেই সব ফুরিয়ে গেছে।

একসময় পাদ্রী আমার কাছে এসে খুব অমায়িকভাবে জিজ্ঞাসা করলে, অন্যান্য সকলের সঙ্গে আমি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিইনি কেন।

আমি বললাম—আমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু ধর্মে আমার বিশ্বাস নেই।

ও! তুমি তাহলে একজন জড়বাদী?

না, সে কথা একেবারেই নয়।

তবে তোমার ওখানে না যাবার কি কারণ?

সে কথা শুনলে হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন, আপনাকে না বলাই ভালো।

কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না, খুব জোর করতে থাকায় আমি অগত্যা বললাম: "শুনতে চাইছেন তাই বলছি, আমার মনে হয় যে আপনার মধ্যেও কোনো আন্তরিকতা নেই, আর আপনার ঐ শ্রোতার দলেরও তা নেই। আপনারা ওখানে জড়ো হয়েছিলেন প্রথা অনুসারে, সামাজিক একটা কর্তব্য করতে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নয়।"

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক! আমাদের তা সাধ্য নয়। আমরা শুধু ভালো ভালো উপদেশ কথার কিছু বাণী দিতে পারি।

আমি বললাম—সেই কারণেই আমি যাইনি। ওতে আমার আস্থা নেই।

তখন সে আমায় নানা রকমের প্রশ্ন করতে লাগল। শেষে প্রকাশ করল যে সে চলেছে চীন মুলুকে, সেখানকার অধিবাসিদের ধর্মশিক্ষা দিতে।

আমি খুব গম্ভীর হয়ে তাকে বললাম "একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের ধর্মের যখন মোটে জন্মই হয়নি—আপনাদের ধর্মের দু'হাজার বছরও পেরোনি—কিন্তু তার অনেক আগের থেকে চীনদেশের দর্শন খুব উঁচু স্তরে উঠেছিল, ভগবানের সন্ধান তারা জানতো। পাশ্চাত্ত্যের লোকদের তারা বর্বর বলে করে। যারা আপনাদের চেয়ে অনেক জ্ঞানী, তাদের আপনি ধর্মশিক্ষা দিতে যাচ্ছেন? কোন শিক্ষা দেবেন তাদের? কপটতা? উচ্চতর দার্শনিক চেতনাজাত অনাসক্তির বদলে তাদের কতকগুলো শূন্যগর্ভ অনুষ্ঠান শেখাতে যাচ্ছেন?"

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললে—"তোমার যুক্তি আমি মানতে পারছি না।"

আমি বললাম—"কিছু মানতে আপনাকে বলছি না, কেবল সত্য কথাটা জানিয়ে দিচ্ছি। বর্বর জাতের মানুষ হয়ে প্রাচীন সভ্য মানুষদের এমন জিনিস শেখাতে যাচ্ছেন যা তারা বহুকাল আগের থেকেই জানতো, এর কোনো অর্থ হয় না।"

কথাবার্তা এইখানেই সমাপ্ত হলো।

* * *

প্রশ্ন : সত্তা যেখানে মনোময়, সেখানে তার জড়দেহ ধারণের প্রয়োজন ছিল কেন?

উত্তর মানুষরাই মনোময় সত্তা, তাদের ভিতরকার ভগবৎ-উপস্থিতিকে নিজেদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আবিষ্কারের জন্য স্থূল দেহধারণের প্রয়োজন হয়েছিল।

কিন্তু কেন? মনে হতে পারে যে, এ কি এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। কিন্তু এর মধ্যে এটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এখানে জড়ের মধ্যে হয়েছে ভগবৎ-উপস্থিতি, তার থেকে হয়েছে চৈত্যসত্তার উৎপত্তি, এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা কেবল পার্থিব জীবনেই সম্ভব।

তোমাদের অনেক বারই এ কথা বলেছি, জ্যোতির্বিদ্যার দৃষ্টিতে দেখলে অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহে ভরা এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী যদিও অতি সামান্য ও নগণ্য একটি গ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু নিখিল বিশ্বের বিশেষ এক প্রতীক স্বরূপেই এর সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে এখানেই ভগবানের রূপান্তর আনার ও দিব্য পরিণতি আনার কাজ কেন্দ্রীভূত ভাবে প্রকাশ পেতে পারে।

সারা বিশ্বের মধ্যে এখানকার জড়গুলি যদিও সম্ভবত সর্বাপেক্ষা তমসাচ্ছন্ন ও নিশ্চেতন তবু ঐ কারণেই ভগবৎ-চেতনা অন্য কোনো স্থানের অপেক্ষা একেই বেছে নিয়ে তার মূল উৎস থেকে সরাসরি নেমে এসে এরই মধ্যে আকারগত হয়ে আছে। এখানে তাই দুটি অন্তিম প্রান্তের একত্রে মিল হয়েছে। পরমতম চেতনা এসে ছুঁয়েছে চরমতম নিশ্চেতনাকে, তাতে বিরাট বিশ্বের বিরাটতম বৃত্তরেখা সম্পূর্ণ হতে পারছে। সেই কারণে এই পার্থিব জগৎ ভগবৎ-ক্রিয়াসাফল্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুযোগের স্থল, আর এখানেই রয়েছে ভগবৎ-চেতনা বিকাশের সব চেয়ে ত্বরিত উপায়।

এ কথা এতই যথার্থ যে মহা মহা দেবাত্মারাও যখন অধিকতর রূপান্তর কিংবা ঘনিষ্ঠতর ভগবৎ-মিলন কামনা করেন, তখন তাঁদেরও এখানে এসে এখানকার জড়দেহ গ্রহণ করতে হয়, কারণ সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাই হলো সবিশেষ সুবিধার পন্থা ; সত্তারূপে থেকে তার বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন স্তর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে অবশেষে পরমাত্মার সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারার পরিবর্তে এতে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হতে পারে।

মানবদেহ গ্রহণ করে তার মধ্যে ভগবৎ-উপস্থিতি আবিষ্কার করতে পারা অনেক বেশী সহজ। এতে যেন সাপের মাথা ঘুরিয়ে সহজে তার লেজের শেষ প্রান্তটিকে কামড়ে ধরার মতো কাজ হয় ; ভগবানের সঙ্গে মিলবার জন্য তার নাগাল যদি পেতে চাও, তাহলে সমস্ত পথটা মাড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে ঐভাবে মাথা ঘুরিয়ে একেবারে লেজের নাগাল ধরাই সহজ, যাতে উপরের মাথাই শেষপ্রান্তকে কামড়ে ধরে।*

---

*Bulletin of S. A. I. C. E.—Vol XII, No 2. অনুবাদক—পতঞ্জলি ভট্টাচার্য

বাসবদত্তা

[অনুবাদ]

শ্রীঅরবিন্দ

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

বাসবদত্তার মহলে একটি কক্ষ।

বাসবদত্তা, মঞ্জুলিকা, অন্য।

বাসবদত্তা। দেখেছ তবি তাকে?

মঞ্জুলিকা। হাঁ।

বাসবদত্তা। বল তাহলে, লক্ষ্মীছাড়ী মৌনী,
বক বক করা তো তোমার সহজেই আসে।

মঞ্জুলিকা। ওগো, জাগ্রত লক্ষ্মী!
যেদিন ধরণীকে ধন্য করলে তোমার আবির্ভাবে
সে দিন থেকে সর্বদা ভাগ্য প্রসন্ন তোমার প্রতি,
এ ছাড়া আর বেশি কি বলব?
রূপ, অর্থ আর আনন্দ ভিড় করে আসে,
তোমার মহিমা উপচিত হয়ে চলে
প্রতিটি দিনে তোমার।
এখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজাকে
তোমার দাসরূপে এনে দেওয়া হয়েছে।

বাসবদত্তা। সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার সেটি মহা সৌভাগ্য,
আমার নয়।
কারণ এখন কিছুই
আর উপরে আমাকে তুলতে পারে না,

আমার পিতা যে শ্রেষ্ঠ রাজাদের অধিপতি।
এসব তুচ্ছ,
আসল যা জানতে চাই তা তুমি বলছ না।
কেমন সে দেখতে?

মঞ্জুলিকা। পঞ্চশর দেবতাকে দেখলাম
সোনার মানুষী মূর্তিতে।

বাসবদত্তা। (খুসীর হাসিতে) এত সুন্দর?

মঞ্জুলিকা। তুমি যত সুন্দর
আবার তার চেয়েও বেশী।

বাসবদত্তা। বেশি!

মঞ্জুলিকা। আর্তনাদ ক'রো না।
দেবতাদের মতো সস্মিত ও সমুন্নত তার দৃষ্টি,
তার স্বর বসন্তের চকিত আহ্বানের মতো।

বাসবদত্তা। আস্তবং প্রিয় সখি,
ধর তো এটি।

(মঞ্জুলিকার কণ্ঠে নিজের হার পরিয়ে দেওয়া)

মঞ্জুলিকা। ওতেই আমার আনন্দ;
তোমার উপহার রেখে দাও।

বাসবদত্তা। মনে করো ওই উপহার
আমার ভালোবাসা হয়ে আলিঙ্গন করেছে
তোমার কণ্ঠ।
সত্যিই তাহলে দেখেছ তুমি?
আমার মন ভুলাবার জন্য বলনি তো ওকথা?
সখি, তবে বল না যা দেখেছ সব;

সেবকের জন্যে আমার যে খুব মাথাব্যথা তা নয়,
তবে শুধু জানার ইচ্ছা।

বসুলিকা। (প্রবেশোদ্যত গোপালক ও বৎসকে দেখিয়ে)
চোখের তোমার আগ্রহ নাই বা থাকল,
তবু দেখ।

বাসবদত্তা। দাদা, অনেক দিন আমাকে ছেড়ে
দূরে ছিলে তুমি।

গোপালক। তোমার জন্যেই সে দূরে থাকা।
বোন, তোমার চরণে এনে দিয়েছি অনেক কিছু,
তবু মনে হয়নি আমার উপহারসমূহ
তোমার হাসির উপযুক্ত,—
এমন কি, জয় করে এখানে নিয়ে আসা
সৌরাষ্ট্রকন্যাও নয়,—
তবে এবার কিছু দিলাম বটে।
এই হল সেই প্রসিদ্ধ বৎস উদয়ন,
মহান কৌশাম্বীর রাজা,
আমি এনেছি একে তোমার সেবা করবে বলে
দাসরূপে, রাজভৃত্যরূপে, গায়ক বাদক ও আজ্ঞাবাহীরূপে।
তাকিয়ে দেখ,
উপযুক্ত কাজ করেছি কি না।

বাসবদত্তা। অনেক সমাদর পাবার উপযুক্ত, দাদা ;
তবে যত মূল্যের হোক
কোনো উপহারই আমাদের দানযোগ্য মনে করি না আমি,
তোমার স্নেহই তো
একে দিয়েছে এর মূল্য।

গোপালক। উভয়েরই জন্যে আমার ভালোবাসা।
আমার উপহার আমার কাছে মূল্যবান—

নিজের বাহুতে বন্দী করবার বহু আগে
আমার হৃদয় একে অধিকার করেছিল।
ভালোবেসো একে,
তাহলে বিগুণ ভালোবাসা হবে আমাকে।

বাসবদত্তা। (মুক্তির বৎসকে দেখে)
আমার দাস হলেও প্রিয় ও মহার্ঘ।

গোপালক। আমরা সকলেই কি তোমার দাস নই?
এই মহার্ঘ সমস্ত বিপুল পৃথিবী অতি তুচ্ছ
তোমার সমুচ্চ বাহুযুগ, তোমার মুখমা, তোমার সৌন্দর্য
তোমার অন্তরের মধুর কাছে—

বাসবদত্তা। সত্যিই কি তাই?

গোপালক। বোন, লক্ষ্মীর হৃদিসম্ভূত তুমি।
আমাদের নয়,
তোমারই মধ্যে তোমার ভাই আমরা অনুভব করি
আমাদের পিতৃদেবের সমুন্নত ভাগ্যতারকার পাদপীঠ,
তোমার কটিশোভার মেখলা হল বিজিত এই পৃথিবী।

বাসবদত্তা। দাদা, তা আমি জানি।

গোপালক। হ্যাঁ, মনে হয়
তুমি শিশুকাল থেকেই তা জানো—
অনায়াস প্রভুত্ব ছিল তোমার;
আর জেনেছই যখন একবার
তখন গ্রহণ কর সামন্তদের—
তোমার বাসগৃহের জন্যই কৌশাম্বী ও অযোধ্যা।

বাসবদত্তা। (বৎসের দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে অল্প তার দৃষ্টি এড়িয়ে)
এই দাস পেয়েছি যখন

তখন তারাও আমার হল।

গোপালক। না, শোনো আমার কথা, বোন ;
নিজস্ব করে নাও তাদের।
বৎস, তুমি সেবারত হও তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণীর
এবং পালন কর তাঁর আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

বাসবদত্তা। এ তো বালক, অপূর্ব স্বর্ণকান্তি বালক।
বয়সে আমি নিশ্চয় বড়ো।
এর সঙ্গে খেলা করা চলে।
কোনো ভয় আসছে না,
কোনো দ্বিধা জাগছে না।

(বৎসকে উদ্দেশ করে)

কী নাম তোমার ?
তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই।

বৎস। বৎস।

বাসবদত্তা। তুমি কাঁপছ, বৎসরাজ
ভয় করছে কি ?

বৎস। বোধ হয়,
অতিরিক্ত আনন্দের মধ্যেও আছে
এক ভয়।

বাসবদত্তা। (সহাস্যে) শুনলাম না তো।
আমার ভাই তোমাকে ভালোবাসেন খুব।
আশ্বস্ত হও।
আমাকে যদি নিষ্ঠাভরে সেবা করতে পার,
তোমার দুঃখের কোনো কারণ থাকবে না।
কৌশাম্বীর রাজা তুমি,—

বৎস। লোকে তাই বলে আমাকে ডাকে বটে।

বাসবদত্তা। আর এখন আমার দাস।

বৎস। আমার হৃদয় পুনরুক্তি করছে সেকথা।

বাসবদত্তা। (সহাস্যে) শুনতে পেলাম না তো।
কৌশাম্বীর রাজা,
আমার ক্রীতদাস,
কী করতে পার তুমি
আমার মনোরঞ্জনের জন্যে?

বৎস। শুনতে চান সেই সংগীত
যা সমাহিত দেবতাদের বিচলিত করে তোলে?
কিম্বা শুনতে চান মর্ত্যের বুকে স্বর্গের বীণাধ্বনি?
চান ভাগ্রত সত্যের অঙ্গরেখা ও রঙ্গরাগ
যার কাছে পৃথ্বীর প্রতিচ্ছায়া হয়ে যায় ম্লান?
কিম্বা অসীম অতলগভীর নৈঃশব্দ্য চান
হয়ে উঠুক সরব ও প্রমূর্ত?
নির্বাক হিমালয়ে
কিন্নরী, বিদ্যাধর ও গন্ধর্বরা সকলে ঘিরে এসে
আমার অন্তরের নীরব প্রসন্ন দেবতাকে
আমার জন্মমুহূর্তেই এসব দান করেছে,
আমার স্থূল মন চিন্তাসমর্থ হবার আগেই।
এসবই দিতে পারি আপনাকে।

বাসবদত্তা। বৎসরাজ, এ সমস্ত নিলাম আমি নিজের জন্যে
তোমার জীবনের যত আভরণ তুমি অঙ্গে ধরো,
তবুও যে তৃষ্ণা মেটে না।

বৎস। চান—এই পৃথিবী আপনাকে এনে দিই
আমার অপরাজেয় ধনুঃশক্তির বলে?

তাহলে যুদ্ধে প্রেরণ করুন আমাকে
পৃথিবী তো আপনারই।

বাসবদত্তা। নিলাম তবে পৃথিবী,
তৃষ্ণা তবু মিটল না।

বৎস। আপনিই বলুন
আপনার দাস কী করলে
আপনি খুশী হবেন।
বৎসের কাছ থেকে কী চান আপনি?

বাসবদত্তা। নিজেই কি তা জানি?
যা তোমার আছে
যা তুমি পাবো
যা তুমি হয়েছ
সেসবের একটুও বাকি না রেখে।

বৎস। সব আপনার।

বাসবদত্তা। আমি বলছি কথা,
শুনছিও,
অথচ জানি না কী বলছি
আর কী তুমি বলতে চাও।

বৎস। সেসবই গভীর জিনিস
চিন্তা যাদের ধরতে পারে না;
আমাদের অন্তরাত্মা
তাদের গোপন অর্থকে বাস্তবের আলিঙ্গনে বাঁধে।

বাসবদত্তা। (একটু অস্বস্তিকর নীরবতা, তার মধ্যে আত্ম-সংবরণের চেষ্টা)
জানি না কী করে
এই প্রসঙ্গে এসে পড়লাম।

এসব কথায় মন ও হৃদয় বিচলিত হয় ;
থাক এসব।

বৎস। বলা তো হয়েই গিয়েছে।

বাসবদত্তা। ওইখানেই ইতি হোক তাদের।
বৎসরাজ, ক্রীতদাস আমার,
তুমি অনেক জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ আমাকে,
দিতে চেয়েছ নানা অমূল্য বস্তু ;
আমি তোমার কাছে চাইব নগণ্য জিনিস,
অথচ কঠিন তা।
অম্বা, নক্তুলিকা ! এ আমার বন্দী,
নজরে রাখ একে ;
তোমরা এর রক্ষী।
যখন আমার প্রয়োজন হবে একে
তখন নিয়ে এসো।
বৎসরাজ, যাও তোমার কক্ষে।

(বৎস অভিবাদনের ভঙ্গি করল এবং পাদস্পর্শ করল বাসবদত্তার)

কী করছ ?
ওরকম করবার হুকুম নেই তোমার।

বৎস। (হাত গুটানো না তুলে)
এর হুকুম নেই ? কঠিন বটে।

বাসবদত্তা। (অস্বস্তিভরে) তুমি দুঃসাহসী ক্রীতদাস।

বৎস। আপনার পায়ের নীচে মাটি অন্ততঃ
হতে দিন আমাকে।

বাসবদত্তা। এই, একে নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে ;
যথেষ্ট দেখেছি একে।
অম্বা, দেখো তোমাকে যেন এ
উৎকোচে বশীভূত না করে,—
সাবধান !

অম্বা। উৎকোচ গ্রহণ করব
তোমার মর্যাদার জন্যে।
কোথায় রাখব একে?
চাঁদের আলো যখন সবুজ মাঠের উপর ঘুমায়
তখন যে ছাতে বেড়াও তুমি
তার কাছের মীনার একে রাখব কি?

বাসবদত্তা। হাঁ; ঐ হবে সবচেয়ে কাছে।

অম্বা। (বৎসের হাত ধরে) এসো।

(বৎসকে নিয়ে উজ্জয়ের প্রস্থান)

বাসবদত্তা। আমার ব্রত থেকে
একখানি হাসির কুহকে আমাকে বিচ্যুত করবে ও?
কী সুন্দর, কী সুন্দর ও!
ভয় করছে, আনন্দের ভয়।
কিন্তু ও আমার—
ওর চোখে রয়েছে আমার প্রভুত্বের স্বীকৃতি.
নিশ্চয় ওকে নিয়ে যেমন খুশী করব আমি।
ওকে আমার কাছ থেকে পাঠিয়ে দিলাম—
কারণ ওর কথায় খুশী হলেও
বড় বিব্রত লাগছিল।
না, কথায় নয়, ওর স্বরে আছে যাদু।
না গলার স্বরও নয়,
হাসিও নয়,
মুখ নয়, কুসুম-কোমল চোখও নয়,
আবার এসবই এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু।

(মাথা নেড়ে)

মনে হচ্ছে ব্যাপারটা শেষে কঠিন হয়ে উঠবে।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদের পার্শ্ববর্তী মীনাগার কক্ষ।
বৎস শয়ানে।

বৎস। যত তার কথা শুনেছি,
যত রকম তাকে স্বপ্নে দেখেছি,
তার মাধুর্য সেসব ছাড়িয়ে যায়
সে আমার।
আমার স্পর্শে শিহরিত হয়েছে;
তিনবার তার চোখ
আমার দৃষ্টিতে পড়ে বিহ্বল হয়েছে।

(চোখ বন্ধ করে উর্ধ্বমুখে সে শুয়ে পড়ল।
মঞ্জুলিকার প্রবেশ ও তাকে তাকিয়ে দেখা)

মঞ্জুলিকা। কনকোজ্জ্বল অনন্তদেব। তুমি এই পৃথিবীর নও।
এও বাসবদত্তার। সবই তার,—
যেমন আজ আমি
এবং একদিন হবে সমস্ত বিশ্ব।
বৎস, তাহলে ঘুমাওনি তুমি?

বৎস। নিঃসঙ্গ ঘুম আমার চোখে আর এক মূর্তি দেখে
অপেক্ষা করছে।

মঞ্জুলিকা। তুমি অবাধ্য।
তোমাকে কি তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়তে বলা হয়নি?

বৎস। ঘুম অবাধ্যতা করছে,
আমি নই।
কিন্তু তুমিও তো জেগে রয়েছ,
অথচ তোমার এমন চিন্তা নেই
যা তোমার চোখের দু'পাতা বুজতে দেয় না।

মঞ্জুলিকা। কী করে জানলে?
তোমার রক্ষী আমি,
আমাকে চারদিক ঘুরে পাহারা দিতে হয়।

বৎস। সুহাসিনী দেহরক্ষী, তোমার ঈর্ষা অহেতুক।
সোনার কারাগার থেকে
কে পালাতে চায়?
তোমার নাম মঞ্জুলিকা?
তোমার অঙ্গশ্রীও তেমনি—
মর্ত্যের যত লাবণ্যময় জিনিস দিয়ে তৈরী মহাকুরু।

মঞ্জুলিকা। আর এক নাম ছিল আমার—
তা আজ অনুচ্চারিত,
বিস্মৃত।

বৎস। তুমিই তাহলে সৌরাষ্ট্রকন্যা?

মঞ্জুলিকা। আমিই সেই মেঘাবৃত রাজকন্যা,
যেমন তুমি বন্দী কৌশাম্বীরাজ।
আমাকে গোপালক কন্যারত্ন করেছিল যুদ্ধে
তুচ্ছ উপহার হিসাবে দিয়েছিল
বাসবদত্তার হাতে।

বৎস। আমাদের দু'জনের ভাগ্য যখন এক
তখন মিত্র হব না আমরা?

মঞ্জুলিকা। কোন দুঃসাহসী উদ্দেশ্যে?

বৎস। জানলে কি করে যে উদ্দেশ্য একটা আমার আছেই?

মঞ্জুলিকা। যদি ছেলে ধরতাম।

বৎস। মুক্তি চাও তুমি?
সহায়তা করবে আমার?

মঞ্জুলিকা। যাকে আমি ভালোবাসি, সেবা করি
তার বিরুদ্ধে কোনো কিছুতে নয়।

বৎস। না, এমন ষড়যন্ত্রে
যাতে পরম সেবা হবে তার,
ভালোবাসা হবে তাকে—
সমগ্র আর্যাবর্তের রাণী করো তাকে।

মঞ্জুলিকা। আবার পারিশ্রমিক?

বৎস। সব যখন হবে আমাদের
তখন স্বমুখেই ব'লো তা।

মঞ্জুলিকা। রাজী খুব বিপুল হবে কিন্তু।

বৎস। যতই বিপুল হোক।

মঞ্জুলিকা। ভাগ্যের উপর প্রতিশোধ নেব এবার।
জানি তোমার অন্তর কী চায়
তোমার বাসনা তোমার চোখের ভিতরে অতি স্পষ্ট।
বৎস, সে তোমাকে ভালোবাসে
যেমন আধফোটা ফুলের কলি
প্রত্যূষের আবির্ভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে,
তারপর আধ-জাগ্রত স্বপ্নার মতো
চেয়ে দেখে সৌরকরোদ্ভাসন জগতের প্রথম সূচনা,
তেমনি।

বৎস। এই আশ্বাসবাণীর পরিবর্তে
নাও আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

মঞ্জুলিকা। লোভী আমি।
শুধু মাত্র কৃতজ্ঞতা তোমার?

বৎস। আর কী চাও?

মঞ্জুলিকা। তোমার অনামিকার আংটি,
বৎসরাজ,
আমার জন্যে।

বৎস। (হাতে পরিয়ে দিতে দিতে)
সুন্দরতর হাতে
এ খুসী হয়ে থাকবে।

মঞ্জুলিকা। যখন মূল্য দিলে চাওয়া-মাত্র এবং ভালো রকম
তখন তোমার কাজে, বৎস,
উৎসাহে নামলাম।
তবে বৃহত্তর উৎকোচটি থাকল ভবিষ্যতের জন্যে।

বৎস। আমাদের কৌশাম্বীতে চেয়ে নিও।

মঞ্জুলিকা। সেখানেই নিশ্চয়।
ঘুমাও এখন।

বৎস। তোমার সাহায্য পেয়ে এখন ঘুমাতে পারব।
(মঞ্জুলিকার প্রস্থান)
সংগীত মধুর;
কিন্তু মানব-বীণার সমুদায় অন্তর-তন্ত্রীর উপর অধিকার
মধুরতর।
শিল্প-কলা মহৎ জিনিস
কিন্তু বাধা-বিপত্তি সব বরণ করে
আমাদের বিরোধী গর্বিত হিংস্র শত্রুদের ভেদ করে
সমুচিত উদ্দেশ্য সব সংসাধন করা মহত্তর।
সংগীত স্বর্গীয় বস্তু,
আরো স্বর্গীয় হল প্রেম।

পঞ্চম দৃশ্য

বাসবদত্তার মহলে একটি কক্ষ।

বাসবদত্তা। যা বলছি যা করছি
তার উপর আর আমার হাত নেই।
এই আগুনের কথাই কি বলেছিলেন আমায় মা?
আঃ, নষ্ট এ জিনিস, নষ্ট।
কিন্তু আমার সমান কাউকে
আমার উপর প্রভুত্ব করতে দেব না।
সে আমার সেবা করে যাক অনুগত হয়ে
তবেই তার প্রিয়দর্শন মাথাটির উপর
মহার্ঘ উপহার সব ঢেলে দেব।
সে আমার, শুধু আমারই,
আমার ক্রীতদাস,
আমি যথেচ্ছ খেলা করব আমার পুতুল বলে,
কিন্তু আমাকে নিয়ে খেলা করবার সাহস যেন তার না হয়।
মনে হয় এ সাহস তার আছে;
ঠিক জানি না,
তবে মনে হয়
দুরাশা যেন তার সেরকম।
নয় সে, দীপ্তিময় সে, নির্ভীক সুন্দর সে।
তাকে ডেকে পাঠাব, তিরস্কার করব, রাখব নীচে দাবিয়ে;
কঠোর তিরস্কার করব তাকে—
কোনো দুরাশা যেন সে না দেখায়।
ঐ যাঃ, প্রায় ভুলেই গিয়েছি পিতার অভিলাষ,
আর সে অভিলাষ তো ছিল আমারও।
এটি একেবারে হারাবার আগে
বালকটির কাছ থেকে আদায় করব এক প্রতিশ্রুতি।
সে যখন একান্ত আমার হবে
তখন কী কঠিন লাগবে তার?

(উচ্চৈঃস্বরে ডাকে)

অয়ি। তার বিনায় থেকে বৎসকে এখানে নিয়ে এস।

তার সংগীত আকুলকণ্ঠে যেন ডাকে আমাকে,
তার গানের শিকল সে জড়িয়ে দেয় আমার হৃদয় ঘিরে।
অতিরিক্ত শোনা ভালো না ওসব।
ভুলে যাচ্ছি যে আমি বাসবদত্তা,
আমাদের বংশের শত্রু সে,
আমি হৃদয়ে চিন্তায় শুধু জানছি বৎসকে
আমার সম্মোহিত অন্তর স্পন্দিত বৎসলোকে,
বৎসকে আশ্রয় করে।
এরকম কিছুতেই চলবে না।

(বৎসকে নিয়ে অন্যান্য প্রবেশ এবং পরে প্রস্থান)

যাও অন্য।
বৎস, দাঁড়াও আমার সামনে।

বৎস। এ আমার রাজরাণীর গলা শুনছি।

বাসবদত্তা। চুপ কর।
চোখ নামাও;
আমার চোখে চোখ রাখবার স্পর্ধা করো না—
দাস তুমি।

বৎস। আমার চোখদুটিকে দোষী করবেন না,
তারা আপনার দিকে শ্রদ্ধাভরে উত্থিত হৃদয়ের
মূক ইঙ্গিত অনুসরণ করেছে।

বাসবদত্তা। (বিগলিত কণ্ঠে) সত্যিই আমাকে শ্রদ্ধা কর, বৎস?

বৎস। নর্ত্যের অদ্বিতীয়া দেবী, হ্যাঁ।

বাসবদত্তা। (মধুর সুরে) কিন্তু বৎস, মানুষ শ্রদ্ধা জানায়
দেববিগ্রহের চরণে আনত দৃষ্টি দিয়ে।

বৎস। আমাকেও তাহলে

তোমার রূপসুধা এই নয়নে পান করতে দাও,
তোমার চরণতলে বসে
ওদের নিদ্রালস চন্দ্রালোক আমার নয়নে মেখে ;
স্পর্শ করতে দাও ফুলে-ঢাকা ওই অমর্ত্যপদপল্লব
যারা তাপহারা বধির মর্ত্যকে অনুক্ষণ করে অনুগৃহীত।
তোমার পূজা করতে দাও এভাবে,
এভাবে শুনতে দাও তোমার ভাষণের অনুরণন।

বাসবদত্তা। বৎস তোমার দুঃসাহস সংযত কর।

বৎস। আঃ, যখন অস্ফুট তোমার কণ্ঠস্বর
তখনো তা এসে আমার মর্মে প্রবেশ করে।

বাসবদত্তা। ছাড়বে না আমাকে ?

বৎস। আদেশ করলে নিশ্চয়ই ;
কিন্তু ও আদেশ ক'রো না।

বাসবদত্তা। (বৎসের মস্তকে স্নেহস্পর্শ করতে আনত হয়ে)
সত্যিই যদি
আর ঠিক আমার দাসের মতোই যদি
আমাকে শ্রদ্ধা জানাও
তাহলে বারণ করব না।

বৎস। আর কি চাই
এই তো আমার সব।

বাসবদত্তা। কিন্তু আমার ভৃত্য যখন তুমি
তখন আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে
তা কি আমারও নয় ?
বৎস, তাহলে আমার নিজস্ব যা
তাথেকে আমাকে বঞ্চিত করছ কেন ?

বৎস। সব নাও ;
নাও আমার করে সব।

বাসবদত্তা। (আত্মসংবরণ করে) প্রথমে কৌশাম্বী।

বৎস। পাবে কৌশাম্বী
তোমার চরণাভরণ রত্নরূপে।

বাসবদত্তা। বৎস, আর চাই তোমার রাজ্য
আমার ইচ্ছানুসারে শাসনের জন্য।

বৎস। তাও হবে তোমার—
তোমার রাজশ্রীর উদ্যানস্বরূপ।

বাসবদত্তা। 'হবে' অর্থ ?

বৎস। অনেক দূরে কি নয় তা ?
রাণী, আগে যেতে হবে সেখানে
তারপরে তো গ্রহীতা তুমি
আর আমি দাতা।

বাসবদত্তা। সেখানে যেতে চাই আমি।
কিন্তু উদয়ন, আগে প্রতিশ্রুতি দাও,
সে-প্রতিশ্রুতিতে বাঁধা থাকবে তুমি,
যে আমি ছাড়া কেউ হবে না কৌশাম্বীর রাণী
আর আমার দাস তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আজ্ঞাবাহক
হয়ে থাকবে আমার রাজসিংহাসনের তলায়।

বৎস। আমার হৃদয়াসনে রাণী হয়ে থাকবে তুমি,
আর যদি চাও
হবে আমার চিন্তার
আমার আশা ও উদ্বেগের একেশ্বরী ;

কিন্তু তোমাকে অবজ্ঞা করার আদেশ দাও যদি
তবে তা শুনব না,
মধুরা অদ্বিতীয়া রাণী আমার।

বাসবদত্তা। (সহাস্যে) এই স্বাধিকার তোমাকে দিলাম।
(ইতস্তত করে)
আর বৎস,
আমার পিতা
প্রবল চণ্ড মহাসেনের অধীনে
তোমাকে রাজত্ব করতে যদি বলি?

বৎস। রাণী, সে আদেশ প্রতিপালিত হবে না।

বাসবদত্তা। হবে না? তোমার প্রতিজ্ঞা?

বৎস। অন্য এক রাজার সেবা করা
আমার পক্ষে অবাধ্যতা হবে না কি?

বাসবদত্তা। (বিস্মিত অথচ খুসীমনে)
তুমি আমার সঙ্গে খেলা করছ।

বৎস। না, রাণী।
যা একান্ত আমার
তাই শুধু নিঃশেষে নাও।
কিন্তু ওবন্তীটি আরো অনেকের।

বাসবদত্তা। কার?

বৎস। শেষ আছে কি তাদের নামের?
এই আর্যভূমি যার শাসনে থেকে
এমন নাম ধরেছে
সেই ভরত প্রথমে;

মহামহিম দুষ্মন্ত
ও পুরুবংশ প্রসিদ্ধ বীরপুত্র
এবং উভয়ের অতুল্য বংশধররা—
অর্জুন, পরীক্ষিৎ ও তার অপত্যরা—
যাদের ভগবান স্বয়ং এসে বসিয়েছিলেন সিংহাসনে ;
আর যারা সব আসবে আমাদের পরে,
তুমি যে আমাকে বরণ করেছ
সেই তোমার ও আমার সন্তানরা ;
মহৎ দেশের জনস্রোত ;
আর সেই কৌরব পিতৃপুরুষ
এবং ভবিষ্য পুরুষরা ;
সকলের অনুমতি হওয়া দরকার।

বাসবদত্তা। তোমার চিন্তাধারা মহৎ।
কিন্তু তোমার যদি বন্দীজীবন কাটাতেই হয় এখানে ?
আমার পিতা দেখছি অটল কঠোর।

বৎস। অন্তরের অন্তরে সত্যিই কি তুমি এই চাও ?
বৎস ম্লান হলে
তুমিও কি ম্লান হও না ?

বাসবদত্তা। তুমি কথা দাও নি
আমার শাসন মানবে ?

বৎস। প্রতিটি আদেশ মানব
যখন কৌশাম্বীর রাজসিংহাসনে আসীন,
এখানে তোমার পিতার বন্দীরূপে বাধ্য যেমন
সেরকমে নয়।
সেখানে তোমার হব আমি।

বাসবদত্তা। যাও বৎস, যাও আমার কাছ থেকে।
অম্বা, একে নিয়ে যাও।

অন্য। (একে এবং বাসবদত্তার কানে কানে বলে)
কে ঘুষ খেয়েছে ?
আমরা সবাই এখন বিশ্বাসঘাতক।

(কঞ্চুকীকে নিয়ে প্রস্থান)

বাসবদত্তা। কী আনন্দ,
যদি ও আর সব কিছু হয় আমারই।
কি মর্যাদা, ওর এবং পৃথিবীর রাণী যদি হই।
পিতৃবংশের বিরুদ্ধে হয়ে উঠছি বিদ্রোহী আমি।

(ক্রমশ)

শ্রীমা প্রসঙ্গ*

ডক্টর কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

(১)

১৯১২ সালের শেষ দিকে শ্রীমা যখন দৈনন্দিন "ধ্যান ও প্রার্থনা" লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলেন, তখনই তিনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং আধিভৌতিক জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় অনেক উর্দ্ধে উঠে গেছেন। হয়ত ইংরাজী অনুবাদ মূল ফরাসীর মত সরল সৌন্দর্য্য, অবশ্যম্ভাবী শব্দবিন্যাস ও বাধ্যতামূলক ছন্দ-ঝঙ্কার-বিহীন। কিন্তু এই অনুবাদের কাজটি অনেকখানি দরদ দিয়ে করা হয়েছে এবং অনুবাদক মূল ফরাসীর প্রাণস্পন্দ, তেজস্বিতা ও সুস্বাদ-সুরভি বজায় রেখেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মাত্র ১৯৪৮ সালে মুদ্রিত শ্রীমার "ধ্যান ও প্রার্থনা" পুস্তিকাটির বর্ত্তমান সংস্করণ খুবই আকর্ষণীয় এবং প্রেরণাদায়ক, এমন কি সাহিত্যে ও অধ্যাত্মে এ হল এক অমূল্য সম্পদ। (১)

এই সকল জ্ঞানদীপ্ত আলোড়নকারী ধ্যান ও প্রার্থনাগুলির তীব্র শুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় সর্ব্বপ্রথম লিপিকা থেকেই, যার তারিখ হ'ল ১৯১২ সালের ২রা নভেম্বর

"পরম বিধাতা, সকল জিনিসের জীবন তুমি, জ্যোতি তুমি, প্রেম তুমি। আমার সমস্ত সত্তা ভাবে তোমার কাছে নিবেদিত বটে, কিন্তু কাজে ছোটখাটো ব্যাপারে এ নিবেদনের প্রয়োগ আমার পক্ষে এখনও কষ্টকর। আমার এই লিখিত ধ্যানের হেতু ও সার্থকতা ঠিক এইখানে যা তা প্রতিদিন তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এ কথা বুঝতে আমার দরকার হয়েছে কয়েক সপ্তাহ। প্রতিদিনই তা হ'লে এই রকমে তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই যে আলাপ হয় তার কিছু একটা স্থূলরূপ দিয়ে ধরতে পারব। যথাসাধ্য আমি তোমার কাছে সব খুলে বলব—এ বিশ্বাস নয় যে তোমাকে নূতন কিছু বলতে পারব—তুমিই তো সব জিনিস কিন্তু এই জন্যে যে আমাদের বুঝবার যে বহির্মুখী ও কৃত্রিম ধারণা তা তোমার কাছে অপরিচিত,—আদৌ যদি এ কথা বলা চলে—তা তোমার প্রকৃতির বিপরীত। তা হলেও তোমার দিকে যখন ফিরে দাঁড়াব, এ সব জিনিস দেখবার সময় তোমার আলোকে নিজেকে যখন

---

* On the Mother—Chaps. X-XIII

(১) শ্রীঅরবিন্দ বলেন " এই প্রার্থনাগুলি শুধু কাল্পনিক আদর্শবাদের চিত্রমিকে চূড়ান্তের মূলাবী নয় বা ঈশ্বরত্ব নিয়ে শুরুগম্ভীর ধারণাটুকা নয়, বরং অধ্যাত্ম অনুভূতির অমরীকারী সত্য—দৃষ্টান্ত, ভ্রুতবাণী, স্পর্শগ্রাহ্য আকার, আমাদের বাহ্য অনুভূতির গোচর মূলবস্তুই সত্য, অথচ সব এক যা আমরা জ্যোতির্ময় জগতে, যা আমার ইন্দ্রিয়সর্বস্ব মানব চেতনার কাছে অপরা"।—In the Mother's Light : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬

অভিষিক্ত করব, তখন দেখতে পাব ক্রমে তারা তাদের সত্যকার স্বরূপের মত হয়ে উঠছে। একদিন শেষে আসবে যেদিন তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক হয়ে যাব, তখন আর তোমাকে কিছু বলবার আমার থাকবে না, কারণ আমি তো তুমিই হয়ে যাব। ঠিক এই লক্ষ্যেই তো পৌঁছতে চাই। ঠিক এই বিজয়ের দিকেই তো আমার সকল প্রয়াস আমি নিয়োগ করতে চাই। সেদিনের অপেক্ষায় আমি রয়েছি যেদিন আমি আর "আমি" বলতে পারব না, কারণ, আমি হয়ে যাবে তুমি।" (১)

এইভাবে দৈনন্দিন ভগবৎ-সান্নিধ্যের মূলভিত্তি, সক্রিয়তা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগল, এরপর থেকে আলোর ঝরণা-ধারায় উৎসারিত হ'তে লাগল অনায়াসে আশ্রুধা। আরাধনা, সম্মিলন ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম—সত্যই এ হ'ল ঈশ্বরের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের এক অত্যাশ্চর্য উৎক্ষেপ। সমৃদ্ধ আত্মার খনি থেকে উপহারাজি সংগ্রহ হ'তে লাগল, অপূর্ব্ব প্রজ্ঞার ভিড়, সুসঙ্গত যুক্তির কণ্ঠহার, আনন্দের পাত্র থেকে আকণ্ঠ পান, অন্তরাত্মার স্ফুলিঙ্গ কোরারা যখন তাকে মেহাইয়ের উপর রেখে তাকে শুদ্ধ ও রূপান্তর করার প্রয়াস চলে—এ সবই শ্রীমার দৈনন্দিন জীবনের ধ্যান ও প্রার্থনার সহজ কথা। এগুলি তাঁর আপন প্রয়াসের দিনলিপি ও দলিল, সনির্ব্বন্ধ মিনতি, অলৌকিকের চকিত দর্শন, আংশিক উপলব্ধি, পুরাতনের পুনর্দর্শন এবং আরো নূতনের দর্শন এবং যতই আমরা ধ্যান ও প্রার্থনার স্বর্ণধারা অনুসরণ করতে থাকি, ততই আমরা এই প্রসারণ ও উর্দ্ধায়ন ক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করি, গ্রহণ করি আর এক জগতে এই লোকোত্তর জ্যোতি ও জীবনের কিছু যা এই জগতেরই গহনে, কোথাও যতই ভিতরে আবৃত ও কুণ্ডলীকৃত হয়ে থাকুক।

শ্রীমা ১৯শে নভেম্বর ১৯১২ তারিখ দিয়ে লিখলেন :—

"এই যে ইংরেজ ছেলেটি এতখানি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তোমার অনুসন্ধানে চলেছে, তাকে কাল আমি বলেছি—তোমাকে আমি চিরতরে পেয়েছি, তোমার আমার সংযোগ নিরন্তর ; বাস্তবিকই এই হ'ল আমার অবস্থা, যতদূর সে-সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমার সকল চিন্তা চলেছে তোমার দিকে, আমার সকল কর্ম্ম তোমার কাছে উৎসর্গীকৃত। তোমার উপস্থিতি আমার কাছে ধ্রুব অটুট, অচঞ্চল, বাস্তব ; তোমার শান্তি আমার হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজমান।" (২) যদিও তথাপি ছিল সেখানে "মিলন", একান্ত একাত্মতার উপলব্ধি তখনও আসেনি ; কিন্তু কালে তাও আসবে, কারণ বিশ্বাস সেখানে অক্ষুণ্ণ, অনাতঙ্ক। তাই শ্রীমা তাঁর বিশুদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে বারংবার ঘোষণা করে বলেন :

"সব তুমি, সর্ব্বত্র তুমি, সবের মধ্যে তুমি। এই যে দেহ কাজ করছে, সবগ্র দৃশ্যমান বিশ্বের মতই তা ঠিক তোমার নিজের দেহ। তুমি শ্বাস ফেলছ, চিন্তা করছ, ভালবাসছ

---

1 Prayers and Meditations p. 1-2

2 Prayers and Meditations p. 3

এই সত্তাটির মধ্যে—সে-সত্তা তুমিই। তাই সে হতে চায় তোমার অনুগত দাসী।" (১)

"তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা—কেবলমাত্র তুমিইরূপে ও স্বরূপে।" (২)

অভীপ্সা, বিশ্বাস, সমর্পণ : এ তিনটি হল উপলব্ধির সেতু-নির্ম্মাণের প্রসারিত বিধান। শ্রীমা লিখলেন,"আমি তোমার মধ্যে ডুবে যাই, হারিয়ে যাই, শিশুর নির্ভর নিয়ে অপেক্ষা করি তোমার কাছে অনুপ্রেরণার জন্যে, সামর্থ্যের জন্যে যাতে আমার ভিতরকার, আমার চারিদিকের ভুল শুধরে উঠে—ভিতর আর চারিদিক তো একই জিনিস ; কারণ এখন আমি নিরন্তর সুস্পষ্ট দেখতে পাই বিশ্বব্যাপী ঐক্যই সকল ক্রিয়াবলির মধ্যে পরস্পরের একান্ত নির্ভরতা বিহিত করে দিয়েছে।"(৩) ঠিক একমাস পরেই ৩রা ডিসেম্বর ১৯১২ সালে আবার শ্রীমা লিপিবদ্ধ করলেন : "কালরাত্রে আমি পরীক্ষা করলাম তুমি যেমন চালাও তেমনি নির্ভর করে নিজেকে ছেড়ে দিলে কি সুফল তার হয়। যে-জিনিস যখন জানা প্রয়োজন তা ঠিক তখনই জানা যায় ; তোমার জ্যোতির দিকে ফিরে মন যত নিশ্চল থাকে, প্রকাশও তার মধ্যে হয় তত সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট। আর শঙ্কা নাই ক্ষোভ নাই—আছে কেবল পরম প্রসন্নতা, চরম নির্ভর আর নির্ব্বিচল শান্তি।"(৪)

দুদিন পরেই আবার লিখলেন শ্রীমা : "ঘৃণা নয়, চিন্তা নয়, কৃচ্ছ্রতা নয় এক তুমিই, তুমি ছাড়া আর কিছুই নয় তবে বিশ্লেষণ করে, জ্ঞানের বিষয় করে তোমাকে পাওয়া নয়—তুমি রয়েছে কিছুমাত্র সন্দেহ তাতে নাই, কারণ, সব সেখানে হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ শান্তি, দিব্য নীরবতা।" (৫) এই শান্তি ও নীরবতা, এক নিরবচ্ছিন্ন পরিপূর্ণতার যে ভাব তা আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে লাগল এবং বাণীগুলিও আপন ব্যাকুলতায় ভরে উঠল :

"শিখা যেমন অনলে নির্ব্বাক হয়ে, সুবাস যেমন উর্দ্ধে ওঠে নিষ্কম্পভাবে, আমার ভালবাসাও তেমনি চলে তোমার দিকে। শিশু যেমন তর্ক করে না, কিছুরই জন্য চিন্তাও করে না, আমিও তেমনি তোমাতে নির্ভর করি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার আলো ফুটে উঠুক, তোমার শান্তি ছড়িয়ে পড়ুক, তোমার ভালবাসা জগৎ ছেয়ে দিক।"(৬)

"গতকাল আমার বাণীর মধ্য দিয়ে তোমার আলো অবাধে প্রকাশ হয়েছে ; যন্ত্র হয়েছে সুনম্য, অনুগত, পাণিত। সকল জীবে, সকল বস্তুতে তুমিই ত কর্ম্ম করে চলেছ, আর যে তোমার এত সান্নিধ্যে এসেছে, যাবতীয় কর্ম্মে কেবল তোমাকেই দেখতে পায়, সে-ই তো পারে সকল কর্ম্মকে তোমার আশীর্ব্বাদে রূপান্তরিত করতে।"(৭)

---

1 Prayers and Meditations p. 3
2 Prayers and Meditations P. 4
3 Prayers and Meditations P. 2
4 Prayers and Meditations P. 7
5 Prayers and Meditations P. 8
6 Prayers and Meditations P. 8
7 Prayers and Meditations P. 9

(২)

১৯১২ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯১৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে প্রায় দু'মাসের দীর্ঘ ব্যবধান। শেষের তারিখটিতে শ্রীমা শুনলেন যে বাণীতে গীতমধুর কণ্ঠে ঈশ্বর পৃথিবীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন এবং তার অনুলিপি এই : "ওগো দুঃখিনী পৃথিবী, মনে রেখো তোমার অন্তরে আমিই রয়েছি, নিরাশ হয়োনা। তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা, প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা, তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান, তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা, তোমার ঋতুচক্রের প্রত্যেক পুনরাবর্তন, সব জিনিস কোন কিছু বাদ না দিয়ে—তোমার কাছে যা দুঃখের মনে হয় আর যা সুখের মনে হয়, যা মনে হয় কুৎসিত, আর যা মনে হয় সুন্দর, সকলে—সকলে অনিবার্য্যভাবে তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে—আমি অন্তহীন শান্তি, ছায়াহীন আলো, ছেদহীন সম্মিলন, একান্ত নিঃসংশয়তা, বিশ্রান্তি,—পরম আশীর্ব্বাদ।" (১)

জড় প্রকৃতি একদিন পরাপ্রকৃতি হয়ে উঠবে, সুতরাং নৈরাশ্যের কোন কারণই নেই ; আর শ্রীমার কৃতজ্ঞতাও উর্দ্ধে উঠে চলেছে তাঁরই দিকে "ভারতবর্ষের সুগন্ধ বিশুদ্ধ ধূপ-শিখার মত"।(২) শ্রীমা এও উপলব্ধি করলেন তাঁকে সাগ্রহে অনুসন্ধান করার চেয়ে অটুট বিশ্বাস নিয়ে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকা অনেক শ্রেয়:—কারণ তিনি আসবেন, অবশ্যই আসবেন। তাঁর ক্রমস্ফুট ইচ্ছার চেতনা ও তারই সাথে ক্রমোন্নত একাগ্রতার মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে সত্যকার স্বাতন্ত্র্য ও সর্ব্বশক্তিমত্তা ও আরও রয়েছে পূর্ণ রূপান্তরের সম্ভাবনা। বিশ্বাস তাঁর অটুট এবং আত্মসমর্পণ জীবনের ধর্ম্ম বলেই পরম সদ্‌বস্তুর প্রজ্ঞান শ্রীমার জীবনে ভিড় করে আসে ও কনকোজ্জ্বল বাণীতে পরিণত হয় :

"ভগবান, ভগবান ! সীমাহীন আনন্দপূর্ণ করেছ আমার হৃদয়, আমার মস্তিষ্ক ভরে দিয়ে উল্লাসের উর্দ্ধপথ চলেছে তার অপরূপ ঢেউ সব তুলে দিয়ে তোমার বিজয় স্থির-নিশ্চিত, এই দুই প্রত্যয়ের মধ্যে আমি পেয়েছি পরমা শক্তির অজেয় শক্তি। তুমি আমার সত্তা ভ'রে রয়েছ, তাকে সঞ্জীবিত রেখেছ, তার প্রচ্ছন্ন উৎস সঞ্চালিত করেছ, তার বুদ্ধিকে আলোকিত করেছ, তার প্রাণকে প্রখর করেছ, প্রেমকে বহুগুণিত করেছ। এখন আমি তাই বলতে পারিনা, আমি বিশ্ব না বিশ্বই আমি, তুমি আমার মধ্যে না আমি তোমার মধ্যে। একমাত্র তুমিই রয়েছ, সবই তুমি, তোমার অসীম করুণার উচ্ছ্বসিত ধারা জগৎকে পরিপূর্ণ করেছে, ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে"।(৩)

"আমার অন্তর থেকে উঠছে একটি গীত, গম্ভীর গভীর প্রসন্ন সূক্ষ্ম—জানিনা সে-গান

---

1 Prayers and Meditations Pp. 10-11
2 Prayers and Meditations P.-11
3 Prayers and Meditations P.-14

আমার থেকে তোমার দিকে যায়, না তোমার থেকে আমার দিকে আসে কিংবা তুমি আমি সারা বিশ্ব মিলে আমরা হলাম এই যে অদ্ভুত গীতটি আমার চেতনায় জেগেছে...পৃথকভাবে আমি নেই, তুমি নেই, বিশ্বও নেই—এ নিশ্চয়।...অনির্ব্বচনীয় শান্তির মধ্যে আত্মহারা আমার আত্মা।"(১)

"তুমি যেখানে নাই সেখানে সব নিষ্প্রাণ, নিরেট অচেতন। যা-কিছু আমাদের আলো দেয়, মুগ্ধ করে, আমাদের জীবনের সমস্ত অর্থ, সমস্ত লক্ষ্য তা সবই তুমি। এর চেয়ে আর বেশী কি প্রয়োজন—সকল ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হলে দু পক্ষ মেলে দিয়ে স্থূল জীবনের ক্ষণস্থায়ী অনিত্যতার ঊর্দ্ধে বিচরণ করতে হলে—তবেই ত উড়ে যেতে পারি তোমার দিব্য সালোক্যের মধ্যে, পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতে পারি তোমার বাণীবহ হয়ে, তোমার আসন্ন আগমনীর অপরূপ বার্তা ঘোষণা করতে।"(২)

কোনো কোনো মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সসীমতা মানুষের দৃষ্টিক্ষীণতা ও আনন্দহীনতা তাঁর চেতনার উপর চাপ দেয় এবং আপশোষের মৃদুস্বরে তিনি বলেন পৃথিবী ও মানুষ এখনও বিকৃতভাবে স্বরচিত ও নিরানন্দ পথে হানাগুড়ি দিচ্ছে :

"ভগবান, আসুন যেমন আলো ও উত্তাপ দেয়, ঝরণা যেমন তৃষ্ণা জুড়ায়, তরু যেমন ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করে, আমি যেন সেই রকম হ'তে পারি...মানুষেরা এত দুঃখী, এত অবোধ, তাদের সাহায্যের এত প্রয়োজন।"(৩)

"তবে কেন মানুষ এসব সম্পদ ফেলে চলে যায়, কেন ভয় করে এসে? কি অদ্ভুত এই অজ্ঞান, সকল দুঃখ কষ্টের উৎস যেখানে। কত দীনহীন এই মোহ—মানুষকে তার সৌভাগ্য থেকে আড়াল করে রেখেছে, সাধারণ জীবনের সংগ্রামে দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ এই দারুণ পরীক্ষাগারের মধ্যে বাস করে রেখেছে।"(৪)

অধৈর্য্যের তরঙ্গ ও উত্তেজনা কোন সমাধানই আনে না, তথাপি ধৈর্য্য কতই না কঠিন বস্তু! কবি হপ্‌কিন্‌স স্বীকার করে বলেন :

'ধৈর্য্য, সে অতি কঠিন বস্তু।...
স্বাভাবিক হৃদয়ের আইভিলতা ধৈর্য্য ঢেকে রাখে
অতীতে বিধ্বস্ত আমাদের উদ্দেশ্য যত।
ওই তো রৌদ্রধারায় পরিস্নাত সে—
সিন্ধুর নীল আঁখি যার আদ্রব কিশলয়-সাগরে।'

---

1 Prayers and Meditations p. 18
2 Prayers and Meditations p. 22
3 Prayers and Meditations p. 15
4 Prayers and Meditations p. 16

হতে পারে ধৈর্য্য কঠিন বস্তু, কিন্তু শ্রীমার তাইই প্রয়োজন। কারণ তাঁর প্রচেষ্টা হ'ল—সে অগ্নিপরীক্ষা যতই দীর্ঘ বা অল্পক্ষণই হ'ক—আঁধারকে বিদূরিত এবং ক্ষত নিরাময় করা। তা হ'লে যে ধৈর্য্য দুর্ব্বলতা আনে তার কাছে সমর্পণই বা কেন? শ্রীমা কুহকাচ্ছন্না হয়ে পড়বেন না, তিনি হবেন নমনীয় ও দৃঢ় প্রত্যয়শীলা; কারণ তাঁর অন্তরের গভীরতার থেকে ওঠে সেই দৈববাণী:

"কাজ ভাল করে করবার জন্য উদ্যত হওয়া দুঃসঙ্কল্পেরই মত নিয়ে আসে সমান ফলল, গভীর জলের মত প্রশান্তির মধ্যেই নিহিত সত্যকার সেবার একমাত্র সম্ভাবনা।" (১)

প্রায় দু'মাসের অর্থপূর্ণ বিরতির পর শ্রীমা ৭ই অক্টোবর ১৯১৩ সালে লিখলেন:

"তিন মাস অনুপস্থিতির পর তোমার নামে উৎসর্গীকৃত এই গৃহে ফিরে দুটি উপলব্ধি আমার হল, ভগবান। প্রথমতঃ আমার বাহ্যসত্তায় আমার স্থূল চেতনায় আমি আর আদৌ অনুভব করি না যে আমি রয়েছি আমার নিজের ঘরে, অথবা সেখানে আমি কোনকিছুর মালিক। ...দ্বিতীয়তঃ, গৃহখানির সমস্ত আবহাওয়ায় মিশে রয়েছে একটা পুণ্য-গাম্ভীর্য্য—সেখানে প্রবেশ করলেই ডুবে যাই যেন গভীরে। ধ্যান সেখানে হয় নিবিড়তর, মহত্তর।...আমার আধারের নূতন এক দুয়ার খুলেছে, এক বিশালতা এসে দেখা দিয়েছে—সব পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে। সবই নূতন। পুরাতন ছিন্নবস্ত্র সব যেন খসে পড়েছে, নবজাত শিশু চোখ মেলে তাকিয়েছে উদীয়মান উষার দিকে।"(২)

সত্যই সবই পরিবর্ত্তিত হয়েছে—প্রশান্তি এসেছে ও জড়ের মধ্যে স্থায়ী হয়েছে—তবুও বাধা বিপত্তির হঠাৎ আপদ নিঃশেষিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীমা লিখলেন—'সক্রিয় চিন্তাকে যখন আমরা স্তব্ধ করে রাখি—তুলনায় তা খুব কঠিন নয়—তখনি দেখি চারিদিকে থেকে উঠে আসছে অবচেতনার রাশীকৃত সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপ, অনেক সময়ে তা এত পরিপ্লাবী হয় যে আমাদের একেবারে ডুবিয়ে দেয়।"(৩)

কি করে এই সূক্ষ্ম সর্পটিকে নির্জ্জীব এবং এমন কি বিনাশ করা যায়? সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্র সাধনায়? শ্রীমা বলেন, 'না' অন্য কোন অভ্রান্ত উপায় নিশ্চয়ই আছে। সে উপায় তিনি আবিষ্কার করবেন অন্তরের অন্তঃস্থলে যে দিব্যদিশারী আছেন তাঁর বাণী শুনে, সেই দিশারী যাঁর মধ্যে রয়েছে "জননীর স্নেহো আর শিক্ষকের স্নেহো আর সহিষ্ণুতা।" (৪)

---

1 Prayers and Meditations P. 19
2 Prayers and Meditations Pp. 23-24
3 Prayers and Meditations P. 25
4 Synthesis of Yoga Sri Aurobindo, Part I, P. 15

(৩)

জড়ের অচেতনা, গুরুভার, ব্যর্থতা ও পরাজয় মর্ত্যজীবনকে মেঘাচ্ছন্ন করতে থাকে এবং নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে বিবর্তনের পথটি রুদ্ধ করে তোলে। এ সব তামসিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করে ব্যর্থতা, সত্যভ্রষ্টতা ও পরাজয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে শ্রীমা গভীর বেদনা পান। তাই তিনি ২৯শে নভেম্বর ১৯১৩ সালে লিখলেন, "কেন এই কোলাহল, এই আন্দোলন, এই বিক্ষোভ? কেন এই ঘূর্ণী মানুষকে নিয়ে ছুটে চলেছে, ঝড়ের মধ্যে এক ঝাঁক মাছির মত। কি করুণ দৃশ্য—এত শক্তির অপব্যয়, এত পরিশ্রম নষ্ট। পুতুলের মত সূতোর টানে এই যে তাদের নৃত্য করে তা বন্ধ হবে—কিন্তু কে বা কিসে তাদের যে ধরে আছে জানেও না তারা।"(১) "অপব্যয়" আমাদের অপরাধজনক অযোগ্যতা ও নির্বুদ্ধিতার এক প্রধান কথা। প্রকৃতির দান, আমাদের নিজস্ব শক্তি, কাল ও সৌন্দর্য্যের অপব্যয় হচ্ছে এবং সবার উপরে যা অপব্যয় হচ্ছে তা হল ভগবৎ-করুণা যাকে প্রত্যাখ্যান পর্য্যন্ত করা হচ্ছে—সেইই মূর্খ ভারতীয়ের মত সত্যভ্রষ্ট মানব আপন হাতে ছুঁড়ে ফেলে "সকলের চেয়ে মূল্যবান মণি"। প্রদীপ্ত সম্ভাবনা ও কঠোর বাস্তবতার মধ্যে ছায়ালোক, তার উপর শ্রীমা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, উৎকণ্ঠ হয়ে আছেন কখন ছায়া অপসারিত হবে এবং অজ্ঞানের জগৎকে পুনরধিকার করবে আলো।

"তোমার দিব্য প্রেমের মধ্যে নিজে গিয়ে, আমি দৃষ্টিপাত করি পৃথিবীর উপর, তার জীব-কুলের উপর, দেখি এই পদার্থের রাশি নিয়ত রূপ গ্রহণ করে, বিনাশ পায়, পুনরায় নবীভূত হয়, এই যে বহু সমাবেশে রূপ সব গড়ে ওঠে, আবার তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায়, এই যে সব সত্তা যাদের ধারণা তারা সচেতন শাশ্বত ব্যষ্টিরূপ, বস্তুতঃ কিন্তু তারা একটি নিঃশ্বাসের মতই নশ্বর, সকলেই তারা একই ধরণের, পার্থক্য যতই হোক, তারা সকলে চিরকাল পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করে চলেছে একই সব কামনা, একই সব প্রেরণা, একই সব তৃষ্ণা, সেই একই সব অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রমাদ।" (২)

বিশ্বাসঘাতক আনন্দ, নীচতা ও নির্ব্বোধ তৃপ্তির দ্বারা প্রতিপালিত ভাতিপ্রদ উদ্ভ্রান্ত নাগরিক জীবন ও তথাকথিত সভ্যতা মানুষকে দৃঢ়ভাবে অভিভূত করে রেখেছে। পরে একদিন শ্রীমা লিখলেন, "এই যে অবাস্তব ব্যক্তিরূপের নিরন্তর ঘূর্ণী, এই যে বহুলতা জটিলতা, এই যে অপরিসীম অশোধনীয় বিশৃঙ্খলা, চিন্তার বিরোধ, প্রেরণার দ্বন্দ্ব, কামনার যুদ্ধ, আমার মনে হয় ক্রমেই অধিকতর নিদারুণ হয়ে উঠছে। এই যে উন্মত্ত সাগর এর থেকে আমাদের উঠে আসতে হবে, দাঁড়াতে হবে এসে তোমার শান্তিপূর্ণ তীরের প্রসন্নতার মাঝে।" (৩)

আমরা এই বিক্ষুব্ধ সাগর থেকে উঠে আসবো—কিন্তু কেমন করে? কলরবকে নীরবতা দিয়ে, বিক্ষোভকে স্থৈর্য্য দিয়ে, নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যথাকে প্রসন্ন আনন্দ দিয়ে বাধা দিতে

1 Prayers and Meditations P. 28
2 Prayers and Meditations P. 47
3 Prayers and Meditations P. 58

হবে ; শুরু হবে বাষ্টিগত জীবন থেকে, ক্রমে অনিবার্য স্রোতে সমষ্টিকে এ অনুসরণ করতে হবে। সংস্কারসাধন, রূপান্তর অন্তরেই শুরু হবে প্রথমে : "নিজেরই মধ্যে সকল বাধা, নিজেরই মধ্যে সকল বিঘ্ন, নিজেরই মধ্যে সকল আঁধার ও অজ্ঞান।" (১) তাই নিশ্চয়তাও আসবে অন্তর থেকে। এবং এ গুপ্ত রহস্য সমাধানের সূত্র হ'ল "অন্তরের এক অপ্রস্ফুটিত ও অবগুণ্ঠিত কুসুমকলি। একটিবার যদি মানব মন চিরন্তনের দিকে দৃষ্টি ফেরায় তাহ'লে ত্বরিত ও ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কুলটি একটি একটি করে খুলে দেবে তার সকল দল।"(২) অবশেষে যখন এরূপ এক চূড়ান্ত পর্য্যায়ে মন ফেরে তখন কেবলমাত্র সেই অচল নৈঃশব্দ্য, যা "ব্যর্থ কোলাহল, নিরর্থক বিক্ষোভ, শক্তির বৃথা ক্ষয়"কে (৩) গ্রাস করে ফেলে, কেবল তারই বাণী শুনবার সে ক্ষমতা অনুশীলন করতে হবে। এই চিরন্তনীর বাণী—এই নিয়ত নৈঃশব্দ্য—সবই অন্তরের অন্তরে বাহিত হয়, কিন্তু প্রত্যেকেই এই আন্তরশক্তি সম্বন্ধে সজাগ নয় এবং এ ছাড়াও "নীরবতা ক্রমে আরো গাঢ় হয়ে চলেছে ; তোমার সঙ্গে আমাদের ঐক্য যতই পূর্ণ হোক না, যতদিন না আমরা শরীরের দিক দিয়ে অপূর্ণ জগতের অঙ্গীভূত, ততদিন তোমার সঙ্গে আমাদের ঐক্য চিরকালই সুদূর হতে সুদূরতর করে ধরা যেতে পরে।"(৪) মানবজাতিকে পূর্ণ করতে সক্ষম হবার পূর্বে শ্রীমা নিজেকেই পূর্ণ করে তুলবেন . এ কারণেই শ্রীমার প্রার্থনা তীব্রভাবে বারংবার পুনরুচ্চারিত হয়, "হে ভগবান, আকুল কণ্ঠে তোমায় আমি ডাকি : আমাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড করে তোল, যাতে সকল বেদনা পুড়ে যায়...আমায় রূপান্তরিত কর শুদ্ধ প্রেমের, অপার করুণার দীপ্ত অগ্নি-কুণ্ডে।"(৫) ভগবান যিনি অবশেষে এখানে প্রমূর্ত, তিনিই "বেদনাময় দ্বন্দ্বসঙ্কুল জগৎকে সমগ্রভাবে তুলতে পারেন সম্মিলনের ও শান্তির জগৎ করে" ।(৬)

তখন শ্রীমা যে শুধু দুর্বোধ্য জগতের গুরুভার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সজাগ ছিলেন তা নয়, এমন কি তাঁর নিজের অদৃষ্ট সম্বন্ধে ও জগতের ভার লাঘব ও সমূলে উৎপাটিত করার যে প্রধান প্রয়োজনীয়তা তার সম্বন্ধেও সচেতন। যদি শ্রীমা দুঃখের মানুষী বিগ্রহের সাথে পৃথিবীর অতিকায় যাতনার অংশ গ্রহণ করেন, তাহ'লে তিনি কোনো অংশে তাঁর অযোগ্য 'দিব্যদ্রষ্টা সহকর্ম্মিণী' হবেন না, এবং জীবন জ্যোতি ও প্রেমকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা করবেন। এই স্মরণীয় অংশ থেকেই অনুমান করা যায় যে শ্রীমা ঐ মৈত্রগতির জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন।

---

1 Prayers and Meditations P. 65
2 Sri Aurobindo, Synthesis of Yoga—Part I, P. 1
3 Prayers and Meditations P. 33
4 Prayers and Meditations Pp. 39-40
5 Prayers and Meditations P. 48
6 Prayers and Meditations P. 51

"আমার মনে হয় দিনে ও রাত্রে অনেকবার আমি—অর্থাৎ আমার সমস্তখানি চেতনা, আমার হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, হৃদয় যেন আর যাহা দেহযন্ত্র মাত্র নয়, এমন কি কোন ভাবপ্রবণতাও নয়—সে হয়েছে দিব্যপ্রেম, নৈর্ব্যক্তিক, শাশ্বত। এই পরম প্রেমে পরিণত হয়ে গিয়ে আমি অনুভব করি সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্ববস্তুর হৃৎকেন্দ্রে আমিই ত রয়েছি, তখনই আমার মনে হয় যেন আমার বিস্তৃত বাহুদুটি নিরন্তর প্রসারিত হয়ে চলেছে, বিশ্ব হতে বিশ্বান্তর আমার বক্ষের মধ্যে সকল জীবকে সংহত, শ্রেণীবদ্ধ, নিমজ্জিত করে অসীন স্নেহে ঘিরে রেখেছে...বাক্য দুর্ব্বল ও অক্ষম।"(১)

সত্যই এরূপ অলৌকিক দর্শন, এরূপ ইঙ্গিত ও জাগ্রত সত্যকে নিছক কথার ভাষায় ধরার চেষ্টা নিরর্থক—

"হায় বৃথাই অশক্ত কথা, দুর্বল পক্ষ, বৃথা তার চেষ্টা,
বৃথাই চেষ্টা এমন স্বর্গীয় দৃশ্যের বর্ণনা দিতে" (২)

ক্ষণস্থায়ী ও আপেক্ষিক পৃথিবী একদিন না একদিন চলে যাবে,—যাচ্ছেও; কিন্তু যতই অপসৃত হবে ততই অনবধারণীয় অভিনব দীপ্তি বিকশিত হয়ে উঠবে ও ঐ শাশ্বত শক্তি ও অভিনব সান্নিধ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মর্ত্ত্য "অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করবে তার সত্যকার লক্ষ্য সব কি, তোমাকে পূর্ণভাবে লাভ করে জীবনে শান্তি ও সুসঙ্গতি ফুটিয়ে ধরে।" (৩)

(৪)

১৯১৪ সালের ৩রা মার্চ শ্রীমা লিখলেন, "আমার যাত্রার দিন যত নিকটে আসছে তত আমি একটা শান্ত সমাহিত চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছি।"(৪) তিনি শীঘ্রই এক দীর্ঘ জলযাত্রা করবেন—"তোমার সান্নিধ্যে অভিষিক্ত এই নিস্তব্ধ ঘরখানিতে এই টেবিলে বসে লিখতে আর পারব না।" (৫) এবং তাই যে সব 'তুচ্ছ জিনিস' শ্রীমাকে ঘিরে রেখেছে সহৃদয় প্রীতি নিয়ে তাদের দিকে তিনি দৃষ্টি ফেরান এবং বাহির থেকে তাঁকে যে আনন্দ তারা দিয়েছে তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আর ভবিষ্যতের সমচিত্ততা নিয়ে সম্মুখীন হন—

---

1 Prayers and Meditations P. 62
2 Giles Fletcher
3 Prayers and Meditations P. 38
4 Prayers and Meditations P. 66
5 Prayers and Meditations P. 67

—"আমার একমাত্র ইচ্ছা এ যেন হয় একটা নূতন আন্তর যুগের আরম্ভ"। (১) তিনদিন পরেও যখন জেনেভা সহরে শ্রীমা তখনও এক বিচ্ছেদের যাতনা ভোগ করলেন এবং বিভ্রান্ত হলেন এই ভেবে যে এই ভাবাবেগ বালসুলভ কিনা। কোনো কোনো দিক থেকে তা সত্যই; কিন্তু তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করেন: "এই আসক্তি, এই ব্যক্তিগত স্নেহ মানুষের একটা অজ্ঞানতঃ চেষ্টা নয় কি যাতে সে যাহাতঃ যতদূর সম্ভব উপলব্ধি করতে পারে সেই মূল একত্ব যার দিকে সে কিছুমাত্র না জেনেই ক্রমাগত চলেছে।" (২)

"কাপানারু" জাহাজে এক অনির্ব্বচনীয় সাচ্ছন্দ্যের ভাব, ইষ্টদেবতার সচেতন আবির্ভাব ও অভয়রূপের পরিবেশ ছিল; শ্রীমার আশ্লুহাপূর্ণ প্রার্থনা এখনও পূর্ব্বেরই মত তাঁরই উদ্দেশ্যে উঠে চলেছে,"তোমার প্রেমকে জীবনে ফলিত করবে, চারদিকে ছড়িয়ে দেবে এত প্রবলবেগে এত সাফল্যের সঙ্গে, যে যারাই আমাদের সংস্পর্শে আসবে তারা সকলেই পাবে বলবীর্য্য, নবজীবন, জ্ঞানের আলো। শক্তি চাই—জীবনকে নিরাময় করবার জন্যে, দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি লাভের জন্যে, শান্তি আর অটল বিশ্বাস গড়বার জন্যে, মনস্তাপ মুছে ফেলে তার স্থানে সেই একমাত্র সত্যকার সুখ স্থাপন করবার জন্যে যা রয়েছে তোমার মধ্যে, যার নাই নির্ব্বাণ...।"(৩) পরদিন প্রত্যূষে—৮ই মার্চ ১৯১৪ তারিখে—শ্রীমার কাছে মনে হল যেন তিনি বোধ হয় "জাহাজের সকল যাত্রীকে গ্রহণ করেছেন, সমান ভালবাসা দিয়ে তাদের ঘিরে রেখেছেন।" (৪) শ্রীমার অস্বাচ্ছন্দ্য ভাব আর নেই—তিনি জাহাজটির মধ্যে সম্পূর্ণ নিজের বাসস্থানেরই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন যা তাঁর কাছে মনে হ'ল এ যেন "অপূর্ব্ব শান্তির ধাম, পুণ্যমন্দির তোমারি পূজায় সে যেন চলেছে।" (৫) তারপর দুদিন পরে এক মহান উপলব্ধি তিনি পেয়েছিলেন এবং এই উপলব্ধি অপূর্ব্বসুন্দর ও অনুপ্রাণিত ভাষায় তিনি সংক্ষেপে লিখলেন

"রাত্রির নীরবতায় তোমার শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করে, আমার হৃদয়ের নীরবতার মধ্যেও তোমার শান্তি সর্ব্বদা বিরাজ করে। আর যখন এই দুটি নীরবতা এক হয়, তখন তোমার শান্তি এত শক্তিমান হয়ে ওঠে যে কোন বিপদই আর বাধা দিতে পারে না। এমন সময়ে আমার মনে হল তাদের কথা যারা জাহাজের উপর জেগে পাহারা দেয় পথ নির্ব্বিঘ্ন রাখবার জন্যে, হৃদয় আমার কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল, আমি কামনা করলাম যাতে তাদের অন্তরে শান্তি নেমে আসে, পায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তারপর মনে হল তাদের সকলের কথা যারা একান্ত আত্মবিশ্বাসী ভাবনাহীন নিশ্চেতনার ঘুমে নিমগ্ন, তাদের দুঃখ দৈন্যের জন্য চিন্তিত হয়ে

---

1 Prayers and Meditations P. 67
2 Prayers and Meditations P. 68
3 Prayers and Meditations Pp. 69-70
4 Prayers and Meditations P. 70
5 Prayers and Meditations P. 71

তাদের যে প্রসুপ্ত দুঃখ কষ্ট ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে সেজন্যে করুণার্দ্র চিত্তে আমি কামনা করলাম যাতে তাদের হৃদয়ে তোমার শান্তির একটুখানি অন্তত স্থান পায় ; আধ্যাত্মিক জীবন যেন তাদের মধ্যে ফুটে ওঠে, আলো এনে দূর করে যেন অজ্ঞান অন্ধকার। তারপর আমার মনে হল সেই সব জীবের কথা যারা এই বিপুল সাগরের বুকে বাস করে, কামনা করলাম যাতে তাদেরও উপর প্রসারিত হয় তোমার শান্তি। আমার মনে হল তারপর তাদের কথা যাদের ফেলে এসেছি বহুদূরে, যাদের প্রীতি এখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, গভীর স্নেহভরে তাদের জন্যে প্রার্থনা করলাম যাতে তারা পায় তোমার সচেতন ও স্থায়ী শান্তি, তোমার শান্তির পরিপূর্ণতা, তাদের গ্রহণসামর্থ্যের অনুপাতে। তারপর আমার মনে হল তাদের কথা যাদের কাছে আমরা চলেছি, যারা বালসুলভ কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যারা অজ্ঞানের অহংকারের বশে, হীন স্বার্থের জন্য লড়াই করে চলে ; তাদের হয়ে, তীব্রভাবে বিপুল আপ্লুতা নিয়ে আমি প্রার্থনা করলাম যাতে তারাও লাভ করে তোমার শান্তির পরিপূর্ণ জ্যোতি। তারপর আরও আমি চিন্তা করলাম তাদের কথা যাদের আমি চিনি, যাদের আমি চিনিনা ; যে অখণ্ড জীবনধারা পরিস্ফূর্ত্ত হয়ে চলেছে, যা-কিছু রূপের পরিবর্ত্ত ন করেছে, যা রূপ গ্রহণ করেনি এখনো, এ সকলের কথা, আরো তাদের কথা যাদের আমি চিন্তায় আনতে পারিনি, আবার যা-কিছু আমার স্মৃতির মধ্যে জাগ্রত রয়েছে, আর যা-কিছু বিস্মৃত হয়েছি—এদের সকলের জন্যে গভীর সমাহিত চিত্তে। নীরব আরাধনায় তোমার শান্তি আমি ভিক্ষা করলাম।" (১)

শান্তি...শান্তি...আর শান্তি—এ এক "রহস্যময় প্রীতিবাক্য" বারংবার স্নেহাদরের মত যাদুমন্ত্রের মত পুনরাবৃত্ত হয়। হপকিন্‌স্ বলেন, "খণ্ড শান্তি হল নঞর্থক শান্তি" এবং সেইজন্য অতীতের দান হিসাবে প্রাপ্ত পৃথিবীর অশুভ, অপবিত্রতা ও আন্তির যে বিরাট সমস্যা তা হৃদয়ঙ্গম ও সমাধান করতে পারে একমাত্র চিরস্থায়ী শান্তি। "দিব্য-দ্রষ্টা সহধর্ম্মী" শ্রীমা যে শান্তির কামনা করেন তা একদিন আসবেই এবং এই অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করবেই।

সেই "নীরব ও নির্ম্মল সব রাত্রি" চলতে লাগল, তখনও আনন্দানুভূতিও স্থায়ীভাবে থাকল অটুট, এক নামহীন শক্তি হল তাঁর প্রাণ এবং তাঁকে ঘিরে ধরল এক নীরব স্তব্ধ যা আবার তাঁর প্রতিটি গতিকে যেন নব আলোয় উদ্দীপিত করে তুলল। নীরব স্তুতির মত, মৌন আরাধনার মত, শ্রীমার অভীপ্সা উঠে চলে তাঁর দিকে এবং শ্রীমার হৃদয় উদ্ভাসিত করবার জন্য তাঁর দিব্য প্রেমকে ডেকে আনেন। সত্যই তিনি যেন এক অনুপম যাদুকর "যিনি সব জিনিস রূপান্তরিত করেন, কদর্য্য হতে তুলে ধরেন সৌন্দর্য্য, অন্ধকার

---

1 Prayers and Meditations P. 71-73

হতে আনো, পঙ্ক হতে নির্মল মন, অজ্ঞান থেকে জ্ঞান, অহংকার থেকে মৈত্রী।" (১) এই যাদুকর কথার কাছে শ্রীমা খুসী হয়েই আনত হলেন এবং দিব্য রূপান্তরের যত সূক্ষ্ম যন্ত্র, তাদের সঞ্চালন করতে শিক্ষা করলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের অনপনতার কোনো তুলনাই হয় না এই "পন্নাবিদ্যা"র সাথে যা শুধু হ'ল "তোমার সঙ্গে একীভূত হওয়া, তোমারই উপর নির্ভর রাখা, তোমার মধ্যে বাস করা, তুমিই হয়ে যাওয়া—তখন আর অসম্ভব বলে কিছু থাকে না, কারণ সে-মানুষ তখন প্রকাশ করে তোমার সর্ব্ব-শক্তিমত্তা।" (২) ভগবানের সঙ্গে এরূপ পূর্ণ একত্ব সহজসাধ্য মোটেই নয়। এ পথ দীর্ঘ—সুদীর্ঘ। কিন্তু শ্রীমা লিখলেন "এই হল একটা জিনিস যা আমি আশা করেছি ভারতে এসে আমার লাভ হবে।" (৩)

ফরাসী ভারতের পণ্ডিচেরীই ছিল শ্রীমার গন্তব্য-স্থান এবং ২৯শে মার্চ ১৯১৪ সালে বঁসির পল রিশারের সঙ্গে তিনি এখানে উপস্থিত হলেন। শ্রীমা তাঁর জলযাত্রার সময়ে প্রতিক্ষণেই উপলব্ধি করলেন ঈশ্বরের "দিব্য হস্তের পরিচালনা" আর তিনি দেখলেন তাঁর বিধান প্রকাশ হয়ে চলেছে সর্ব্বত্রই (৪) এবং তাঁর দিব্য-বিধানের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে ও তাকে বিনাগ্রনে ও যুগপৎভাবে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হলেন। এখানে এই পণ্ডি-চেরীতে কি সম্ভাবনা নিহিত, কি এক বিরাট দিগন্ত তাঁর সম্মুখে প্রসারিত! তাঁর অপ্রতিম সান্নিধ্যের পূর্ণ চেতনার মধ্যে শ্রীমা তাঁর অবিচল দৃষ্টি ও নির্বিচল বিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফেরালেন।

---

1 Prayers and Meditations P. 80
2 Prayers and Meditations P. 7
3 Prayers and Meditations P. 85
4 Prayers and Meditations P. 87

মহামানবের সাগরতীরে

(শ্রীঅরবিন্দ অবলম্বনে)

সমৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

বহুদিন যাবৎ ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত বোলতে আমরা জানি খাইবার-বোলান পাস, যার রক্ষার জন্যে প্রচণ্ড আয়োজন। কিন্তু এমন দিন ছিল এককালে যখন ভারতবর্ষে ঢোকবার সদর দরজা ছিল খাইবার-বোলান ছাড়িয়ে, প্রায় পারস্যের পূর্ব সীমানায়, হিন্দুকুশের দক্ষিণপ্রান্তে। তখন ভারতবর্ষে ঢুকতে হোলে বাহ্লীক কাম্বোজ গান্ধারদের এলাকা ডিঙিয়ে আসতে হোত। তারা ছিল পার্বত্য উপত্যকার বাসিক, খাইবার পাস ছিল তাদের খিড়কি-দোর।

ইতিমধ্যে, খৃঃপূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইরাণের রাজা সাইরাস স্থাপন কোরলেন বিরাট এক সাম্রাজ্য, পশ্চিমে নিশর ও পূর্বদিকে ভারতের সিন্ধুনদ হোলো যার সীমান্ত। সাইরাসের পরবর্তী সম্রাট্ ডেরিয়াস হয়তো সিন্ধুনদ পেরিয়েও থাকবেন—এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানা নেই। তবে এটা ঠিক যে খাইবার পাস ততদিনে বিদেশীর হাতে চোলে গেছলো। তার মানে বিদেশীর আক্রমণ থেকে ভারত রক্ষা কোরতে পাঞ্জাবের পঞ্চনদই হোলো তখন প্রধান ভরসা।

দুশো বছর পরে যখন আলেকজাণ্ডার এলেন ভারতবর্ষ জয় কোরতে, তখন খাইবারের ওপারে ছোট ছোট রাজ্য গোড়ে উঠেছে পারস্যের ভগ্নস্তূপের ওপর। তাদের ক্ষমতা ছিল না গ্রীক্-সম্রাটের গতিরোধ করে। তিনি প্রথম সত্যিকার বাধা পেলেন ঝিলাম নদীর ধারে বীর পোরাসের কাছে। তারপর প্রত্যেকটি নদী পেরুতে গ্রীক বাহিনীকে রীতিমত বেগ পেতে হোয়েছে। শেষ পর্যন্ত যখন বিপাশার ধারে এসে গ্রীকেরা বোলে বোসলো আর যাবে না তাতে বেশ বোঝা গেল পাঞ্জাবের জলহাওয়া গ্রীকদের তেমন পছন্দ হয় নি।

আলেকজাণ্ডারের গতিপরিবর্তনের কিন্তু আর একটা কারণ উল্লেখ করেন সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিকেরা। শোনা যায় খবর রোটেছিল গঙ্গার ধারে যে নন্দরাজাদের বাস তাদের হাতিগুলো নাকি বেজায় বিদঘুটে, তারা পক্ষাতিক গ্রীক সৈন্যদের যথেষ্ট সম্মান দিতে নাও পারে। বিশ্বাস করা অসঙ্গত নয় যে শেষ পর্যন্ত বোধহয় হাতির ভয়েই বিশ্ব-বিজয়ী বীর দেশছাড়া হোলেন।

আলেকজাণ্ডার ভারত ত্যাগ কোরলেন, তাঁর পাঞ্জাব বিজয়ের চিহ্নও প্রায় মুছে গেল বছর কয়েকের মধ্যেই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষকে একটা বেশ বড় রকম শিক্ষা দিয়ে গেলেন। শিক্ষাটা হোচ্ছে এই যে নন্দরাজাদের হাতিশালে যতই না কেন হাতি থাকুক, শেষ পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা কোরতে হোলে চাই রাজনৈতিক ঐক্য। কথাটা কার মাথায় প্রথম ঢুকেছিল আজ দুহাজার বছর পরে সঠিক বলা শক্ত। এটা অবশ্য ঠিকই যে তখনকার যুগে স্বদেশী লোকের অভাব ছিল না। মহাভারতে তার নিদর্শন আছে, যেমন শ্রীঅরবিন্দের বিদুলার কাহিনীতে। গ্রীক ঐতিহাসিক যাঁরা আলেকজাণ্ডারের কথা লিখে গেছেন তাঁরাও বোলে গেছেন যে অন্তত: উত্তরপশ্চিম সীমান্তের ভারতবাসীরা দেশের মাটিকে ভালবাসতো। কিম্বদন্তী বলে কুটিল রাজনৈতিক চাণক্যই প্রধানত: দায়ী মৌর্য্যসাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের জন্যে। হয়তো হোতেও পারে। মুদ্রারাক্ষস নাটকের যদি কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে তাহোলে এতদূর অবধি বলা যায় যে চাণক্যের মতে সায় দিয়েছিল তখনকার দিনের বিস্তর ছোট বড় রাজারা।

নন্দবংশ ধ্বংস হোলো, বৃষলরাজ চন্দ্রগুপ্ত হোয়ে বোসলেন ভারতের ঐতিহাসিক যুগের সর্ব্বপ্রথম সম্রাট্। একছত্র কথাটা হয়তো খাটবে না, কেননা দক্ষিণ-ভারত তখনও খানিকটা স্বাধীন ছিল। কিন্তু বাকী দেশটা বোধহয় সম্পূর্ণ এসে গেল চন্দ্রগুপ্তের হাতে। এতদিনে বুঝি শ্রীকৃষ্ণের আশা পূর্ণ হলো। কিন্তু তা ঠিক নয়। কোথায় যেন একটা গোল রোয়ে গেল। মৌর্য্যদের ইতিহাসে তো কোথাও অশ্বমেধের উল্লেখ পাই না। রাজা অশোক কিছুদিন খুব "ধম্ম ধম্ম" কোরে নেতে উঠেছিলেন সবাই জানে, কিন্তু তিনি নিজেই তো পাথরের গায়ে খুদিয়ে গেছেন তাঁর মাথায় ধর্ম্মবিজয়ের কথা আসে নৃশংসভাবে কলিঙ্গদের মারবার পরে। অশোকের কলিঙ্গবিজয় যদি সাম্রাজ্যস্থাপনের নমুনা হয় তাহোলে তাঁর বাপঠাকুরদাদার আমলের রাজ্যজয় যে খুব নির্বিঘ্নে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে হোয়েছিল তা মনে হয় না। মুদ্রারাক্ষসের চাণক্য বা অর্থশাস্ত্রের কৌটিল্য কেউই দরকার পড়লে অস্ত্রব্যবহার কোরতে ছাড়বেন না, এটাই স্বাভাবিক।

অস্ত্রব্যবহারের ফলে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হোলো। উত্তরপশ্চিম সীমান্তে আলেকজাণ্ডারের ভূতপূর্ব্ব সৈন্যাধ্যক্ষ সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তের কাছে হার মানলেন, গোটাকয়েক হাতির বদলে আফগানিস্থানের বেশ খানিকটা ছেড়ে দিয়ে পারস্যে ফিরে গেলেন, গ্রীকদের ভারতবিজয়ের আশা অন্তত: কিছুদিনের জন্যে প্রত্যাহৃত হোলো। বৈদিক যুগের চক্রবর্ত্তী রাজা, মহাভারতের ধর্ম্মরাজ্য, এসবের বুঝি আর প্রয়োজন রইল না। জোর যার মুলুক তার, এই বুঝি হবে ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ।

কিন্তু তা হবার নয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা এত অল্পে সন্তুষ্ট নন। ক্ষণিক উত্তেজনায় সাময়িক প্রয়োজনে ভারতীয় রাজা বা সম্রাট্ অ-ভারতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন কোরতে পারেন, কিন্তু তা কখনও টেকসই হবে না, দেশের লোক বেঁকে বোসবে, সাম্রাজ্য যাবে ভেঙ্গে, আবার

নতুন কোরে গোড়ে তুলতে হবে। এই হলো ভারত-ইতিহাসের সনাতন ধারা, মৌর্য্যদের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ভারতকে যে এক কোরবে তার গায়ের জোর যত না থাকুক হৃদয়ের তার চেয়ে ঔদার্য্য বেশী দরকার। স্বাধীনতা ভারত-বাসীর রক্তজাগত। বিদেশীর উৎপীড়ন ও স্তোকবাক্যে বা দেশী সম্রাটের হাতির জোরে কিছুদিনের জন্যে বশ্যতা স্বীকার কোরতে পারে, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তকে একধর্ম্ম-রাজ্যপাশে বাঁধবার একমাত্র উপায় হোচ্চে রাখীবন্ধন। তখনও ছিল, এখনও তাই।

এই সোজা কথাটা বুঝতে আমাদের রাজারাজড়াদের দুহাজার বছর লেগে গেছে। যত সাম্রাজ্য গোড়ে উঠে আবার কিছুদিন পরেই পোড়ে গেছে তারা সবাই ভেবেছে গায়ের জোরই বুঝি সব চেয়ে বড় জোর। দেশের লোকে যেন নিয়েচে যতদিন বিদেশীর আক্রমণের ভয় ছিল, তার পরেই সাম্রাজ্যপতন। কতবার যে এই একই ব্যাপার ঘোটলো তার সীমা নেই। মাঝে মাঝে তাই মনে হয় পণ্ডিতরা বৃথাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে এত মোটা মোটা বই লিখে নিরীহ পরীক্ষার্থীদের উদ্বিগ্ন কোরছেন। বিদেশীর আক্রমণের ভয়ে কোনো রকমে তোড়াতাড়া দিয়ে এক একটা কোরে সাম্রাজ্য গোড়ে উঠচে, যেই আক্র-মণের ভয় আর রইল না অমনি আবার যে কে সেই—সাম্রাজ্য গেল ভেঙ্গে, যে যার নিজের নিজের ছোটখাটো রাজ্য নিয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে মন দিলো। আবার এলো যার একদল বিদেশী, সাড়া পোড়ে গেল "দীঘিপার একজোট হও, নয়তো রক্ষে নেই" এই তো ভারতের ইতিহাস।

ঐতিহাসিকরা বোলে থাকেন মৌর্য্যদের রাজ্যনাশের জন্যে প্রধানতঃ দায়ী অশোকের ধর্ম্মচিন্তা—অশোক নাকি অহিংসনীতি অবলম্বন কোরে সাম্রাজ্যের বাঁধন আলগা কোরে দিয়েছিলেন। কথাটা হয়তো খানিকটা সত্যি, কারণ এটা ঠিক যে অশোকের কিছুদিন পরেই উত্তর পশ্চিম সীমান্তটা আবার সজাগ হোয়ে উঠেছিল ব্যাকট্রিয়ার ছোটখাটো গ্রীক-রাজাদের উৎপাতে। গ্রীকরা শুনেচি উত্তর-ভারতে অনেকদূর পর্য্যন্ত হানা দেয়। তার প্রমাণ রোয়েচে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে—"অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্, অরুণৎ যবনঃ মধ্যমিকাম্"—যবনরা সাকেত (অযোধ্যা) এবং মধ্যমিকা (হয়তো চিতোরের কাছে কোন শহর) ঘিরে ফেলেছিল সম্প্রতি। শোনা যায় সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ গায়ের জোরে শেষ মৌর্য্য সম্রাটকে পদচ্যুত কোরে নিজে সিংহাসন দখল করেন, খুব সম্ভব যবনদের তাড়াবার জন্যে। কালি-দাসের মালবিকায় উল্লেখ আছে যুবরাজ অগ্নিমিত্র সিন্ধুনদের ধারে যবনদের হারিয়ে দিয়েছেন। তার মানে মৌর্য্যদের গদীতে শুঙ্গরা বোসতে পেলেন গ্রীকদের দৌলতে।

এই সময়টা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা সঙ্কটের সময়। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে তখন অনেকগুলো বর্ব্বর জাতি মারামারি কোচ্চে ভারতবর্ষে ঢোকবার জন্যে। রাস্তা খোলা, কারণ খাইবার বোলান ভারতের হাতছাড়া, পাঞ্জাবের নদী আর সিন্ধুর মরুভূমি পেরুতে পারলেই হোলো। শক, পল্লব, কুশান, পর পর এই তিনটে দল ভারতবর্ষে ঢুকে

পোড়লো. ছড়িয়ে গেল অনেকদূর—পশ্চিমে গুজরাট বালওয়া, উত্তরে গঙ্গা যমুনার দোয়াব অবধি। বোধ হয় এদের ধাক্কা সামলানোর জন্যেই চন্দ্রগুপ্তর গড়া সাম্রাজ্যটা আরও শ' দুতিন বছর টিকে গেল, কণ্বংশ এবং অন্ধভৃত্য রাজাদের হাতে। ম্লেচ্ছরা কিন্তু তখনও যায়নি, কারণ পুরাণের বিবরণে দেখতে পাই তাদের অত্যাচারের কথা। শেষ পর্যন্ত গুপ্তবংশের রাজারা এসে দেশটাকে রক্ষা কোরলেন। গুপ্তদের আমলেও হূণরা এসে বিস্তর জ্বালাতন কোরেচে। এমন কি হর্ষবর্দ্ধনের দাদা রাজ্যবর্দ্ধন হূণদের হাতে মারা পড়লেন এমন কথাও বাণভট্টকে বোলতে হোয়েচে।

হর্ষবর্দ্ধনের সময় থেকে শ' চারেক বছর পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিম সীমান্ত ছিল একরকম চুপচাপ। ইতিমধ্যে আরবরা সিন্ধুপ্রদেশ দখল কোরে ফেলে বটে, কিন্তু তারা রাজপুতদের ভয়ে আর এগুতে সাহস করেনি। এই ছিল একটা নতুন সুযোগ ভারতে ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের। কিন্তু সে সুযোগ কেউ নিল না। পাল, প্রতীহার, রাষ্ট্রকূট বংশের বড় বড় সব মহাবলীরা যে যার নিজের নিজের রাজ্য বাড়াবার মতলবে বৃথা মারামারি কোরে দিন কাটালেন। ভারতে না হোলো কেউ একচত্র সম্রাট, না এলো ঐক্য। চারশো বছর পরে যখন হঠাৎ একদিন আফগানিস্থানের মহম্মদ গজনী এসে ভারতের মন্দির লুট কোরে নিয়ে গেল, তখনও কারুর হুঁস নেই। ভারত তখনও খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত, আপোসে লাঠালাঠি চোলেচে ঠিক আগেরই মত। পৃথ্বীরাজ নিয়ে চোলেচেন সংযুক্তাকে চুরি কোরে, জয়চাঁদ সাহায্য চাইচেন মুহম্মদ ঘোরীর।

মুহম্মদ ঘোরীর আক্রমণে বোঝা গেল ওপর থেকে চাপ না পোড়লে ভারত এক হবার নয়। রাজপুত বাধা দিল, পাড়াগাঁয়ের জমিদাররা বোললো খাজনা চাও তো লড়াই করো, বিজয়নগরের রাজারা মুসলমানকে পথ ছাড়লো না। তবুও তুর্কী সুলতানরা ভারতের সম্রাট হোয়ে বোসলো, অন্ততঃ শ' দেড়েক বছরের মতন। তারপর আবার যে কে সেই। প্রাদেশিক রাজারা নামে ছিল মুসলমান, যারা খাঁস তুর্কী তাদের গায়েও ভারতের হাওয়া লেগেচে। ফল হোলো এই যে চিরপ্রথা মত ভারত আবার ভেঙ্গে গেল ছোট ছোট রাজ্যে, দিল্লীর সুলতান শেষ পর্য্যন্ত রইলেন পালিক দিল্লী থেকে পালম অবধি, যেখানে এখন বিমান-ঘাঁটি।

মোগলদের আমলেও প্রায় তাই। আকবর ভেবেছিলেন কিছু হোমরাচোমরা রাজপুত সর্দারদের পাঁচ হাজারী মনসবদার বানিয়ে দিলেই বুঝি তাঁর সাম্রাজ্যটা টিকে যাবে। হয়তো খানিকটা সুবিধে হোতো যদি তিনি তাঁর আদুরে নাতি খুররমকে একটু হিন্দুয়ানী শেখাতেন। তা তিনি শেখান নি, তাই শাজাহানের সময় থেকেই মোগল সাম্রাজ্যে ঘুণ ধোরলো। বাদশা আলমগীর এসে আকবরের তৈরী ইমারত ধূলিসাৎ কোরে দিলেন। এমন একদিন ছিল যখন হিন্দু প্রশস্তিকার মোগল-সম্রাটকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বোলে ফেলেছিল। কতটা পয়সার লোভে বা গুঁতোর ভয়ে জানি না। যদি কথাটা সত্যি সত্যি প্রাণ থেকেও

বলা হোয়ে থাকে তবুও বেশীদিন অতবড় বিশ্বাস রাখা শক্ত হোতো। আকবরের "দীন-ইলাহী" বাদশাকে প্রায় ভগবানের কোঠায় ফেলবার মতলবে ছিল "আল্লাহ্ আকবর" ঘোষণায় শ্লেষের ইঙ্গিতে। গোল বাধালো মুসলমান মোল্লারা। তার পরের বাদশা জাহাঙ্গীর আফিংএর নেশায় মশগুল থাকতেন, শাজাহানের সময় ছিল না মোল্লাদের সঙ্গে লড়াই করবার। আলমগীর ঠিক কোরলেন ভারতে হিন্দুর স্থান নেই, দিল্লীশ্বরের মান ঐশ্বর্য্য দুই খুইয়ে বোসলেন গোঁড়ামির অজুহাতে।

প্রশ্ন হোতে পারে, মোগলদের আমলে ইউরোপেও তো ধার্মিক গোঁড়ামির কোনো কমতি ছিল না, তা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্সে জাতীয় ঐক্য এলো কি রকম কোরে? ভারতে নিশ্চয়ই বড় রকম একটা বাধা ছিল। বাধাটা ছিল ভারতের ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকার এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ইউরোপেও পণ্ডিত ছিল, তার ওপরে ছিলেন পোপ। কিন্তু তিন চারশো বছর ধোরে চোলছিল লড়াই, কে বড় হবে, রাজা না চার্চ। শেষ পর্য্যন্ত রাজারই হোলো জিত। ফ্রান্স বা স্পেন যেখানে রোম্যান ধর্ম্ম বজায় রইল সেখানেও পোপকে মেনে নিতে হোলো যে রাজাই নিজের মনোমত লোককে বসাবেন চার্চের বড় বড় পদে, পোপ শুধু জানাবেন তাঁর আশীর্ব্বাদ।

ভারতবর্ষে কোনো দিন পোপ ছিল না—এমন কি বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্য্যের আমলেও নয়। তা সত্ত্বেও দেশের লোক বরাবর মেনে এসেছে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের, বৌদ্ধ ভিক্ষুর। মোগলদের আমল অবধি কোনো রাজার এমন দাপট ছিল না যে পণ্ডিতদের কথায় বাদ সাধে। দেশের লোককে ধর্ম্ম শেখাতে গিয়ে রাজা অশোকের রাজ্য গেল এমন কথাও শুনতে পাওয়া যায়। আকবরের "দীন ইলাহী" রোয়ে গেল এক চটকদার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ("brilliant futility" বোলেছেন শ্রীঅরবিন্দ)। এমন একটা রাজা জন্মালো না যে ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেনরীর মতন বোলতে পারে, "পোপটোপ মানি না, আমিই চার্চের হেড"। একদেশে দুজন রাজা থাকতে পারে না। ভারতবর্ষের লোক রাজাকে দিয়ে এসেছে ট্যাক্স, কিন্তু মনে মনে স্বীকার কোরেছে তাদের যারা মনুর বিধান দিতে পারে। তাই মধ্যযুগের শেষ অবধি ভারতের ভাগ্যে নেশান হওয়া ঘোটে ওঠেনি।

শিবাজী একবার শেষ চেষ্টা কোরে দেখলেন ভারতবাসী একজাতি হয় কি না। ভারতবাসীকে চিনতেন তিনি, তাই প্রথম থেকেই পাড়লেন ধর্ম্মের দোহাই। মুসলমানের হাতে হিন্দুর ধর্ম্ম বুঝি বা আর রইল না, এই হলো তাঁর বুলি। এক কথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুজনেই নেচে উঠলো, বোললে ধর্ম্মের জন্যে প্রাণ দোবো। আর একটা মস্ত চাল চাললেন শিবাজী, বোললেন গাঁয়ের লোকেদের সাহায্য চাই, রাজ্য জয়ের জন্যে, তারা যেন সৈন্যে যোগ দেয়। কথাটার মধ্যে ফাঁকি ছিল না, কারণ ছেলেবেলা থেকে শিবাজী গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে মিশেছেন, তাঁর মধ্যে আভিজাত্য ছিল কিন্তু বড়মানুষী ছিল না। ফল হোলো এই যে দেশের লোক জাতি নির্ব্বিশেষে তাঁর দলে এলো, দেখতে দেখতে গোড়ে উঠলো একরকারাষ্ট্রজাতি।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু গোল বাধলো এইখানেই। শিবাজীর পরে পেশোয়ারা ভাবতে পারলেন না যে নতুন যুগের প্রয়োজন শুধু মহারাষ্ট্রজাতি বা হিন্দুধর্ম রক্ষা দিয়ে মিটবে না, চাই ভারতের জাতি, ভারতধর্ম। গোড়া থেকেই খিটিমিটি লাগলো রাজপুত সর্দার, শিখ জঠার সঙ্গে। ধর্মের নামে, পেশোয়ার নামে আরম্ভ হোলো বর্গীর অত্যাচার। দেশের লোক ভাবলো এর চেয়ে মোগলাই আমল ছিল ভাল, শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে ইংরেজ বণিকের হাতে তুলে দিল ভারতের রাজদণ্ড।

পলাশীর যুদ্ধ থেকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এ্যাক্ট, মাত্র দুশো বছরের ব্যাপার। ইতিহাসের বাপকাঠিতে কিছুই নয় একরকম। কিন্তু এই দুশো বছরে ভারতের যা শিক্ষা হোয়েছে তা দুহাজার বছরেও হয় নি। ভারতবর্ষ এই প্রথম হাড়ে হাড়ে বুঝলো বিদেশীর আধিপত্য বোলতে কি বোঝায়। শক কুশান হূণ তো কবে কোথায় তলিয়ে গেছে এই বিরাট জনসমুদ্রে তার পাত্তাই নেই। মুসলমান এসেছিল বিদেশীর পোষাকে, কিন্তু শ'দুই বছর যেতে না যেতে তারাও হোয়ে গেল ভারতবাসী। মোগলদের পৈতৃক ভিটে ছিলো মোগোরা এলাকায়, বাবরের আমল থেকেই তা হাতছাড়া হোয়ে গেছে। হুমায়ুনকে যখন শের শা'র তাড়ায় পালাতে হয়, তিনি আশ্রয় নিলেন পারস্যের শাহ্ তহমাস্পের কাছে। আকবরের পারস্য-প্রীতি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি বা তাঁর বংশধরেরা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে ভারতের বাইরে তাঁদের "হোম"।

ইংরেজদের আমলে সব পালটে গেল। ইংরেজ এসেছিল ব্যবসা কোরতে, দেশ জয় কোরে সেখানে বসবাস করবার জন্যে নয়। ঘটনাচক্রে হঠাৎ একদিন দেখলো রাজা হোয়ে বোসেচে। তখনও কিন্তু টাকার লোভ যায় নি, ব্যবসা চোলেছে আরও জোরে, দুহাতে লুট হোচ্ছে ভারতের ধনদৌলত। প্রথম প্রথম ইংরেজরাও কিন্তু ভারতবর্ষের আবহাওয়া সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। মোগলদের দেখাদেখি গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বোসে থাকতো সময় পেলেই, দোল দুর্গোৎসবে দিশী বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতো, চট কোরে দেশে ফেরবার নামটি কোরতো না।

আঠারোশো সাতান্ন সালের পর থেকে বেশ একটা পরিবর্তন এলো। কোম্পানীর ব্যবসা গেল, রাণী হোলেন মালিক। সিভিল সার্ভিসের পেয়াদায় দেশ গেল ভোরে। কিছুদিন বাদেই সুয়েজ ক্যানাল খুললো, ছ'মাসের বদলে মাসখানেকের মধ্যে এসে গেল বিলেত। হোমের মূল্য দারুণ বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে বিলেতের অভিজাতশ্রেণী সাদা চামড়ার গুরুভার (white man's burden) সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে উঠেছেন, ডিজরেলী গ্ল্যাডষ্টোনের সাম্রাজ্যবাদের তাড়ায় বিশ্ব চীন পারস্যের লোক সচকিত। ভারতবর্ষই বা বাদ যাবে কেন। স্বদেশবিদ্বেষী শিক্ষিত কেরানীর কল খুললো ইউনিভার্সিটিতে, চাকরি দেওয়া হোলো ডেপুটিগিরি অবধি ব্রাহ্মণপুত্র নির্বিশেষে, বিলিতি ইন্‌স্পেক্টারের হাতে এলো স্কুলের টেক্সটবুক কমিটির ভার। তা সত্ত্বেও পাছে ভারতবাসী স্বদেশী হোয়ে

ওঠে তাই Arms Act দিয়ে তলোয়ার বন্দুক কেড়ে নেওয়া হোলো. Press Act তার নিল খবরের কাগজের, ন্যাশনল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত কোরলেন রিটায়ার্ড স্কচ্ সেক্রেটারী হিউন, যাতে দেশের কর্ত্তাব্যক্তিরা কোলাহল কোরে বড়দিনটা কাটান, স্বাধীনতার কথা ভাববার সময় না পান। টাকা পয়সার দিক থেকে দেশের দুর্দ্দশা বেড়েই চোললো, ইতিহাসের সাক্ষী রইল Famine Commission.

এক হিসেবে ভালই হোলো, দেশের লোক ক্রমশ: বুঝতে শিখলো বিদেশী শাসন জিনিসটা কি, স্বাধীনতার প্রয়োজন কোথায়। জাতীয় ঐক্যের পথে অনেকগুলো বাধাবিঘ্ন ভেঙ্গে গেল বিদেশীর আধিপত্যে,—যেমন ভাষার ব্যবধান, জাতিভেদ, প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা। বাইরের জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোলো ইংরেজের মারফতে, নেশান হাইডিয়াটা ভারতও বেনে নিলো।

স্বাধীন ভারতের সম্পূর্ণ ঐক্য যেদিন হবে সেদিন বোঝা যাবে সমগ্র জগতের ঐক্যের দিন এগিয়ে আসচে। ভারতের মহামানব যদি স্থায়ী ঐক্য স্থাপন কোরতে পারে নিজের মধ্যে, স্বাধীনতার ভিত্তিতে, তাহোলে সমগ্র মানবজাতিও বোধহয় একদিন তা পারবে।

(ক্রমশ)

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[দ্বিতীয় পাদ—সম্যক্-জ্ঞানযোগ]

১১

আত্মার বিভাব

চেতনাকে বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে জগৎকে জানছি—এই হল জ্ঞানের প্রথম ধাপ। এটা প্রাকৃতভূমির সত্য। চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করে যে জানছে তাকে জানছি—এই হল তার পরের ধাপ। নিজেকে জানা দিয়ে জ্ঞানযোগের শুরু।

নিজেকে দেখতে গিয়ে প্রথম দেখি নিজের চঞ্চল মনকে। দেখতে-দেখতে দৃষ্টি আরও গভীরে চলে যায়, দেখতে পাই চঞ্চল মনের অধিষ্ঠানরূপে এক অচঞ্চল বোধকে। যেন ঝিকিমিকি তারার পিছনে এক প্রশান্ত পরিব্যাপ্ত আকাশের মহিমা। এই বোধ হল বিজ্ঞান। তাকে জড়িয়ে আছে এক স্বচ্ছ প্রসন্নতা। সব জড়িয়ে এক ঘনিবিড় অস্তিত্বের বোধ। এই হল আত্মবোধ। বিদ্যুদ্‌গর্ভ প্রসন্ন অবিচল অস্তিত্বের বোধ।

শুধু অন্তরাবৃত্তিতেই নয়, জ্ঞানে চেতনার বহির্বৃত্তিতেও এই বোধ অবিচলিতই থাকে। তখন দেখি এ-বোধ শুধু আমারই গভীরে নয়—সবারই গভীরে। 'সর্বা সর্বভূতাত্মা।' শুধু তা-ই নয়, এ-বোধ সব-কিছুরই গভীরে। যাকে বলি চেতনা আর প্রাণ, তার গভীরে তো আছেই, যাকে বলি জড়, তারও গভীরে স্তব্ধ হয়ে আছে এই বোধ। যেমন আমার দেহে আর প্রাণে, তেমনি বিশ্বের জড়ে আর শক্তিতে একই স্নিগ্ধক-চিন্ময় অস্তিত্বের উল্লাস। জড়ে আর শক্তিতে, আমাতে আর বিশ্বে কোনও ভেদ নাই। সবই এক অখণ্ড একরস প্রত্যয়। আমার আত্মকেন্দ্রই বিশ্বেরও নাভি। এই বোধ ব্রহ্মবোধ। আত্মবোধ আর ব্রহ্মবোধে কোনও তফাত নাই। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

অন্তরে-বাইরে এই বোধ, এই বোধ জাগ্রতে-স্বপ্নে-সুষুপ্তিতে, ভাবনায় সঙ্কল্পে কর্মে এই বোধের বিচ্ছুরণ—যোগজীবনের এই লক্ষ্য।

আত্মবোধের পরিব্যাপ্তিতে ব্রহ্মের বোধ। এ-বোধ অদ্বয়। বহুর নিরসনে অদ্বয় নয়, বহুর সমাহারে অদ্বয়। অদ্বয় অধিষ্ঠান, বহু তার বিভঙ্গ। একে আর বহুতে কোনও বিরোধ নাই, বিরোধের কল্পনাটা মনের মায়া। দার্শনিক স্বগতবিরোধের কথা বলেন—যেমন গাছের ডাল-পাতা-ফুল-ফলে। কিন্তু বিরোধ না বলে সেখানে বলা উচিত স্বগত-

বৈচিত্র্য। ডাল পাতা ফুল ফল সব নিয়েই গাছ। আবার সবার মাঝে একই প্রাণ একই রসের খেলা। আত্মা বা ব্রহ্মও এমনি করে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি এবং সার দুইই।

বিভূতিবৈচিত্র্যে শক্তির উল্লাস। আবার এমন ভূমিও আছে, যেখানে এ-উল্লাস নাই। ব্রহ্ম সব হয়েছেন, কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যান নি। সবাইকে ছাপিয়েও তিনি আছেন, আছেন নির্বিশেষ হয়ে। ব্রহ্ম বিশ্বাতীতে নির্বিশেষ, বিশ্বে বিচিত্র, ব্যক্তিতে একক। তাঁর তিনটি বিভাব, তিনটিতে ওতপ্রোত। প্রমাণ আমার আত্ম-চৈতন্যে। চেতনার বিচিত্র বৃত্তি এলে মিলেছে যে-বিন্দুতে, সেখানে আমি একক। আবার আমারই চেতনার এমন ভূমি আছে, যেখানে কোনও বৃত্তিই নাই। বৃত্তিহীন শূন্যতায় আমি একা, বৃত্তিবৈচিত্র্যের বিধৃতিরূপে আমি একক। সর্বাবস্থায় অন্বয় এই আমি এক পরম-আমিরই আ-ভাস। অনুভব গাঢ় হলে দেখি, সেই আমিরই কুক্ষিগত এই আমি।

এই আমি সত্য। কিন্তু কিভাবে সত্য, তা বুঝতে গেলে একটু গভীরে ডুবতে হবে।

* * *

যেমন সত্য আমি আছে, তেমনি আছে মিথ্যা আমিও। একটিকে বলি আত্মা, আরেকটিকে বলি অহং। চঞ্চল মনের কথা বলেছি, বলেছি তারই পিছনে স্থির বোধের কথা। চঞ্চল মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে আমি, সে হল অহং আর স্থির বোধরূপে তার যে অধিষ্ঠান, তা-ই আত্মা।

অহংএর চেতনা আছে, কিন্তু আত্মা চিৎস্বরূপ। দুয়ের মাঝেই চৈতন্য—কিন্তু একটিতে চৈতন্য বহির্বাবৃত্ত, আরেকটিতে অন্তরাবৃত্ত। বাইরে বিষয়কে দেখে অহং, আর আমাকে আমি যখন দেখছি অর্থাৎ বিষয় আর বিষয়ী যখন একাকার তখন আমি আত্মা। এই আত্ম-বোধে চেতনা যেমন ঘনীভূত হয়, তেমনি আবার পরিব্যাপ্তও হয়। ঘনীভূত বিন্দুচেতনার বহু হতে কোনও বাধা নাই। আর পরিব্যাপ্ত চেতনা সব-সময়ই এক। যেমন আকাশে অগণিত নক্ষত্র। তাদের বিন্দুজ্যোতি বহু, কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপ্ত জ্যোতি এক। সাংখ্যের পরিভাষায় বলতে পারি, বহু বিন্দু জ্যোতি বহু আত্মা, আর ব্যাপ্তজ্যোতি এক পরমাত্মা। তটস্থ দৃষ্টিতে তাঁকে বলি ব্রহ্ম, আর ষোলকলায় পূর্ণ পুরুষরূপে যখন দেখি, তখন বলি ভগবান্। ব্যাপ্তজ্যোতিতে ব্রহ্ম পরমাত্মা বা ভগবান যা-ই বলি না কেন, তার অংশভূত বিন্দুজ্যোতি কিন্তু সত্য এবং নিত্য।

একটা কথা এখানে বলে রাখা ভাল, অংশ বলতে কিন্তু টুকরা বোঝায় না, বোঝায় অংশু বা কিরণ। বেদে অংশ বলে একজন আদিত্য ছিলেন। আদিত্যচেতনার পরম প্রকাশ যে-স্বরূপে, তিনি তাঁর সযুক্ এবং সমধর্মা। এই অংশই গীতার 'মমৈবাংশ সনাতনঃ' বা জীবাত্মা অর্থাৎ সত্য এবং নিত্য জীব। ইনি মিথ্যা নন, মিথ্যা হল এরই নকলে যে-অহংএর সৃষ্টি হয় তা-ই। বহু জীব, আবার নিত্য জীব। একত্বই সত্য আর বহুত্ব মিথ্যা, এটা মনে করা ভুল। মিথ্যা হল 'নানাত্ব' অর্থাৎ বহুর মেলায় একের সঙ্গে আরেকের তফাত করাটাই

মিথ্যা। আকাশ জুড়ে একই তারার-আলো, আবার কত তারার ঝিকিমিকি। এর কোনটাও তো মিথ্যা নয়। সবই যে আলো, সবই যে সত্য।

শুধু স্বরূপেই সত্য নয়, প্রকৃতিতেও সত্য। অর্থাৎ শুধু নিত্যেরই সত্য নয়, লীলারও সত্য। গীতায় তাই পুরুষোত্তম বললেন, আমার দুটি প্রকৃতি—একটি পরা, আরেকটি অপরা। অপরা-প্রকৃতির আশ্রয়ে যে ফোটে, সে হল অহং। সে বহু এবং মিথ্যা। আর পরা-প্রকৃতিকে আশ্রয় করে যিনি ফোটেন, তিনি জীবাত্মা। তিনি বহু এবং সত্য। বহুতে তখন কোনও বিরোধ নাই। যেন আলোতে-আলোতে মেশামেশি। সেখানে অভেদের মাঝে ভেদ। তাইতে সম্বন্ধের উল্লাস, লীলার আস্বাদন, জগতের চিন্ময় সত্যতা। ভক্ত তাই বলেন, আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই। কথাটা একদিক দিয়ে সত্য। অনুভব রসবর্জিত নয়, তাতে আস্বাদন আছে। আস্বাদন থাকলেই সম্বন্ধ আছে, ভেদ আছে। কিন্তু সে-ভেদ আলাদা করে না, নিবিড় করে কাছে টানে, এক পরম অভেদে সব ভেদ ডুবিয়ে দেয়। তখন চিনি খেতে-খেতে আমি চিনি হয়ে যাই। আবার চিনি হয়ে চিনি খাই। তখন সবই চিনি, সবই মধুর। মধুর রসে সবই মধুর।

শুধু সমাধির সুষুপ্তিতে বা ধ্যানের স্বপ্নে এ রকম মাধুর্যের অনুভব নয়। এ-অনুভব জাগ্রতের বৈচিত্র্যে। আমার দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় আর মন, আমার ভাবনা, বেদনা সঙ্কল্প আর কর্ম, সবই মধুর, বুলগাংপর্শের অত্যাশ্চর্যমুখে নন্দিত। কিন্তু তাঁর সত্যে সব সত্য, তাঁর চৈতন্যে সব চিন্ময়, তাঁর প্রাণে সব প্রাণময়। সবই তিনি, সবই তাঁর আত্মবিভাবনার (self-formulation) বিচিত্র উল্লাস। তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর-কেউ নাই একমেবাদ্বিতীয়ম্। আর-কিছুই নাই ন কিঞ্চন মিষৎ। বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বিরোধ নাই নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

* * *

অপরা-প্রকৃতির আশ্রিত অহং, পরা-প্রকৃতিকে আশ্রয় করে জীবাত্মভাব, আর পরমা-প্রকৃতির সঙ্গে যুগনদ্ধ পরম-পুরুষ—একের আত্মবিভাবনার এই এক ত্রিপুটী। আবার গীতাতে আরেকটি ত্রিপুটীর কথা আছে—ক্ষরপুরুষ, অক্ষরপুরুষ আর পুরুষোত্তম। সবই পুরুষ : পুরুষ এব ইদং সর্বম্। একই পুরুষ ভূতে-ভূতে বিচিত্র রূপে অভিব্যক্ত : সায়াতিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। তখন তিনি ক্ষরপুরুষ। যেমন তিনি ব্যক্ত, তেমনি তিনি আবার অব্যক্ত ; রূপে-রূপে নিজেকে রূপায়িত করেও তিনি অরূপ : ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য। তখন তিনি অক্ষরপুরুষ। ক্ষরপুরুষ আর অক্ষরপুরুষ আলাদা নন, অথবা দুয়ে কোনও ক্রমপর্যায় নাই। বেদের ভাষায় এ যেন 'অক্ষীয়মাণম্ উৎসং শতধারম্'। একটি অক্ষয় জলাধার, তাহতে শতধারায় জল বয়ে চলেছে। ধারা কাঁপছে, কিন্তু আধার অচঞ্চল। ধারা অশ্রান্ত, আধার অক্ষর। একদিকে শক্তির উন্মেষ, আরেকদিকে নিমেষ। সত্তার নৈস্পন্দ্যে স্পন্দ—যুগপৎ। দুয়ের মাঝে কোনও দ্বিধা নাই, কিন্তু দ্বিধা জাগে মনে।

ক্ষরস্রোতে যখন সে ভেসে চলেছে, তখন অক্ষরের খবর সে রাখে না। আবার অক্ষরের মাঝে স্থিত হতে গিয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে, ক্ষর তখন তার কাছে বিলুপ্ত। তাই একবার সে বলে, শুধু ক্ষরই আছে—যখন সে নাস্তিক; আবার সে বলে, শুধু অক্ষরই আছে—যখন সে নেতিবাদী।

তবে সত্যকে পুরাপুরি জানতে হলে ক্ষর হতে অক্ষরের দিকে উত্তিয়ে যেতেই হয়। অক্ষরস্থিতি হল তুরীয় পুরুষার্থ—ঐ অক্ষীয়মাণ উৎসে পৌঁছন। কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ হল ঐখান থেকে আবার সতধারায় নির্ঝরিত হওয়া।

ক্ষরপুরুষের অতীত অক্ষরপুরুষ। তাঁর থেকে উত্তম হলেন পুরুষোত্তম—যিনি অক্ষর আধার আর ক্ষরন্ত ধারা দুইই। পুরুষোত্তমকে পাই পরিব্যাপ্ত গভীর সমগ্রবোধ দিয়ে। এই বোধ দ্বিধাবিভক্ত নয়—দ্বিদল, অথবা সহস্রদল। অক্ষরস্থিতির প্রশান্তি হতেই শক্তির উচ্ছলনের অনুভব। শক্তি তখন মুক্তির আনন্দহিল্লোল, আত্মবিসৃষ্টির উল্লাস। এই ক্ষরাতীত অক্ষরোত্তম পুরুষোত্তমযোগই চেতনার উত্তম রহস্য।

* * *

তারপর আবার পাই ব্রহ্মের আর-দুটি বিভাব—সগুণ এবং নির্গুণ। একটা প্রচলিত সংস্কার আছে, সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মের চাইতে খাটো। আবার এমন দর্শনও আছে যা বলে, নির্গুণ তো ফাঁকা বুলি, তাকে ছাপিয়ে আছে সগুণ।

কিন্তু এমনি করে নির্গুণে-সগুণে বিবাদ বাধানো—এও একটা মনের মায়া। আসলে ব্রহ্ম 'নির্গুণো গুণী' নির্গুণ এবং সগুণ দুইই। তার মধ্যে ছোট-বড়র কোনও কথা ওঠেই না। গুণের প্রকাশ হয় চেতনার কাছে। সুতরাং গুণ দৃশ্য, আর দ্রষ্টা স্বরূপত নির্গুণ। যেমন আয়নায় রঙের ছায়া পড়ল; কিন্তু আয়নাতে নিজের কোনও রং নাই, থাকলে দৃশ্যের রূপটি সে ঠিক-ঠিক ধরতে পারত না। আবার রঙের প্রকাশের তারতম্য আছে। সব রং চলেছে রংচুটের দিকে তাছাড়া সব রং মিলিয়ে হয় সাদা, তাকে ঠিক রং বলা চলে না। চৈতন্যও তেমনি যুগপৎ রংচুট অথবা সমস্ত রঙের সমাহারে সাদা। রংচুটকে বলি নির্গুণ, আর সাদাকে বলি সগুণ। সগুণ তাহলে অনন্তগুণের সমাহার—যতটুকু আমাদের বোধে আসে। বোধাতীত গুণও আছে, সে পড়ে নির্গুণের এলাকায়। সুতরাং নির্গুণের অর্থ গুণহীন নয়, বোধ্য গুণের অতীত। বোধ্য গুণের পরম সমাহারই হল সগুণ। নির্গুণের মাঝেই সগুণ, যেমন প্রাচীনদের দৃষ্টিতে অবর্ণ আকাশে আদিত্যের শুভ্রতা, আবার তাথেকে অনন্ত বর্ণের বিচ্ছুরণ। সব নিয়ে অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য। যেমন তিনি গুণাতীত, তেমনি গুণময়—আবার গুণাধীশও।

এইখানে আরেকটা কথা ওঠে। ব্রহ্মের অনন্ত গুণ—বোধে। তেমনি তাঁর অনন্ত শক্তি—ক্রিয়াতে। বেদান্তে আছে, বোধের দিক দিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সাম্য হতে পারে, কিন্তু শক্তির দিক দিয়ে নয়। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি'—ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রহ্মই হয়; এটা কেবল বোধের ব্যাপার। কিন্তু ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তি তাতে বর্তায় না। ব্রহ্ম যখন শক্তিধর,

বেদান্তের মতে তিনি তখন ঈশ্বর। বলা হয়, জীব ব্রহ্ম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর হতে পারে না।

কথাটার মাঝে একটা ফাঁক আছে। ব্যষ্টি জীব তখনও ঈশ্বর হতে পারে না, কেননা তার ব্যষ্টিত্বের অর্থই হল শক্তির সঙ্কোচ। সুতরাং এদিক দিয়ে কথাটা সত্য। কিন্তু ব্রহ্মকে 'পেয়ে' যিনি ব্রহ্ম হন, তাঁর পুরাপুরি ব্রহ্ম হতে বাধা কোথায়? তাঁর মাঝে ব্রহ্মের স্থিতির অনুভব যেমন পূর্ণ, গতির অনুভবও তেমনি পূর্ণ। সাধারণত জ্ঞান বলতে আমরা বুঝি এই স্থিতির অনুভব। কিন্তু স্থিতি হতেই তো গতি। স্থিতির অনুভব যাঁর হয়েছে, তাঁর গতির অনুভব হতেও বাধা নাই। স্থিতির অনুভবে ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ; গতির অনুভবে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। অনুভব দুয়েরই হতে পারে, এবং একসঙ্গে হওয়াও সম্ভব। বরং স্থিতির অনুভব পূর্ণতা পায় গতির অনুভবে। ব্রহ্মের সত্তা চৈতন্য আর আনন্দকে অনুভব করেই থেমে যাই না, সেই সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করি তাঁর শক্তিকেও। জ্ঞান আর শক্তি যুগনদ্ধ, একটির অনুভব আরেকটির অনুভব আনবেই। সাংখ্যও বলেন, কৈবল্যজ্ঞানের দিকে যতই এগিয়ে যাই, ততই ফোটে বিভূতি বা ঐশ্বর্য। পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য হল ব্রহ্মের জগদ্ভাব। যিনি আত্মাতে ব্রহ্মকে পান, তিনি জগৎকেও পান। ব্রহ্মভাব আর ঈশ্বরভাব তাঁর আত্মানুভবের এপিঠ-ওপিঠ। এইটিই গীতোক্ত সাধর্ম্যমুক্তি বা সাযুজ্যমুক্তির স্বাভাবিক পরিণাম।

ঈশ্বর হওয়ার অর্থ হল জগতের সঙ্গে এক হওয়া—শুধু অধিষ্ঠানে নয়, পরিণামেও। ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পই জগৎরূপে পরিণত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানী এই সঙ্কল্পশক্তির সঙ্গে এক হয়ে যান এইখানেই তাঁর ঈশ্বরত্ব। অজ্ঞেরা মনে করে, ঈশ্বর যা-খুশি তা-ই করতে পারেন, জীব তো তা পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের খুশিটা জীব বুঝতে পারে, সেই খুশির সঙ্গে এক হয়েও যেতে পারে। সে-খুশির কালাপেক্ষা আছে। ঈশ্বরের সঙ্কল্প সব হয়েই আছে, কিন্তু জগতে তার অভিব্যক্তি হয় কালকে ধরে। বিজ্ঞানীর অন্তরঙ্গ চেতনা ঐ সঙ্কল্পের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, অর্থাৎ সেখানে তিনি কালাতীত ঈশ্বর; আর তাঁর বহিরঙ্গ চেতনা জগতে ঈশ্বরসঙ্কল্পের নিমিত্ত বা বাহন, সেখানে তিনি ঈশ্বরের কালবাহিত যন্ত্র।

সুতরাং ব্রহ্মকে পেয়ে ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ ঈশ্বর হওয়াও।

* * *

নির্গুণ আর সগুণের মাঝে যে-সম্পর্ক, ব্রহ্ম আর দেবতাতেও সেই সম্পর্ক। ব্রহ্ম সর্বদেবময়, দেবতারা তাঁর বিভূতি। দেবতারা পুরুষবিধ বা পুরুষের মত (Personal), আর ব্রহ্ম অমানব (Impersonal) অথচ পুরুষবিধাতার অধিষ্ঠান এবং উৎস। পরমার্থ-সৎকে (Absolute) আমরা নাম-রূপের ভিতর দিয়ে উপাসনা করতে পারি, কেননা যেমন তিনি নির্নাম ও নীরূপ, তেমনি আবার অনন্তনাম অনন্তরূপও।

নাম-রূপের উপাসনার স্তরভেদ আছে, ধাপে-ধাপে উঠে যেতে হয় নির্নাম-নীরূপের দিকে। প্রথমত বেছে নিই আমার মনের মত নাম আর রূপ; তিনিই আমার ইষ্টদেবতা।

যেমন বহুর মাঝে আমি অনন্য, তেমনি বহু দেবতার মাঝে আমার ইষ্টদেবতাও অনন্য। আমি একান্তভাবে তাঁরই উপাসক। উপাসনার এইটি প্রথম ধাপ।

কিন্তু আত্মচৈতন্যের অনুধ্যানে যেমন তার ব্যাপ্তি ঘটে, আমার আমিকে আমি দেখতে পাই সবার আমিতে, তেমনি ইষ্টদেবতার অনুধ্যানেও দেবানুভবের ব্যাপ্তি ঘটে, দেখি সব দেবতাই তাঁরই বিভূতি—তিনি অনন্তরূপ অনন্তনাম অনন্তগুণ। দেবতায়-দেবতায় কোনও বিরোধ নাই, যেমন আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিতে তোমাতে-আমাতে কোনও বিরোধ নাই। উপাসনার এইটি দ্বিতীয় ধাপ।

তৃতীয় ধাপে সব নাম-রূপের সমাহার ঘটে এক পরমপুরুষে। উপনিষদে তাঁকে কখনও বলা হয়েছে 'পুরুষ' কখনও-বা শুধু 'সঃ'। পুরুষ বিধাতার অনুভবের এই দল চরন। তখন এক চিন্ময় নাম, চিন্ময় রূপ।

এই পুরুষই আবার নিরুপাধিক 'তৎ'স্বরূপ। তিনি নির্নাম নীরূপ অনানব। নাম-রূপের উপাসনায় শেষপর্যন্ত পৌঁছতে হবে এইখানেই।

আবার এইখানে এসেই দেখব, যিনি অবিগ্রহ এবং অনানব, তিনিই সবিগ্রহ এবং পুরুষবিধ। অরূপই সরূপ বিশ্বরূপ এবং ইষ্টরূপ।

কিন্তু সব মিলে এক অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব। অরূপে-রূপে কোনও বিরোধ নাই। অরূপে অনুরক্তি আর রূপে বিরক্তি, অথবা রূপে অনুরক্তি আর অরূপে বিরক্তি মনেরই মায়া মাত্র।

১২

সচ্চিদানন্দের অনুভব

আত্মচৈতন্যের বা ব্রহ্মচৈতন্যের, অথবা উপনিষদের ভাষায় পুরুষের তাহলে এই কয়টি বিভাব (mood) দেখতে পাচ্ছি। একই পুরুষ একাধারে ব্যক্তি বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত। আবার তিনি ক্ষর অক্ষর এবং পুরুষোত্তম, সগুণ ও নির্গুণ; সবিগ্রহ এবং অবিগ্রহ। এই বিভিন্ন বিভাবের মাঝে পরস্পর কোনও বিরোধ নাই, তারা একেরই মহিমা।

এই এককেই জানতে হবে—সমস্ত বৈচিত্র্যের অতীতেই শুধু নয়, সমস্ত বৈচিত্র্যের মাঝেও। আবার জানতে হবে শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়—বোধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। অবশ্য বুদ্ধির জানারও একটা মূল্য আছে, মনের এলোমেলো জানাকে সে একটা সংহত তত্ত্বরূপ দেয়, বহুর পিছনে আবিষ্কার করে এককে। কিন্তু সবার পিছনে সবার মাঝে সেই এক আছেন। এ শুধু জানলেই হবে না, সেই এক হতেও হবে। জানাকে হওয়ার রূপান্তরিত করার কৌশলই হল যোগ।

যোগের দুটি ধারা—একটি উত্তরণ, আরেকটি অবতরণ। উত্তরণে ক্লিষ্ট প্রাকৃত

চেতনা হতে আমরা মুক্তি পাই—ধ্যানের দ্বারা, বিজ্ঞানের দ্বারা, অন্তর্মুখ অনুভূতির প্রগাঢ়তার দ্বারা। অবতরণে সেই লোকোত্তর অনুভবকেই নামিয়ে আনি এই লোকে, এখানে থেকেও সেইখানেই থাকি, বহুর মাঝেও দেখি সেই এককে। বহুকে তখন অনুভব করি একের প্রতিষেধরূপে নয়, বিভূতিরূপে। বহুর মাঝে এলেই যদি একের জ্ঞান হারিয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে জ্ঞান এখনও পাকা হয়নি। এককে জানাই আমাদের পরমপুরুষার্থ নিশ্চয়, কিন্তু তাঁকে জানতে হবে যেমন নিঃসঙ্গ একাকিত্বে, তেমনি আবার সম্বন্ধবৈচিত্র্যের উল্লাসেও। তাছাড়া, জানার যেমন আনন্দরূপ আছে, তেমনি আছে শক্তিরূপও। এককে আনন্দরূপে যখন জানি, তখন এই বহুর মেলার মাঝে থেকেই সব-কিছুকে অবিরোধে গ্রহণ করতে পারি, সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সব-কিছুকেই তখন অনুভব করি এক চিন্ময় সমুদ্রের তরঙ্গলীলার রূপে। আর এই অসঙ্কোচ নিঃশঙ্ক অনুভব যখন আরও গাঢ় হয়, তখন দেখি জ্ঞানের শক্তিরূপ। আত্মানুভব তখন হয় আত্মবিকিরণ। তখনই জ্ঞানের পূর্ণতা—শুধু লোকোত্তরেই নয়, ইহলোকেও জ্ঞানের সিদ্ধি।

* * *

আকাশের মত সবার মাঝে আবার সব ছাপিয়ে যে-এক, বেদান্তে তাকে বলা হয়েছে সৎ-চিৎ-আনন্দ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। সত্তা চৈতন্য আর আনন্দ—তিনটি আলাদা-আলাদা নয়; তারা একে তিন, তিনে এক। অবশ্য প্রাকৃত মন তাদের আলাদা ভাবতে পারে এবং ভাবেও। সে বলবে, আমি থাকলেই যে সবসময় আমার চেতনা থাকবে বা আনন্দ থাকবে, তা তো নয়। মূর্ছায় বা ঘুমে আমার চেতনা থাকে না, জাগ্রতে বা স্বপ্নে আমার সবসময় আনন্দ থাকে না। মরে গেলে আমি ফুরিয়ে যাব, আমার সত্তাও তখন থাকবে না। সুতরাং চৈতন্য বা আনন্দ তো সত্তার সঙ্গে অবিনাভূত (inseparable) নয়, আবার সত্তাও তো শাশ্বত নয়।

সত্তার দিক থেকেই মনের এই আপত্তিগুলির বিচার করা যাক। প্রথমেই দেখছি, ব্যষ্টি আমির সত্তা শাশ্বত না হতে পারে, কিন্তু সত্তা একটা শাশ্বত তত্ত্ব নয়—একথা বলা চলে না। আমি একসময় না থাকতে পারি, তবুও যা হতে আমার উৎপত্তি, আমার প্রলয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তারও প্রলয় হয় না। সমুদ্রের বুকে বুদ্বুদ উঠে আবার মিলিয়ে যায়, কিন্তু সমুদ্র তবুও থাকেই। সব-কিছুর প্রলয়ে যে-শূন্যতা, তারও সত্তা আছে। কেউ-কেউ তাকে 'অসৎ' বলেছেন। কিন্তু বস্তুত অসৎও সৎ। তার নেতিবাচকতা আমাদের দিক থেকেই, স্বরূপত সে নেতিবাচক নয়। সত্তা একটি অনপলাপ্য সিদ্ধ তত্ত্ব।

মন এই সন্মাত্র থেকে চৈতন্য ও আনন্দের ক্রমিক অভিব্যক্তি কল্পনা করতে পারে। অভিব্যক্তির গোড়ায় চৈতন্য আচ্ছন্ন, এমন-কি নাস্তি-প্রায়। আনন্দও তা-ই। কিন্তু তবুও তাদের মাঝে একটা স্ফুরত্তার প্রবেগ আছে। চাই আরও আলো আরও আনন্দ—এ আকূতি প্রাণের মূলে। তার তর্পণ যে প্রবৃত্তির পথে হতে পারে, তা আমরা দেখতেই

পাচ্ছি। কিন্তু চেতনা যে শুধু বাইরে ছড়ায় তা নয়, ভিতরেও সে গুটিয়ে আসে। তাকে বলি নি-বৃত্তি। নি-বৃত্তি-চেতনার পরাবর্তন অর্থাৎ তার নিজের মাঝে আবার ফিরে আসা। সহজ কথায় তাকে বলতে পারি আত্মসচেতনতা। চেতনার প্রগতির একটা পর্বে আত্ম-সচেতনতা স্বভাবতই প্রবল হয়ে ওঠে। বহির্মুখ চেতনা অন্তর্মুখ হয়ে হয় যোগচেতনা।

যোগচেতনার গতি বিশুদ্ধ সন্মাত্রের বোধের দিকে। বহির্মুখ চেতনায় যেমন বিশেষের (particulars) প্রকাশ, অন্তর্মুখ যোগচেতনায় তেমনি প্রকাশ পায় সামান্য (universals)। সামান্য কালাতীত সম্ভাবনা মাত্র। বহু তার মাঝে এক হয়ে আছে। বহুর বিবিক্ত বোধ সেখানে নাই, কিন্তু তার সমাহারের ঘনীভূত প্রত্যয় তবুও আছে। এই প্রত্যয়ে বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে ব্যবধান ক্রমেই লুপ্ত হয়ে আসে। অবশেষে অনুভূত হয় বিষয়ীর কেন্দ্র হতেই বিষয়ের বিচ্ছুরণের উদ্যত সম্ভাবনা। বিষয়ী তখন ব্যাপ্তিচৈতন্য।

এই বোধটিকেই উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে 'সন্মূল সদায়তন সৎপ্রতিষ্ঠা' বলে। নিরুপাধিক এক সত্তাই সব উপাধির মূলে, দেশে ও কালে এক সত্তারই ব্যাপ্তি, এক সত্তাই সমস্ত ক্রিয়ার অধিষ্ঠান।

বাইরের চোখ দিয়ে যেমন আলো দেখি, তাকে অস্বীকার করবার কথাই যেমন ওঠে না, তেমনি অনুভবের চোখেও সন্মাত্রকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাকেই-বা অস্বীকার করব কেন? বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং আন্তর প্রত্যক্ষ দুইই প্রত্যক্ষ, অতএব দুয়েরই তাত্ত্বিকতা অখণ্ডনীয়। একটিতে চেতনা প্র-বৃত্ত, আরেকটিতে নি-বৃত্ত—এইমাত্র তফাত। আর সে-তফাতও বুদ্ধির কাছে। বস্তুত প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি দুই নিয়েই এক অখণ্ড চেতনা। উপনিষদের ঋষিরা বললেন, যেমন বাইরের আকাশে সব-কিছু আছে, তেমনি আছে হৃদয়ের আকাশে। বাইরে-ভিতরে একই আকাশ।

এই আকাশই বিশুদ্ধ সত্তার প্রতীক। সমস্ত বিশেষের প্রতিষ্ঠারূপে সে নির্বিশেষ পরসামান্য (Supreme universal)।

* * *

যেমন আকাশে আলো অথবা আকাশেরই আলো, তেমনি সত্তারই চৈতন্য। সত্তা আর চৈতন্যকে পৃথক করা যায় না।

আবার বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তাই যেমন নির্বিশেষ সন্মাত্রের প্রব্যাপক নয়, বরং ঐ সন্মাত্রের সত্তাতেই আমার সত্তা, তেমনি আমার সীমিত মানসচৈতন্যই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রব্যাপক নয়। যেমন সত্তার বেলায়, তেমনি চৈতন্যের বেলাতেও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিয়মটা সমানে খাটে।

চৈতন্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি মানসচেতনা, আর সেটা বহুলাংশে ইন্দ্রিয়নির্ভর জাগ্রৎ-চেতনার ব্যাপার। কিন্তু আমাদেরই মাঝে চেতনার পরিসর যে এত সঙ্কীর্ণ নয়, তা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি। আমাদের যেমন চেতনার জাগ্রৎ-ভূমি আছে, তেমনি আছে স্বপ্ন আর সুষুপ্তির ভূমি। সাধারণত ওদুটি ভূমি আমাদের স্ববশে নয়, যদিও সাধনার

যায়। জাগ্রতের মতই তাদের বশে আনা যেতে পারে। জাগ্রৎ-চেতনারও আবার সদরমহল আর অন্দরমহল আছে। অবচেতনা আর অচেতনা হল জাগ্রৎ-চেতনার অন্দরমহল। জাগ্রতের মাঝেও অলক্ষ্যে তাদের ক্রিয়া চলছে। তাছাড়া চেতনার উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে, আমাদের চেতনা যে পুরাপুরি মানুষের চেতনা, তাও বলা চলে না। আমরা মনে মানুষ, প্রাণের বহু প্রবৃত্তিতে পশু বা উদ্ভিদের মত, দেহে জড়ের মত। দেহের বহু গৌণ ক্রিয়া বিশুদ্ধ জড়ক্রিয়ার মত। আবার বৌদ্ধিক ক্রিয়াকে যদি চেতনার লক্ষণ ধরি, তাহলে জড়ের মাঝেও তার অসদ্ভাব দেখি না।

আসলে ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। শুধু প্রাকৃতচেতনার উপর নির্ভর করে তার মীমাংসা করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতচেতনা নিজের বাইরে সব-কিছুকে জড় বলতে বাধ্য। —অথচ ক্রিয়া দেখে অপরের মাঝেও চেতনার অনুমান করতে তার বাধে না। বালকবুদ্ধিতে একসময় সব-কিছুর মাঝে চৈতন্যের আরোপও সে করেছে। আবার সেয়ানা হয়ে সেই চৈতন্যকে অবশেষে সে গুটিয়ে এনেছে একা নিজের মধ্যে। একটায় অগভীর চেতনার পরিচয় পাই, আরেকটাতে খণ্ডিত চেতনার। সমস্যার মীমাংসা হয় যদি চেতনাকে আত্মকেন্দ্রেই সংহত করে তাকে আরও গভীর করি অর্থাৎ পরাক্-বৃত্ত চেতনাকে করি প্রত্যাক্-বৃত্ত। এটা যোগের পথ।

এই পথে গিয়ে দেখি, যেমন সত্তার বেলায়, তেমনি চৈতন্যের বেলাতেও নিরুপাধিক অন্তরাবৃত্তিতে আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি ঘটে। তখন সমস্ত-কিছুর মূলে সবার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা-রূপে দেখি এক অখণ্ড চৈতনা। যা সন্মাত্র, তা-ই চিন্ময় সত্তা আর চৈতন্যের এক অবিনাভাবের সম্পর্ক।

সত্তা আর চৈতনা একই তত্ত্বের দুটি বিভাব, তাই তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা প্রভেদ আছে। প্রভেদের প্রত্যয় আসে শক্তির দিক থেকে। সত্তার শক্তি সুষুপ্তির মত অবাক্, আর চেতনার শক্তিতে রয়েছে একটা স্ফুরত্তা। যেমন নিথর নির্বর্ণ আকাশে আলো ফুটছে। কোটার তারতনা আছে, তাই চেতনার মাঝেও আমরা অপকর্ষ আর উৎকর্ষের একটা ক্রম দেখতে পাই।

গীতার একটি পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি, আমাদের প্রাকৃতচেতনা 'ব্যক্ত-মধ্য'—তার নীচেও অব্যক্ত, উপরেও অব্যক্ত। এক দিকে অচেতনার অব্যক্ত, আরেক দিকে অতিচেতনার অব্যক্ত—আমাদের ব্যক্ত চৈতন্যের কাছে দুইই সমান অন্ধকার। বহুর প্রত্যয় দুর্মোচন হয়ে আছে এই ব্যক্তমধ্যের রাজ্যে। তাই চিৎ আর অচিতের কৃত্রিম ভেদেরও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অন্তরাবৃত্ত চেতনায় চিদ্‌বিশেষ যখন রূপান্তরিত হয় চিৎসামান্যে, তখন ঊর্ধ্বে এবং অধে চেতনার সমস্ত লোকগুলিই প্রকট হয়ে পড়ে এক অখণ্ড সত্তাকে আশ্রয় করে। তিনিই বেদের 'বিরাট্' বা 'বিশ্বরূপ', বিশ্বভুবন তাঁরই প্রতিরূপ।

এমনি করে অন্তরাবৃত্ত আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিতে বিরাটের অনুভবই জানিয়ে দেয় সত্তার আর চৈতন্যে কোনও ভেদ নাই। বলা বাহুল্য, এ-অনুভব মানসোত্তর, চেতনা যেখানে বিষয়কে বিষয়ী হতে বিবিক্ত করে জানে না মানসচেতনার মত, জানে তাদাত্ম্যবোধের দ্বারা

আত্মবিভাবনার উল্লাসরূপে। বিশ্বকে জানার অর্থ তখন নিজে হওয়া। চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় এই হওয়াতে।

* * *

এই হওয়া হল সত্তারই শক্তিরূপ। শক্তির নিমেষ-উন্মেষ আছে। বীজের মাঝে বনস্পতি গুটিয়ে আছে, এটি শক্তির নিমেষদশা। বীজ বনস্পতিতে বিস্ফারিত হচ্ছে, এটি শক্তির উন্মেষদশা। আছে এবং হচ্ছে—দুইই সত্তার দুটি বিভাব। অস্তিত্বে যা নিস্পন্দ, তা-ই ভাবনায় বা হওয়াতে স্পন্দিত। নৈস্পন্দ্য আর স্পন্দনের আয়তন হল চৈতন্য। দুয়েরই বোধ হয় এবং হয় যুগপৎ। যেমন আমি আনাতে নিখর থেকেই আবার ছলকে পড়ছি। স্বপ্রতিষ্ঠ কবিচেতনা হতে ছলকে পড়ছে কাব্য। সমস্ত বোধেরই এই ধারা। এক অক্ষর উৎস হতে সব-কিছু ক্ষরিত হচ্ছে। অক্ষরের ক্ষরণ এবং তার বোধ—তিনে একাকার। অক্ষর সন্মাত্র, ক্ষরণ শক্তি, দুটিকে ব্যাপ্ত করে আছে চৈতন্য।

নিস্তব্ধ একটি মুহূর্তে বোধ হচ্ছে, আমি হচ্ছি। এটি একটি মৌল সত্যের সাক্ষাৎকার। প্রত্যক্ষ করি, যেমন অশেষ আমার স্তব্ধতা, তেমনি অশেষ আমার হওয়া—তেমনি অশেষ বোধও। যা আমার সত্তা, তা বিশ্বেরও সত্তা—বিরাট্ হয়ে বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে এটা আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি। তার নাম দিই, এক অখণ্ড অনেক অনির্বচনীয় অস্তিত্বের চিন্ময় বিচ্ছুরণ।

বিচ্ছুরণ বা শক্তিক্রিয়ার দুটি বিভাব—এক বৈচিত্র্য, আর হল অকুণ্ঠ প্রবেগ। দুয়ের অনুভব ধরে আনন্দরূপ। বহুর মাঝে যদি বৈষম্য দেখা দেয়, তাহলেই বেদনার সৃষ্টি হয়। তাও চেতনার সঙ্কোচের ফল। পরিব্যাপ্ত চেতনা বহুর মাঝে আবিষ্কার করে সৌষম্য। সুখ-দুঃখ আলো-ছায়ার ছন্দোময় বিন্যাসে শুভ্র চেতনায় অপরূপ বর্ণসুষমার বিচ্ছুরণ। সব-কিছু ছাপিয়ে এ-অনুভব আনন্দের, কেননা এ-অনুভব বৃহতের।

তেমনি আনন্দ শক্তির মুক্তিতে, বিরাটের হওয়ার স্রোতে অপ্রতিহত বেগে ভেসে চলাতে। যা-কিছু হচ্ছে, তারই লক্ষ্য চৈতন্যের বিস্ফারণ। অতএব অনুভব সেখানে অবাধিত, শক্তি অকুণ্ঠ। অতএব তা আনন্দ।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, আত্মচৈতন্যের এমন পরমভূমি আছে যেখানে সত্তা চৈতন্য শক্তি ও আনন্দকে অবিনাভূতরূপে অনুভব করা যেতে পারে। এই অনুভবই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভব। এ-অনুভব যত প্রগাঢ় হয়, আত্মচেতনা ততই বিস্ফারিত হতে থাকে। চরম অনুভব 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম। চেতনার সকল ভূমিতেই যখন এ-অনুভব অব্যাহত থাকে, তখন তার পরিণাম ঘটে দুটি অনুভবে : 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই সব-কিছুই ব্রহ্ম; আর 'আত্মৈব সর্বমভূৎ'—আত্মাই সব-কিছু হয়েছেন।

আত্মা বিশ্ব আর ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই সম্যক্-জ্ঞান।

[ক্রমশ]

বিভূতিভূষণের শিল্পীদৃষ্টি

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

প্রায় দুই যুগ পরে আবার পড়ছিলাম বিভূতিভূষণের রচনা। ফলতঃ নূতন চলচ্চিত্র দেখে তাঁর মূল সুর বা সূত্রটি ধরতে চেষ্টা করছিলাম।

অপুর প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ যে জীবনের আলেখ্য চিত্রণ করেছেন তা তিনটি দারুণ বাধায় কণ্টকিত। হরিহর নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে দারিদ্র্যের পাষাণচাপে, সর্বজয়া দুর্গা —অপুও ক্ষতবিক্ষত; এটা একটিমাত্র পরিবারের কাহিনী নয়, বৃহৎ ও ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের একখানি বহুবিস্তৃতপটে করুণ চিত্র। দারিদ্র্য প্রথম, তারপর দুর্ভাগ্য। এই দুর্ভাগ্য লীলাকে গ্রাস করেছিল। এই দুর্ভাগ্য কবিরাজ-পত্নী ও রমলাকে নির্দয়হস্তে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। মনসাপোতার মেয়ে-জামাই এবং তেলিগিন্নির মেয়াই এরই হকুমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এই দুর্ভাগ্য একদা সমৃদ্ধ গৃহস্থকে কৃপাপ্রার্থীর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। দারিদ্র্য এবং দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আবার এসে যোগ দিয়েছে কালস্রোত—তার অনিবার্য প্রকোপ পুরাতনকে মুছে ফেলে দেয়, পরিচিতকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। এই সম্মিলিত প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে অসম দ্বন্দ্বে মানুষের জীবন দুঃসহ, ব্যর্থ। বিভূতিভূষণে বিপক্ষ বা adversaryর হাতে মানুষের চরম লাঞ্ছনার চিত্রটি অনন্ত ফুটে উঠেছে—তাঁর অকৃত্রিম ভাষা ও আন্তরিক নিষ্ঠা অনুভূতিকে আরো তীব্র করে দেখিয়েছে। মানুষ যে দুর্দশার অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে আসতে পারে, তার অন্তঃশক্তির মহত্বকে যে কিছুই খর্ব করতে পারে না তা এক রকমে দেখিয়েছেন ভিক্টর হুগো; হুগোর 'দুর্ভাগার দল' (Les Misérables) এই বিষয়ের বাণীবাহক—তা মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে উঠে আসতে, আঘাতে আঘাতে মুহ্যমান নত হয়ে পড়তে নয়। বিভূতিভূষণ এদিক দিয়ে যান নি। তিনি এঁকে ধরেছেন বাস্তবের দিকটি—অতিরঞ্জিত কি আদৌ রঞ্জিত না করে বাস্তবের কঠোর করুণ দিকটি।

তবে বাস্তববাদী হলেও বিভূতিভূষণ মনে প্রাণে কবি। "মৃত্যুপারে কিছুই নাই, সব শেষ। মা গিয়াছে—অপর্ণা গিয়াছে অনিল গিয়াছে—সব লীড়ি পড়িয়া গিয়াছে" —এই প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তাঁর কবিচেতনার সূচনা ও আদি পদক্ষেপ। আদিতে আসক্তি। অপূর্বর আসক্তি-অর্জর প্রথম যৌবনে তাই বিরুদ্ধ ঘটনা তুলেছে এতখানি সংঘর্ষের আবর্ত—আঘাতের প্রত্যুত্তরে এমন ভঙ্গুরতার নশ্বরতার বোধ, বিরক্তির প্রতিক্রিয়া। তবে তাঁর এই কবিচেতনা ক্রমে পরিণত হয়ে উঠেছে, দুঃখের মধ্যে আত্মস্থ হতে শিখেছে—অর্থাৎ আসক্তের পাশ কাটিয়ে নিরাসক্তের পদবী পেয়েছে। আসক্তি থেকে মুক্তি অর্থ অহংএর অধীনতা ও অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি। বলি না এখানে অহংয়ের

একেবারে লয় হয়ে যায় পরাৎপরের মধ্যে, কিন্তু তা না হলেও এই আংশিক মুক্তি এনে দেয় অন্তর্জীবনে প্রবেশের অধিকার—খুলে দেয় একটা সূক্ষ্মলোকের দুয়ার।

বিভূতিভূষণ প্রবেশ করেছিলেন এই অন্তর্লোকে, এগিয়ে চলেছিলেন অন্তর্জীবনের পথে। তারই প্রমাণ ও চিহ্ন হিসাবে দুটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি তাঁর জীবনে। প্রথম, মানুষের মৃত্যু আছে যদি তাকে জীবের মধ্যে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে দেখি ; কিন্তু সকল জীবসত্তার অন্তরে জীবনের যে অনন্ত অনিঃশেষ কল্পধারা তা এক অখণ্ড প্রবাহে বয়ে চলেছে—সে 'অপরাজিত'। হরিহরের পুনর্জন্ম অপুর মধ্যে, অপুর বিস্তার ও নবপ্রকাশ কাজলের মধ্যে। লীলাদি মাত্র বাহ্য মিলটি দেখেই চমকে উঠেছিলেন। বিভূতিভূষণ দেখেছেন ভিতরের মিলটি। কবি প্রকৃতির কাছ থেকে একটি উপমা সংগ্রহ করে বললেন :

"একদিন দেখিল গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটাও বোঁটা শুকাইয়া গাছে ঝুলিতেছে,—তুলতুলে পাকা, সিঁদুরের মত টুকটুকে রাঙা—যে লতাটা এতদিন ধরিয়া নানা কোটি মাইল সূর্য থেকে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল থেকে উপাদান লইয়া, মৃত জড়পদার্থ থেকে এ উপাদেয় খাদ্যের তৈয়ারী করিয়াছিল, তার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে... যদি ফলটা কেউ নাই খায়, তাতেও ক্ষতি নাই, মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া আরও কত তেলাকুচার জন্ম ঘোষণা করিবে... (অপরাজিত)

জন্মজন্মান্তরের ধারায় অব্যাহত এই প্রাণের স্রোত। যা খেয়ে যায় পচে পড়ে তা এই প্রাণের উপকার খোলসটি—জীর্ণানি বাসাংসি।

দ্বিতীয় উপলব্ধিটি প্রথমটিরই অতিনু সহোদর। এই সীমিত জীবনের অন্তরালে তাকে ধারণ করে রয়েছে যেমন অসীম প্রাণসমুদ্র, তেমনি এই স্থূল জগৎকে সামনে রেখে পশ্চাতে রয়েছে আর এক সূক্ষ্মজগৎ

"এই জগতের পিছনে আর একটা যেন জগৎ আছে। এই দৃশ্যমান আকাশ, পাখীর ডাক, এই সমস্ত সংসার-জীবন-যাত্রা—তারই ইঙ্গিত আনে মাত্র—দূর দিগন্তের বহুদূর ওপারে কোথায় যেন সে জগৎটা—পিঁয়াজের একটা খোসার মধ্যে যেমন আর একটা খোসা, তার মধ্যে আর একটা খোসা ; সেটাও তেমনি এই আকাশ, বাতাস সংসারের আবরণে কোথাও যেন ঢাকা আছে, কোন জীবন-পারের, মনের পারের দেশে।"

বাস্তব জগতের ওপারে বিভূতিভূষণের সূক্ষ্মজগৎটি নির্জন প্রকৃতিরাজ্যের জগৎ, সে প্রায় চিন্ময় এবং, এমন কি, প্রায় সবাক—প্রায় বললাম, কারণ কথাটি শিল্পীও কিছু অস্পষ্ট রেখেছেন, রহস্যময় করে রেখেছেন ; বলেছেন, এর ভাষা নানা সুরে নানা রূপে, এর সান্নিধ্য উদাসী করে দেয় প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ-ক্লিষ্ট মনকে। দুটি উপলব্ধিই আনে মুক্তির স্বাদ—বন্ধনমুক্তির স্বাদ। এই স্বাদ পেয়েই অপূর্ব বলতে পেরেছে :

"কৈ এত বিরুদ্ধ ঘটনার ভিতর দিয়াও তাহার মনের আনন্দ কেন নষ্ট হয় নাই ? নষ্ট হয়তো নাই-ই, কেন তাহা দিনে দিনে এমন অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যে বাড়িয়া চলিয়াছে ?"

'আরণ্যকে' এই আনন্দের রোমাঞ্চ প্রায় অভিসারিকার ভয়মিশ্রিত মধুর আশার মতো।

কবিচিত্তের বা কবিচেতনার এই দুটি উপলব্ধি। উভয় ক্ষেত্রেই আবার মনে হয়েছে শিল্পী যেন গন্তব্যের ঠিক সম্মুখে এসে থেমে গিয়েছেন, দৃষ্টির সামনে পর্দাটি একেবারে খুলে না দিয়ে একটুখানি সরিয়ে আবার বন্ধ করে দিয়েছেন—অর্থাৎ কবিচেতনা বা শিল্পীচেতনা যোগীচেতনা হতে হতে থেমে গিয়েছে। বিভূতিভূষণের প্রথম অভিব্যক্তি বা সিদ্ধান্তটিকে আরো পূর্বতর রূপ দেওয়া চলে। মানুষের অবচেতন সত্যিই ওরকম একান্ত বংশানুক্রমের মধ্যে নয়, অতখানি স্থূল আশ্রয় করে নয়। তার অবচেতন তার মধ্যে পূর্ব চেতনার উদ্বোধনে, ভগবৎ-উপলব্ধির সিদ্ধিতে। এই ভাগবত চেতনায় সে উপলব্ধি করে পূর্ব-পরের মধ্যে নিবিড় ঐক্য, অতীত-ভবিষ্যতের মধ্যে মিলন-সূত্র, যাবতীয় বস্তুর নিকট-সম্বন্ধ—নেই নানাত্বে কিঞ্চন। অপূর্বর প্রতিধ্বনি কাজলে.—তার অর্থ নয় অপূর্বর অবচেতন কাজলে কিম্বা অপূর্বর ব্যক্তিগত সিদ্ধির ও চরমোৎকর্ষের প্রয়োজন নেই। অন্য উপলব্ধিটিও বলেছি চিত্তাকর্ষক। এই দৃশ্য জগতের ওপারে অদৃশ্য জগৎ, এই কায়ালোকের ওপিঠে ছায়ালোক বা মায়ালোক—সত্যিই যাদু বা মায়ার কুহক দিয়ে আবৃত রহস্যময় লোক। নির্জন প্রকৃতি তার এক রূপ ও প্রকাশ, আর অন্য হল মৃত্যুপারে স্তরপরম্পরায় বিন্যস্ত সব লোক। দ্বিতীয় উপলব্ধিটি এবং তার অনুসঙ্গী তত্ত্বটি আশ্রয় করে 'দেবযান'-এর সৌধ। এখানে বিভূতিভূষণ বলতে চেয়েছেন পরলোকের কথা, এঁকে দেখাতে চেয়েছেন পারলৌকিক জীবনের বিচিত্র চিত্র। কিন্তু গলদ বড় বালাই। উপন্যাসের গরজে লোকায়ত করে দেখাবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট তাঁর আসল কাল্পনিকের পোষাকে দেখা দিয়েছে—ফলে সত্যের সঙ্গে অনেকখানি মিথ্যার মিশ্রণ বা বিকৃতি এসে পড়েছে, হয়ত শিল্পীর অজ্ঞাতসারে কিম্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও। বস্তুত শিল্পীর দুঃসাহসী কল্পনা আড়ালে ইঙ্গিতে দেখা সত্যের সঙ্গে মিশে গেছে এই 'দেবযান'—অন্তরাত্মার মনস্তত্ত্বাত্মার ভাবরূপটি শুধু বাস্তব, তার স্থূল আচরণ বিচরণের কাহিনীটি মর্তের অধ্যারোপ ও অনুকরণ, প্রায় melodramatic.

আমি বলেছি বিভূতিভূষণ যোগী-চেতনার দ্বারপ্রান্তে এসেছিলেন। এবার তবে কথাটি গ্রহণ করতে হয় নিন্দার্থে নয়, প্রশংসার্থে। তাঁর দৃষ্টি তুচ্ছের মধ্যে প্রাত্যহিক সন্তুষ্টির মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকে নি—ভিতরে অন্তরাত্মার এক অতৃপ্তি তাকে গহন থেকে গহনের দিকে প্রলুব্ধ করেছিল। 'দেবযান'-এর দ্বারোদ্ঘাটন 'দিব্য-জীবন' থেকে শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র দিয়ে এবং জীবনসন্ধ্যায় এই আধুনিক ঋষিকবি-রচিত 'সাবিত্রী'র-সঙ্গ মাত্র অহৈতুক যোগাযোগ না হতে পারে, হতে পারে তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসার ন্যায়সঙ্গত পরিণাম। অতঃপর প্রয়োজন ছিল সূত্র ধরে আরো চলে যাওয়া, একটা একান্ত অভিনিবিষ্ট আত্মজীবনের, পুরাতনের সব ছেড়ে অ-জ্ঞাত অপরূপ জীবনে প্রবেশ—আত্মজীবনের দাবি এই করণীয় তিনি করলেন না, বাহিরের জীবনে তাই কি এল চরম সঙ্কট? তাই কি অন্তরের অতলে যা প্রবেশ করতে পেরে দেহায়তন বা স্থূলসত্তাই তাঁর শেষে অকস্মাৎ ডুব দিল রহস্যসাগরে?

দুখানি পত্র

(১)

টেলিফোন : ৪৮-৩৫৯১
৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫
২৮-১০-৫৯

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত
পণ্ডিচেরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শ্রীঅরবিন্দ-পাঠমন্দির থেকে আপনার দুখানি বই 'নবাবিজ্ঞান অধ্যাত্মজ্ঞান' এবং 'কবির্মনীষী' অনেক দিন হল পেয়েছি। বার্ধক্য আর ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য বেশী পড়তে পারি না, তবুও বই দুটি নোটামুটি দেখেছি। পূর্বে মাঝে মাঝে আপনার লেখা পড়েছি, তাতে ধারণা হয়েছে, আপনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত মনীষী ও ভাবুক। আমার বাধা এই— আপনি যেসব বিষয়ে আলোচনা করেন তার অধিকাংশেরই আমি অধিকারী নই। যেমন বর্ণান্ধ আর বধির আছে তেমনি বিদ্যা আর কলা বিশেষের অগ্রাহী (unreceptive) লোকও আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে কাব্য সংগীত আর ভক্তিতত্ত্বে আমার আগ্রহ আর অভিজ্ঞতা অত্যল্প। তথাপি আপনার দুটি বই থেকে কিছু জ্ঞান আর আনন্দ লাভ করেছি। বিজ্ঞান বিষয়ক আপনার মন্তব্য খুব ভাল লেগেছে। কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কবিতার, বিশেষত আধুনিক কবিতার মর্ম আমি বুঝতে পারি না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার যে ব্যাখ্যান আপনি করেছেন তাতে তাঁর রচনা বোঝা আর উপভোগ করা আমার পক্ষে কিছু সহজ হয়েছে। 'জীবন-নাট্য' প্রবন্ধটি খুব ভাল লেগেছে।

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল আর সুদীর্ঘকালব্যাপী কর্মক্ষমতা কামনা করি।

নিবেদক
রাজশেখর বসু

(২)

৬নং স্যুইট
৬ রাসেল ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৬

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত
মহাশয়ের সমীপে

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"কবির্মনীষী" আমার হাতে পৌঁছেছিল, যে-দিন আমরা লণ্ডন ছাড়ব তার আগের রাত্রে। তাই তখনই আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারিনি, এবং প্রকাশককেও জানাতে পারিনি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। দেশে ফিরে অবধি হাঙ্গামার অন্ত নেই, এবং এখনও স্থির হয়ে বসার অবসর পাচ্ছি না। কিন্তু আমার প্রসঙ্গে গভীর ও দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে আপনি আমাকে যে-অভাবনীয় সম্মান দিয়েছেন, তা বিনাবাক্যে মেনে নিলে, নিজের কাছেই আমার অপরাধ বাড়বে এবং সেই জন্যে ঋণশোধের সুযোগ না খুঁজে, আজ শুধু ঋণ-স্বীকারের এই হাতচিঠি পাঠাচ্ছি।

উক্ত প্রবন্ধে প্রশংসার অংশ নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্য নয়, কিন্তু বিপরীত সমালোচনার কথা কয়েকটি মৃদু বলেই অবশ্যগ্রাহ্য। তবে পূর্ণের উপলব্ধি যে-সাধনার লক্ষ্য, তাতে আমি অধিকারী নই এবং তাই আমার পক্ষে সত্যরক্ষার একমাত্র উপায় বর্তমান বিভীষিকার অস্বীকার। তৎসত্ত্বেও সৌন্দর্য ও শান্তির সন্ধান আমরা পেতে পারি; কিন্তু সেই সঙ্কেতের পথ এই নরকের অন্তঃপাতী, এবং যারা এখানে চিরকাল অবরুদ্ধ থাকতে সম্মত নয়, তারা স্বপ্নাচ্ছন্ন হলে, সর্বনাশ অনিবার্য। বরঞ্চ তারাই বিশেষ ক'রে মানতে বাধ্য যে তারা যেমন অমঙ্গলের স্রষ্টা, তাদের সঙ্কল্প তেমনই শিবের সিংহাসন; এবং অনুরূপ সোহংবাদে আত্মরতির স্থান নেই, আছে কেবল কঠোর আত্মজিজ্ঞাসা যার নির্বাণ নৈর্ব্যক্তিক শান্তির অগাধ অহংকারে।

বলাই বাহুল্য যে ওই আদর্শ ললিত পদাবলীর অনুকূল নয়; এবং সাম্প্রতিক জগতের বিবরণে পুনরুক্তিই সত্যবাদীর অনন্য সহায়। কিন্তু যদি সে-রকম ঔচিত্যের বিচারে আজ নাও নামি, তবু এ-কথা বোধহয় তর্কের অবকাশ রাখে না যে শুচিবায়ু তো রোগ বটেই, বাংলা সাহিত্যের পক্ষাঘাত আমার গদ্য-পদ্যের জাতিভেদ থেকে উৎপন্ন। তার মানে এমন নয় যে কবিত্বের ছন্দোরক্ষা নিষ্প্রয়োজন, অথবা আধুনিকের গুরুচণ্ডালী ভাষা লেখকমাত্রের অনুকরণীয়। এবং আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে গতানুগতিক বিধিনিষেধের সঙ্গে নিজস্বের সামঞ্জস্য-

সাধনই কবিপ্রতিভার পরম ও চরম কর্তব্য। তবে আমি নিজেও জানি যে প্রতিভা যাবার নেই; এবং যিনি "শেকসপীয়রিয়ানা"-র জনক, তাঁকে রচনারীতির বিষয়ে উপদেশ দিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা।

অতএব চিঠিখানা আজ এখানেই শেষ করছি। আপনি কখনও কলকাতায় এলে, এবং আপনার হাতে সময় থাকলে, যদি আমাকে ডাক দেন, তাহলে সাক্ষাতে উপস্থিত আলোচনা হয়তো আরও কিছু দূর এগোতে পারে। তবে ইতিমধ্যে এ-টুকু না লিখে ছেড়ে দিতে পারছি না যে "কবির্মনীষী" প'ড়ে আমি কেবল আনন্দ পাইনি, উপকৃতও হয়েছি বিশেষ ভাবে। এতখানি পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এ-রকম অনুকম্পা বর্তমানে বিরল, এবং আপনার প্রসাদগুণের অন্তরালে রয়েছে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি। প্রকাশকের কাছেও আমি যথেষ্ট ঋণ-গৃহীত: তাঁর প্রেরিত উপহার সাত সমুদ্রের ও-পারে পৌঁছেছিল অসামান্য সৌজন্যের সাক্ষী হিসাবে; এবং শুধু পুনরুক্তির ভয়ে আপনাকে ও তাঁকে একসঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি না, আপনার মতো তিনিও আমার উত্তমর্ণ ব'লেই, এই স্বীকারপত্র আপনার উদ্দেশে পাঠাচ্ছি তাঁর মারফতে। ইতি ২৯ ডিসেম্বর ১৯৫৯

প্রীতিনমস্কারান্তে
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তোমার জন্মদিনের সূর্য

নিশিকান্ত

তোমার জন্মদিনের সূর্য তোমার স্বর্ণবিভায় ভরা,
নিখিল সূর্য চন্দ্র তারায় তার দীপনের নিঝর ঝরা।
পবন দুলায় সেই তপনের দ্যুতি,
তার সুবর্ণে পূর্ণ মহাভূমি ;
তার কিরণের কনকচাঁপায় প্রদীপ্ত হয় বসুন্ধরা।
তোমার জন্মদিনের সূর্য তোমার স্বর্ণবিভায় ভরা॥

তোমার জন্ম-উৎসবে আজ বিস্ময়ে চাই তোমার পানে,
ঐ মানবী-মুখের হাসি বিশ্বপাবণবিভাস আনে !
আমরা মাটির শ্যামল দুর্বাদলে
রঞ্জিত হই সোনার পূর্বাচলে,
ধরিত্রী পায় হিরণ্ময়ী, দিশ্বালা হয় হেমাম্বরা।
তোমার জন্মদিনের সূর্য তোমার স্বর্ণবিভায় ভরা॥

কালের ললাট তোমার হাতে সেই তপনের তিলক পরে,
তোমার স্বর্ণস্বাক্ষরে তার নূতনকল্পপ্রভাত ধরে।
মহেশ্বরের অসীমসুপ্তি মাঝে,
বিশাল-জাগরণের স্বপ্ন সাজে,
তোমার স্বপ্নশোভায় তুমি জগন্তামসতন্দ্রাহরা।
তোমার জন্মদিনের সূর্য তোমার স্বর্ণবিভায় ভরা॥

বিবর্তনের এই বৈভব আর যাবে না নিবর্তনে,
অস্তাচলের অগতি নেই তোমার সূর্য-সংক্রমণে।
সঙ্গমে তার আমরা অনুক্ষণ,
লভি অমল-রূপের উল্লাসন :
অখিল মানবতার অঙ্গ রূপান্তরের বসন পরা।
তোমার জন্মদিনের সূর্য তোমার স্বর্ণবিভায় ভরা॥

এখন তনুর শোণিতরাশি তরল সোনার প্রবাহ পায়,
স্বর্ণপ্রভার কাজল আঁকা নয়ন শুধু তোমাকে চায়।
তোমায় দেখার দিব্য দৃষ্টি পেয়ে
তোমায় বরে ধরার ছেলে মেয়ে,—
তোমাতে পায় স্পর্শমণি : সোনার খনি প্রকাশ করা।
তোমার জন্মদিনের সূর্য তোমার স্বর্ণবিভায় ভরা॥

সুবর্ণরাগ পায় আমাদের প্রতি-পলের প্রজাপতি,
স্বর্ণ-জ্যোতির দিবায় নিশায় নন্দিত হয় মোদের গতি।
পঙ্গু-পথিক তোমার প্রেরণাতে
সরণী পায় কাঞ্চনজন্মাতে,
সৌরলোকের যৌবন পায় মর্ত্যলোকের মলিন জরা।
তোমার জন্মদিনের সূর্য তোমার স্বর্ণবিভায় ভরা॥

জন্মলাভের লীলায় এলে অমরজন্ম দানের তরে,
আমরা পেলাম আলোর জীবন পার্থিবতার ছায়ার ঘরে।
এই মেদিনীর গর্ভ-তমিস্রায়
আমরা যে পাই হিরণ্যগর্ভায়,
তাই জড়তায় তড়িৎ বিলাই, পাতাল-তলে পাই অমরা।
তোমার জন্মদিনের সূর্য তোমার স্বর্ণবিভায় ভরা॥

সাবিত্রী মা, পেলাম তোমার আদিত্য-সঙ্কাশের পাণি,
তার পরশের সৃজন-শিখায় তোমার পূজার প্রদীপ আনি।
গায়ত্রী মা, তোমার মন্ত্র-গানে
অরুণবীণা ঝঙ্কৃত হয় প্রাণে,
সংবিতে পাই হংসীকমল বিমলবাণীর মধুক্ষরা।
তোমার জন্মদিনের সূর্য তোমার স্বর্ণবিভায় ভরা॥*

* পূর্বে প্রকাশিত ; পরে স্থানে স্থানে পরিবর্তন ক'রেছি আর আরো দু'টি অনুচ্ছেদ নতুন লেখা হ'য়েছে ; তাই সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রকাশের জন্য পত্রিকায় দিলাম। (লেখক)

রবীন্দ্রনাথের

॥ কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ ॥

শান্তিনিকেতন ১

ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণীর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, সর্বোপরি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভাবপুষ্ট মানবিকতা এই পুস্তকের প্রবন্ধাবলীর প্রধান উপজীব্য
মূল্য ৪.০০ টাকা

শান্তিনিকেতন ২

সনাতন ভারতের দুইটি চিরন্তন ভাবধারার মিলনসংগীত পুস্তকখানিতে গীত হইয়াছে। মূল্য ৪.০০ টাকা

ধর্ম

ইহার প্রবন্ধগুলি উপদেশের সংকলন। 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গার্হস্থ্য-আশ্রম সমর্থন করিয়াছেন; উপনিষদের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১.৮০ টাকা

সঞ্চয়

সনাতন ভারতের ভাবধারা এই গ্রন্থে সুনিশ্চিতভাবে লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে। বিষয়বস্তুসমূহ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও রসপিপাসু মানবমাত্রকেই আনন্দরস পরিবেশনে সহায়তা করিবে। মূল্য ১.৫০ টাকা

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

৪৭—১০ সংখ্যা — ৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিক

(২৪ নভেম্বর ১৯৬০)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২

১।	চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২।	রবার্ট ব্রেডন-এর একটি কবিতা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩
৩।	শ্রীমা প্রসঙ্গ	ডাঃ কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	১১
৪।	মহামানবের সাগরতীরে	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯
৫।	মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	২৪
৬।	শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সান্ধ্যবৈঠক	নীরদবরণ	৪৯
৭।	বাসবদত্তা	শ্রীঅরবিন্দ	৪১
৮।	প্রাতঃ প্রণাম (কবিতা)	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	৫৩
৯।	আদিশ্লোক (")	রণজিৎ সরকার	৫৬
১০।	উচ্চৈঃশ্রবা ( )	নীরদবরণ	৫৭
১১।	হিরণ্ময় পরিক্রমা		৫৮

বার্ষিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ২৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—২৲ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

২৪ নভেম্বর

১৯৩০

আমার দেব-স্বরূপ বিসর্জ্জন দিয়ে আমি নীচে নেমে এসেছি
এই এখানে, জঘন্য পৃথিবীর 'পরে,
হয়ে উঠেছি জ্ঞানহীন, ভ্রমবিদ্ধ, মানুষরূপী—
মৃত্যু ও জন্ম এই যুগল আবরণীর মাঝখানে।

খুঁড়ে চলেছি ক্রমে গভীরে দীর্ঘকাল ধরে,
কর্দ্দমকলুষের বিভীষিকা নিয়ে,
আমি চেয়েছি সোনালী তটিনীর গানের জন্যে একটি ধারা,
মৃত্যুজন্ম আগুনের জন্যে একটি নীড়—

শ্রীঅরবিন্দ

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীঅরবিন্দ

কর্ম্ম

নাস্তিকতা প্রয়োজন গোঁড়া যত ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান তাদের দুষ্কর্ম্মের বিরুদ্ধে, আর সঙ্কীর্ণ সব মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। ভগবান নাঠ্যৌষধি রূপে একে ব্যবহার করেন, এই যত মলিন তাদের ঘর ধূলিসাৎ করে দেবার জন্যে।

*

"সদ্ধর্ম্ম" এই নাম এঁটে দিয়ে যাহা পারিপাটোর মধ্যে কতখানি না হিংসা আর ক্রূরতা ঠেসে পুরে রাখা হয়েছে!

*

ভগবান যখন লোভ দেখান চলন বাত্রায়, তখনই নিয়ে আসেন তাঁর পরম নির্দ্দেশ; তাঁর পূর্ণ প্রেম পাই তখন যখন তাঁর নিষ্ঠুরতম দণ্ডভোগ করি, আর যখন তিনি তুলে ধরেন প্রচণ্ড প্রতিরোধ, তখনই দেন নিখুঁৎ সাহায্য।

*

মানুষকে লোভ দেখাবার দায় ভগবান যদি না গ্রহণ করতেন তবে সৃষ্টি অতি সত্বরই ধ্বংস পেয়ে যেত।

*

ভিতরের প্রলোভন সহ্য করে চল, যাতে সেই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে তুমি তোমার নিম্ন-মুখী বৃত্তি সব ক্ষয় করে উঠতে পার।

*

শোধনের কাজ যদি ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও, তা হলে তিনি অন্তরে অন্তরে অশুদ্ধি সব ক্ষয় করে তুলবেন। কিন্তু তুমি যদি চাও নিজেকে নিজে চালাতে, তা হলে তুমি নিশ্চয় বহুল দুষ্কর্ম্মের ও দুর্গতির মধ্যে পড়ে যাবে।

*

যা কিছুকে মানুষ পাপ বলে তাকেই পাপ নাম দিও না—কেবল ভগবান যা প্রত্যাখ্যান করেন তুমিও তাই প্রত্যাখ্যান করো, আর মানুষ যা-কিছুকে শ্রেয় বলে তাকেই শ্রেয় নাম দিও না, কেবল ভগবান যা গ্রহণ করেন তুমিও তাই গ্রহণ কর।

*

সংসারে মানুষের আছে দুটি আলো, কর্তব্য আর নীতি—কিন্তু যে মানুষ পার হয়ে গিয়েছেন ভগবানের কাছে, তাঁদের আর ও-দুটি জিনিসের প্রয়োজন নাই, তাদের পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন ভাগবতী ইচ্ছা। এ জন্যে মানুষ যদি তোমাকে তিরস্কার করে, কান দিও না, তুমি ভাগবত যন্ত্রী, চলে যাও তোমার পথে হাওয়ার মত, সূর্য্যের মত, পোষণ করে কি ধ্বংস করে।

*

মানুষের প্রশংসা সংগ্রহের জন্য ভগবান তোমাকে তাঁর আপনার করে তোলেন নি —তাঁর আজ্ঞা নির্ভয়ে পালন করবার জন্য তুমি হয়েছ তাঁর।

*

জগৎকে ভগবানের নাট্যাঙ্গনরূপে গ্রহণ করো, সেই পরম অভিনেতার হও তুমি বাহ্যসাক্ষ, তোমাকে আশ্রয় করে তাঁকেই অভিনয় করতে দাও। মানুষ যদি তোমাকে প্রশংসা করে বা টীটকারী দেয়, তবে মনে রাখবে তারাও হল বাহ্যসাক্ষ—অন্তরে ভগবানকেই তোমার একমাত্র সমালোচক ও দর্শকরূপে গ্রহণ করো।

*

কৃষ্ণ যদি একাই তোমার পক্ষে থাকেন আর অন্য দিকে থাকে যদি সমস্ত সুসংগঠিত জগৎ তার সৈন্যবাহিনী, তার গোলাগুলি বন্দুক কামান নিয়ে, তা হলেও বরণ করে নেবে তোমার ভাগবত নিঃসঙ্গতা। দৃকপাত করবে না যদি সারা জগৎ তোমার দেহের উপর দিয়ে চলে যায়, তার গোলাগুলি তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে, তার তুরঙ্গবল তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দলে পিষে কদাকার কর্দমে পরিণত করে পথপার্শ্বে ফেলে চলে চলে যায়। কারণ মন ত চিরকাল হল একটা প্রতিচ্ছায়া আর দেহ মৃৎপিণ্ড। আত্মা তার পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করে, তার বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে।

*

তুমি যদি মনে কর পরাজয়ই তোমার পরিণাম, তবে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যেও না, তুমি যদি বেশি শক্তিমান হও তবুও। কারণ জগৎকে কোন মানুষই কিনে আনতে পারে না, আর শক্তিও তাঁর অধিকারীর কাছে বাঁধা থাকেন না। কিন্তু পরাজয় কখন পরিণাম নয়, তা হল ফুরার বা আরম্ভ মাত্র।

*

আমি ব্যর্থ হয়েছি তুমি বলছ। বরং বল ভগবান তাঁর লক্ষ্যের দিকে চলেছেন চারদিকে ঘুরে ঘুরে।

*

জগতের কাছে হার মেনে তুমি ফিরে চাও ভগবানকে ধরতে। জগৎ যদি তোমার চেয়ে

বেশি বলবান হয়ে থাকে, তবে মনে কর কি ভগবান দুর্বলতর? বরং তার দিকে ফের তাঁর হুকুমের জন্যে, আর চাও বল সেই হুকুমপালন করবার জন্যে।

*

যদি কোন সংকল্পের পক্ষে থাকে একটি মাত্রও জীব যার বিশ্বাস অক্ষত, তবে তা কখন ব্যর্থ হয় না।

*

তুমি আপত্তি জানাও, এই বিশ্বাসের কোন ভিত্তি বিচারে আমি পাই না। মূর্খ। তাই যদি হবে তবে তোমার বিশ্বাস প্রয়োজনই বা হবে কেন, বা তোমার কাছে তা চাওয়াই বা হবে কেন?

*

হৃদয়ে বিশ্বাস হল একটা প্রচ্ছন্ন জ্ঞানের অস্ফুট, অনেক সময়ে বিকৃত প্রতিবিম্ব। বিশ্বাসী অনেক সময়ে পাকা সংশয়ীর চেয়ে বেশী সংশয়সংকুল হয়ে থাকেন—কিন্তু তিনি লেগে থাকেন, কারণ তাঁর মধ্যে অবচেতন এমন একটা কিছু আছে যে জানে। সেই জিনিসই অন্ধবিশ্বাস আর আলো-আঁধারী সংশয় এই উভয়কে এক সঙ্গে থাকতে দেয় আর নিয়ে চলে যে বস্তুটি জানে তার আত্মপ্রকাশের অভিমুখে।

*

জগৎ মনে করে যে চলেছে বিচারের আলো-সহায়ে, কিন্তু বস্তুত সে চালিত হয় তার বিশ্বাসের আর প্রেরণার বশে।

*

বিচার নিজেকে লাগে বিশ্বাসের অনুগত করে কিম্বা স্বতঃপ্রেরণার সমর্থনে তর্ক সাজিয়ে তোলে—বিচারের প্রেরণা আসে অবচেতনা থেকে, তাই মানুষ মনে করে তারা কর্ম করে বিচারের আশ্রয়ে।

*

বিচারের একমাত্র কাজ হল প্রত্যক্ষ-প্রত্যয় সব সাজিয়ে ধরা, পরীক্ষা করা—সে নিজে নিজে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না, কর্মেরও আদেশ দিতে পারে না। যখন কোন কিছু প্রবর্তনার বা প্রচালনার ভার সে করে, তখন তার গোপনে সে রাখে অন্য কর্মকর্তা।

*

প্রজ্ঞা যতদিন তোমার কাছে না আসে, ততদিন বিচারকে ব্যবহার কর তার বিধিদত্ত কর্মের জন্য আর বিশ্বাস এবং স্বতঃপ্রেরণাকেও ব্যবহার কর তাদের আপন বিধিদত্ত কর্মের জন্য। তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটিকে আর একটির বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেবে কেন?

*

প্রত্যক্ষ কর আর তোমার ক্রমবর্দ্ধমান প্রত্যক্ষের আলোকে কাজ করে চল কিন্তু তা

যেন কেবল তোমার বিচারী বস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ না হয়। ভগবান হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলেন, বস্তিষ্ক যখন তাঁর কিছু বোঝে না।

*

তোমার হৃদয় যদি বলে, এই ভাবে, এই উপায় ধরে এবং এই সময়ে ঘটবে তা, তবে বিশ্বাস করো না হৃদয়কে। কিন্তু সে যদি দেয় ভগবানের আদেশ নিয়ে আসে যে শুদ্ধি ও প্রসারতা, তবে শুনবে ও মানবে তার কথা।

*

যখন পেয়েছ আদেশ, তখন তোমার একমাত্র কাজ তা পালন করা। বাকী যা তা হল ভগবানের ইচ্ছা ও বিধান, মানুষ যার নাম দেয় দৈবাৎ, ভাগ্য, কপাল।

*

তোমার লক্ষ্য যদি হয় বৃহৎ, কিন্তু উপায় ক্ষুদ্র, তবুও কাজ করে চলবে। কারণ কাজের মধ্য দিয়েই বেড়ে চলবে উপায় তোমার।

*

সময় আর সাফল্যের দিকে দৃকপাত করবে না। তোমার অংশ তুমি অভিনয় করে যাবে, তা সাফল্যলাভ হোক আর বিফলতা লাভ হোক।

*

আদেশ আসতে পারে তিন রূপ নিয়ে—(১) তোমার প্রকৃতির মধ্যে ধ্রুবসঙ্কল্প আর বিশ্বাস, (২) তোমার হৃদয় ও বস্তিষ্ক স্থির যে আদর্শ স্বীকার করে নিয়েছে, (৩) ভগবানের নিজের বা তাঁর প্রতিভূদের কণ্ঠ।

*

এমন সময় আসে যখন কর্ম্ম অবিধেয় কিম্বা অসম্ভব। তখন হয় যাহা নির্জ্জনতায় গিয়ে কিম্বা অন্তরের গুহামধ্যে তপস্যায় মগ্ন হও এবং অপেক্ষা কর ভাগবত বাণী বা আবির্ভাবের জন্যে—যাই হোক না তা।

*

বাণী শোনা মাত্রই উৎসাহী হয়ে উঠবে না—কারণ মিথ্যাচারী অপশক্তি সব রয়েছে যারা তোমাকে প্রবঞ্চনা করতে উৎসুক। হৃদয় তোমার শুদ্ধ হোক, তখন শুনবে বাণী।

*

সময় আসে যখন মনে হয় যেন ভগবান কঠোর হয়ে পক্ষ নিয়েছেন অতীতের, তখন যা হয়েছে যা আছে তা সিংহাসনের উপর যেন দৃঢ় আসীন হয়ে থাকে, আর নিজেকে পরিবৃত করে এই অকাট্য ঘোষণায় "আমি থেকে যাবই"। তখনও তবু চলবে নিষ্ঠাভরে, মনে যদিও হয় তুমি যেন বিশ্ববিধাতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছ—এ হল তাঁর পরম ক্ষুরধার পরীক্ষা।*

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

রবার্ট গ্রেভস-এর একটি কবিতা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

রবার্ট গ্রেভস (Robert Graves) বড় কবি নন, মহা কবি তো বটেই নন—তিনি ছোট কবি। কিন্তু ছোট কবি হলেও তিনি কবি অর্থাৎ সুন্দর এক টুকরা কাব্য-মণিকা তিনি ধরে দেখিয়েছেন, সুন্দর রূপে ও গুণে। তিনি যেন কাব্যশ্রীর মুখের উপর থেকে অবগুণ্ঠন একটুখানি সরাতে পেরেছেন এবং আমরা দেখতে পেয়েছি একঝলক আলোর সুষমা—একটা সৌন্দর্য্য একটা সত্য যা আমাদের অনুভূতির মধ্যে, রসবোধের মধ্যে সঞ্চারিত করে ধরেছেন।

তিনি ছোট কবি, তাঁর ইষ্ট ছোট দেবতা। ইন্দ্র অগ্নি বরুণ মিত্র, এসব বড় বড় দেবতাদের পূজা বড় বড় ঋষিরা করবেন, কিন্তু বালখিল্যরাও ত আছেন তাঁদের সঙ্গে যদিও অপাংক্তেয় তাঁরা। অর্ব্বাচীন কালে আধুনিক যুগেও ত দেখি মা দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে মা শীতলাও আছেন।

কিন্তু দেবতা ছোট হলেও, সত্যাকারের পূজা যদি হয়, তবে তা ভগবানেরই কাছে পৌঁছে গিয়ে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলছেন, যাকে যেমন ভাবেই পূজা কর, শেষে তা আমার কাছেই এসে যায়; আর পূজার মাহাত্ম্য তার আকার আয়োজনের উপর নির্ভর করেনা—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং, একটু পাতা, একটু ফুল এক ফোঁটা জল, এই যথেষ্ট।

ছোট দেবতা বলে তবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করোনা, ওদের অনেক ক্ষমতা। কারণ ওরা হল পৃথিবীর দেবতা। স্বর্গের দেবতা আছেন, কিন্তু পৃথিবীরও দেবতা আছেন। স্বর্গের দেবতারা স্বর্গে, বহুদূরে—কিন্তু মানুষের কাছে কাছে, তার কোণে আশে পাশে রয়েছেন এই সব 'অপ' নয়, উপ-দেবতারা। গ্রীকেরা বলত আকাশে বা আকাশচুম্বী পাহাড়ের চূড়ায় (অলিম্পাস্—Olympus) থাকে এক শ্রেণীর—উচ্চবর্গের দেবতা, যথা, জুপিতর, আপোলো প্রভৃতি আর পৃথিবীর জলেস্থলে, নদীতে বুকে মাঠেবাটে থাকে নিম্ফ (nymph), সাটির (satyr), প্যান (Pan), ড্রায়াড (Dryad), নায়াড (Naiad) কত দৈব-সত্তা। এদের কি ক্ষমতা, কি ভূমিকা? এরা একদিকে স্বর্গের দুয়ার আগলে আছে—তুমি যাবে উচ্চতর গভীরতর আলোকের আনন্দের ভোগের শক্তির লোকে? আগে তবে এই দৌবারিকদের আরাধনা করতে হবে, প্রসন্ন করতে হবে। জাননা, সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ বেশি?

আমাদের কবি কোন দেবতার আবাহন করছেন—কস্মৈ দেবায়? পৃথিবীর কোন উপদেবতা তাঁর চিত্ত আকর্ষণ করেছে? নাম শুনে স্তম্ভিত হবেন না—এ হল "ব্যাঙের ছাতা"; তবে একে সম্ভ্রম করতে পারেন এর সংস্কৃত নামটি শুনলে, তা হল "ছত্রক", কালিদাসের শিলীন্ধ্র, পৃথিবী ফুঁড়ে ফুটে ওঠে যে—কালিদাস বলছেন শিলীন্ধ্রই প্রমাণ করল যে পৃথিবী

অবন্ধ্যা—কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং (মেঘ ১৬১)—ব্যাঙের ছাতার অধিষ্ঠাতৃ দেবকে কবি স্তুতি করছেন—কেন, কি উদ্দেশ্যে? শিলীন্ধ্রের কি ক্ষমতা? এখানে আমাদের একেবারে একটা রহস্যলোকে গিয়ে পৌঁছতে হবে—কবি নিজেই ত Mysteries এর কথা বলছেন।

প্রাচীন যুগে কোন সাধনায়, যোগ সাধনায় (এরই নাম mysteries) এই গাছড়া বা বনৌষধিটির বিশেষ গুণের জন্য বিশেষ প্রয়োগের প্রচলন ছিল। এ দ্রব্যটি সেবন করলে এনে দেয় মাদকতা, একটা হয়তো তীব্র এবং বিষাক্ত মাদকতা। এরকম মাদকতার ফল কি? আমাদের দেশেও সাধু বা সাধক সম্প্রদায় বিশেষে সিদ্ধি গাঁজা ভাঙ, ধান্যেশ্বরী প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার আছে। যোগ-সাধনা, আন্তর চেতনার অনুশীলন প্রসঙ্গে আজ-কাল পাশ্চাত্য দেশে আলডুস্ হাক্স্লে (Aldous Huxley) এই রকম দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। বৈদিক ঋষিদের দোবলতা কি এইজাতীয় দ্রব্য এবং এই জাতীয় উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হত? যা হোক এরকম বামপন্থী সাধকেরা বলে থাকেন, মাদক-করণের গুণ হল স্থূলমুখী জড়চেতনার প্রাধান্যকে স্তিমিত ও স্তম্ভিত করা, এই বাধা নিরাকরণের বা লঘুকরণের ফলে সূক্ষ্মচেতনা, আন্তরচেতনা প্রস্ফুটিত প্রকটিত হতে পারে।

আমাদের বর্ত্তমান কবিও ঠিক এই কথা বলছেন শিলীন্ধ্র-দেবকে,—বলছেন, তুমিই এনে দাও দৃষ্টি, তুমিই পারে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও অমর দেবতাদের মধ্যে—কারণ তুমিই হলে দেবতাদের আহার্য্য ambrosia; শুধু তাই নয়, এই অমৃত সেবন করলে দেহের মধ্যে থেকেই স্বর্গভোগ করা যায়—ইহৈবতৈর্জিতং উপনিষদ বলছে—বর্ত্তমান কবিও বলছেন:

That he may pass me through when my star falls
Who have ambrosia eaten, and yet live.

—star falls অর্থ জীবনের শেষ, ঐহিক জীবন যখন শেষ হয়ে গিয়েছে—অথচ আসল জীবন শেষ হয়নি—and yet lives.

কবি কি রকমে এই দেবতাকে আবাহন করেছেন,—তাঁর মন্ত্রটি আমরা পুরোপুরি দেখি তাহলে—

প্রথমে বলছেন দেবতার জন্মকথা। এখানে তবে আর একটি সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হয়। ছোট দেবতার উল্লেখ করেছি। কিন্তু ছোট দেবতার পিছনে রয়েছেন ছোট নয়, একরকম বড় দেবতাই। এই যে শিলীন্ধ্র—তাঁর অধিষ্ঠাতৃ দেব হলেন ফলতঃ দিওনীসস্ (Dionysus); এই গ্রীক দেবতা হলেন আনন্দের উল্লাসের ভোগের তারুণ্যের,—উন্মাদক-তার প্রতীক, আর এ আনন্দ হল পার্থিব আনন্দ। স্বর্গে যা অমৃত-রস, এখানে তা নিহিত মদ্য-রসের মধ্যে। শিলীন্ধ্র ও ambrosia এক পর্য্যায়ের পদার্থ। শিলীন্ধ্রের জন্ম Dionysus এর জন্মের মত। স্বর্গের রাজা জিয়ুস্ বজ্রের বিদ্যুতের রূপ নিয়ে দিওনীসসের মাতার (সেমেলে) যখন উপগত হলেন তখন দিওনীসসের উদ্ভব—ব্যাঙের ছাতারও জন্ম তাই, বর্ষার

বজ্রের বিদ্যুতের মধ্যে পৃথিবীর কোলে। পূর্বেই বলেছি দেবতা দুজনের, স্বর্গের ও পৃথিবীর। বৈদিক ঋষি বলছেন স্বর্গ হল আমাদের পিতা, আর মাতা হল এই পৃথিবী—দ্যৌর্মে পিতা মাতা পৃথিবীয়ম্। বেদান্তীরা প্রধানতঃ পূজা করেন পিতাকে, আর আগমিকেরা পূজা করেন মাতাকে। স্বর্গ ভূমা হল আলোর লোক আর পৃথিবী বা ভূ হল ভোগের আনন্দের লোক। বলেছি, উপরে হলেন আপোলো (Apollo), জিয়ুস, জুনো. আর নীচের এখানে হলেন দিওনীসস—বাকাস্ (Bucchus), দিওনীসস্ মাতা সেমেলে এবং স্বয়ং আফ্রোদিতে—

যা হোক, কবি তাই বলছেন, বিদ্যুতের বজ্রপতনের মধ্যে জন্ম শিলীভ্রের, তাই বজ্রসার সার্থক তার। জন্ম ত এই, স্থিতি তার পৃথিবীব্যাপী এবং শাশ্বতকাল। সৃষ্টির আদিকাল থেকে পৃথিবী ফুঁড়ে ফুটে উঠছে এ দেবতা যত্রতত্র—আনন্দ উপভোগ, উন্মাদকতা ও দিব্য-দৃষ্টির উৎস সে—তার পূজা অর্থ পৃথিবীর পূজা, দেব দিওনীসসের পূজা। এ হেন দেবতাকে যথাযথ পূজা করতে হয়, তাকে আত্মদান করতে হয়। একবার কোন দস্যুরা তাকে নিজেদের স্বার্থের জন্য দখল করতে, বন্দী করতে চেয়েছিল, ফলে যা হয়েছিল, তার বিবরণ কবি দিয়েছেন—তাদের গতি বন্ধ করে সাগরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু যে তার অনুগত ভক্ত কোন জগৎ দেখান তাকে তিনি, কোন অপরূপ লোকাতীত সৌন্দর্যের আনন্দের মধ্যে নিয়ে যান তিনি? শুনুন তবে কবির বাণী :

আমাদের সম্মুখে গান গেয়ে চল,
ধরিত্রীর রাণী।
তোমার সন্তান দেবতাটির সোদর আমি
তার সঙ্গে চলি সতীর্থ হয়ে,
চলি শুভতায় সম্পূটিত তার রামধনু-গড়া
প্রচ্ছদপটের ভিতর দিয়ে,
চলি জলের তলে হিমশীতল গুহ্য গহ্বরের ভিতর দিয়ে,
যেখানে শুশুকেরা পার্থরের কোলে কোলে
তাদের গতিভঙ্গ বয়ন করে চলেছে,
কৃপাণের মত ঝলমল জঙ্গলের, কল্পনার মত জটাজালের
ভিতর দিয়ে,
ভীতির সব কক্ষের ভিতর দিয়ে,
দুঃস্বপ্ন দিয়ে তৈরী যাদের ছাত,
প্রজ্বলন্ত সব ভাণ্ডার-ঘরের ভিতর দিয়ে,
মণি মুক্তা দিয়ে তৈরী যাদের দেয়াল,

তাদের গম্বুজ স্থাপিত স্তম্ভমালার উপর,
উৎকীর্ণ নায়িকামূর্তি প্রলম্বিত যেখান হতে,
সব শেষে উঠে যাই পাখায় ভর করে যেন
নির্মল আকাশে,
সেখান থেকে হানি রাজার শ্যেনদৃষ্টি
নন্দনের পঞ্চবিধ ফলের বাগানের উপর—

পঞ্চবিধ ফলের উপভোগে যে চরম আনন্দ সে ফলের নাম নাই জানলাম—কিন্তু তার রসের কথঞ্চিৎ এই নমুনা কবিতাখণ্ডের মধ্যে আস্বাদ করি না? আরো একটু শুনি তবে—ছন্দকের অধিষ্ঠাত্রী আনন্দময়ী কি মোহন যাদু বিস্তার করে দিয়েছেন আমাদের প্রাণের উপর—

তন্দ্রালসা তবু গান গেয়ে চলেছে
স্নেহার্দ্র কণ্ঠ তার—স্বরগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছে,
সোনার শৃঙ্খলে ওতপ্রোত, ধীরে ঢালা যেন
নীলজলীনের ভিতর দিয়ে,
কিম্বা তারা যেন পাতার মত মেলে দেয় আপনাদের
সবুজ বোঁটার উপর,

আরো

সমুন্নত তরুর মত, তাতে কুঁড়ি হয়ে ঝুলে রয়েছে তারই
আপনার মধুরাজি...
আর সে যখন থেমে যায়, আমার হৃদয় শঙ্কিত হয়ে ওঠে
যতক্ষণ না আবার তার কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে...

শ্রীঅরবিন্দের একটি কবিতা আছে যার নাম The Other Earths (Collected Poems—Book II. P. 299)। তার অর্থ পৃথিবীর মত আরো পৃথিবী রয়েছে, তার প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব বা আদিরূপ হিসাবে—পৃথিবীর মতই তারা বিচিত্র, সুন্দর, মনোহারী। আমরা অন্ধ, তারা দৃষ্টিপথে তাই আসেনা। কিন্তু চক্ষুর চক্ষু যদি খোলে তবে দেখি—

Calm faces of the Gods on backgrounds vast
Bringing the marvel of the infinitudes,
Through glimmering veils of wonder and delight
World after world bursts on the awakened sight.*

---

* নিম্নে বিপুল ধরার সব, তার উপর ভেসে উঠেছে দেবতার মুখরাজি
নিয়ে এসেছে তারা অনন্ত আনন্দের মহিমা
বিস্ময়ের পুলকের আলোকলসিত আবরণের ভিতর দিয়ে
জাগ্রতের দৃষ্টিপথে ফোটে পড়েছে এসে জগতের পর জগৎ।

তবে শ্রীঅরবিন্দের আন্তর বা উত্তর লোকে আমরা গিয়ে পৌঁছি যেন আলোর থেকে আলোর ভিতর দিয়ে আলোকের মধ্যে, শুদ্ধ নির্মল স্বচ্ছ হাওয়ার ভিতর দিয়ে—এখানে শিল্পীদ্রের কবি নিয়ে চলেন যেন কটুতিক্তকষায় গাঢ়ঘন নরতার ভিতর দিয়ে। তবে এখানেও মুক্তি এবং আনন্দই যদি লক্ষ্য হয় তবে আশা করি একটা পরিস্রবণের পরিশোধনের ফলে পরিণামে পৌঁছে যেতে পারি সত্য সত্যই কোন দেবত্বের লোকে।

কিন্তুত ছাতা মাথায় নরম শাঁসালো মসৃণ দেহ কিন্তু আদাড়ে-বাদাড়ে জাত এই যে দেবতারা গুল্মটি, মনে হয় এ আমাদের স্থূল পার্থিব দেহখানিরই প্রতীক—এইরকম একটা দেহ বহন করেই আমাদের ঊর্ধ্বায়ণের চেষ্টা করতে হয়—তাকেই তো বলা হয় কায়াশুদ্ধি ও কায়াসিদ্ধি। এরপর এক আন্তর রসায়ণে পরিপ্লুত, তার ভাবণে শোধনে সেবনে প্রকাশ পায় উদ্বুদ্ধ হয় যে দেবশক্তি, সে এনে দেয় দিব্যদৃষ্টি, নিয়ে যায় প্রচ্ছন্ন লোক লোকান্তরে—এক পরম আনন্দময় অমৃতময় আয়তনে। বৈদিক ঋষিও বলছেন সোমলতাকে অর্থাৎ সোম-দেবতাকে লক্ষ্য করে—হে সোমদেব তুমি যেখানে প্রবহমান সেখানে নিয়ে গিয়ে আমায় অমর করে ধর—তত্র মাং অমৃতং কৃধী। কারণ সেখানেই রয়েছে যত আনন্দ, মুদ, মোদ, প্রমুদ আর কামনা কাম:—এরাই নয় কি স্বর্গের সেই পঞ্চবিধ ফল, পাশ্চাত্যের কবি যার উল্লেখ করেছেন?

THE MYSTERIES OF THE TOADSTOOL GOD

Little slender lad, whose flesh is bitter,
Lightning engendered, born from dung of mares,
For whom ages and leagues are dice to throw with,
Smile back at me: for while entranced you wander
Through everywhere and nowhere,
Drunk with our Virgin Mother's hymn
Of ecstasy to your immanent godhead,
Entranced I follow.

Little secret god, toad-headed,
Grand-master of magicians,
When pirates stole you at Icaria
Wild ivy gripped their rigging, every oar

Changed to a serpent, panthers held the poop,
A giant vine sprouted from the mast-crotch,
And overboard they plunged, the whey-faced crew—
So perish all who flout you.
Lead us with your song, Queen of the Earth !
Twinned to the god, I follow comradely
Through his first rainbow-limbo, webbed in white,
Through chill Tyrrhenian grottoes, under water,
Where dolphins weave among the marble rocks,
Through sword-bright jungles, tangles of conjecture,
Through halls of fear ceilinged with incubi,
Through blazing treasure-chambers walled with gems,
Their domes pillared with naked Caryatids;
Then mount at last on wings into pure air,
Peering down with regal eye upon
Five-fruited orchards of Elysium.

And still she drowsily sings:
Tender her voice, the notes come linked together
In intricate golden chains paid out
Slowly across brocaded cramoisy,
Or unfold like leaves from the jade-green shoot
Of a rising tree whose blossoms are her tears...
O, whenever she pauses, my heart quails
Until the sound renews.

Phryneus, lender of sight, forgive me
Should I have uttered word, or words, amiss :
Speak for me to Heaven's porter Ogmius,
Propped on his oak-club by the brazen Gate,
That he may pass me through, when my star falls
Who have ambrosia eaten, and yet live.

The London Magazine
Spring Number 1960

ROBERT GRAVES

শ্রীমা প্রসঙ্গ*

ডক্টর কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

(১)

১৯১৪ সালে মে মাসের গোড়ার দিকে শ্রীমার স্বাস্থ্য ভগ্ন হল "এবং কয়েকদিন ধরে শরীরে কোন শক্তি ছিল না"। (১) এ যেন ইঙ্গিতে বলছে তাঁর কাছে যে "আমার আধ্যাত্মিক বল হ্রাস পেয়েছে, সর্বশক্তিময় একত্বের দৃষ্টি আমার মলিন হয়েছে...।" (২) মায়ের আলাপ বইটিতে সবিস্তারিতভাবে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে—

"কোথায় যোগের আরম্ভ, আর কোথায় তার শেষ? তোমার সমগ্র জীবনটাই কি যোগ নয়? ব্যাধির সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে তোমার দেহের মধ্যে এবং তোমার চতুর্দিকে। তোমার শরীরের ভিতরে তুমি সদাই নানা রোগের বীজাণু বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমার চারিপাশে তারা দলে দলে সব সময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা হলে এমন কেন হয় যে বহু বৎসর ধরে তুমি বেশ আছ আর হঠাৎ একটা রোগ তোমাকে পেড়ে ফেললে? তুমি বলবে যে তার কারণ প্রাণশক্তির দুর্বলতা। কিন্তু এ দুর্বলতাই বা হঠাৎ এল কোথা থেকে? এল তোমার সত্তার মধ্যের কোন অসমতা অসঙ্গতির থেকে, এল তুমি দিব্যশক্তিচয়কে গ্রহণ করতে পার নাই বলে। যখন তুমি এই শক্তির ও দীপ্তির আশ্রয় হ'তে নিজেকে বঞ্চিত কর, তখন তোমার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়, ডাক্তারী ভাষায় রোগের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী হয়, সেই সুযোগ পেয়ে বিরুদ্ধ শক্তিগুলো এসে হানা দেয়। সংশয়, ভরসার অভাব, বিশ্বাসের অভাব, কেবল নিজের অহমিকার দিকেই তাকিয়ে থাকা, এই সবই তোমাকে বঞ্চিত করে ভাগবত শক্তি ও দীপ্তির আশ্রয়ের থেকে, আর শত্রুর আক্রমণকে সহজ করে দেয়।" (৩)

শ্রীমা হলেন অক্ষয়, অজর অসীম-স্বরূপিণী মা, যিনি সাধারণ মানসিক গঠনভঙ্গির দৃষ্টিতে সুখ ও দুঃখের অতীত, সুস্থতা ও অসুস্থতার অতীত, বিশ্বাস ও দ্বিধার অতীত; তবুও তিনি মানবমাতার পরাকাষ্ঠা, 'দুঃখের মানুষী বিগ্রহের' সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন, যা-ই সাকাৎ করেন তারই অংশ তিনি, সকল আনন্দ ও সকল আর্তির সমভাগী; তাই তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনার সুর নানা ব্যঞ্জনায় ঝঙ্কৃত, কখনো পূর্ণপরিণতির প্রশান্তি-স্তোত্রে গাঁথা, কখনও আবার অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবের ক্ষয়িষ্ণু বিফলতা ও ব্যর্থ প্রয়াসে অনুচ্চকণ্ঠে দুলিত বর্ণিত।

---

* On the Mother—Chapters XV-XVII.

1 Prayers and Meditations—P. 105

2 Prayers and Meditations—P. 105

3 Words of the Mother-Pp. 117-118

১৯১৪ সালের ১২ই মে তারিখ দিয়ে শ্রীমা লিপিবদ্ধ করলেন আর এক অভিনব অভিজ্ঞতা—

"আজ সকালে আমার অভিজ্ঞতা হল : আমি দ্রুত চলে গেলাম গভীর হতে গভীরে, তারপর যেমন সচরাচর আমার হয়ে থাকে, তোমার চেতনার সঙ্গে আমার চেতনা সংযুক্ত হয়ে গেল। তোমারই মধ্যে রয়ে গেলাম, অর্থাৎ এক তুমিই রয়ে গেলে—কিন্তু তোমার ইচ্ছাবল আমার চেতনাকে বাহিরের দিকে টেনে আনলে, যে কর্ম্ম উদ্‌যাপন করতে হবে তার দিকে, আর তুমি আমায় বললে 'যে যজ্ঞের আমার প্রয়োজন তোমাকে তাই হতে হবে।' এ কি তবে সেই অন্তিম ত্যাগ নয়, তোমার সঙ্গে একত্বের ত্যাগ...।" (১)

বুদ্ধ যখন বোধিসত্ত্ব হলেন তখন কি স্ব-ইচ্ছায় নির্বাণকে ত্যাগ করেননি যা'তে তিনি তিনি এই সন্তপ্ত মর্ত্যে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারেন ও আপন মানুষজনের আত্মাকে পুনরুদ্ধার করতে পারেন। অভয়ংকর বুদ্ধের মত শ্রীমা-ও তাঁর চরম ও পরম ত্যাগের দ্বারা দেখালেন "সেই সৃষ্ট ও অপূর্ণ আত্মার দিকে স্বজনকল্প পূর্ণ আত্মার সবপ্রগতি, সেই স্থাননুক্ত ভগবানের স্থান ও কালের মাঝে স্বেচ্ছায় আত্ম-প্রকাশকে।" (২) অনির্ব্বাচিত আত্ম-সম্পুটনের দ্বারা "তোমার একত্ব আর প্রকটিত জগতের মাঝখানে যে অন্তর্বর্ত্তী লোক" (৩) সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে উভয়ের মধ্যস্থ ব্যবধানটি শ্রীমা আরো ঘুচে দেবেন, ঈশ্বরের আনন্দ্যকে বস্তুজগতে টেনে আনবেন এবং তাকে তুলে ধরবেন তাঁর সক্রিয় তেজরশ্মিকে গ্রহণ করবার জন্যে। প্রার্থিত সন্ন্যাস সহজেই অনুমোদন করা হয়েছিল কেননা শ্রীমা ঈশ্বরের এই প্রেমদীপ্ত ভরসা পেয়েছিলেন "একদিন তুমি হবে আমার শিরোদেশ, এখন তুমি দৃষ্টি দাও পৃথিবীর দিকে।" (৪)

এখন আর মানসিক বিক্ষোভ বা সংশয়ের কোন স্থান নেই চরম লক্ষ্য বা তাতে পৌঁছানর উপায় নির্দ্ধারণে, এ সম্বন্ধে কোন দ্বার্থই নেই আর। এইভাবে শ্রীমা ১৬ই মে, ১৯১৪ সালে লিখলেন—

"এখন আমি স্পষ্টই বুঝতে পারি যে তোমার সঙ্গে একাত্মতা দূরের লক্ষ্য নয় যার দিকে ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে—অন্ততঃ বর্ত্তমানের এই ব্যক্তিসত্তাটির পক্ষে নয়—কারণ, বহুদিন হতেই সে সিদ্ধি তার লাভ হয়েছে, তাই ত তুমি যেন সর্ব্বদা আমায় বলছ "এই একাত্মতার ভাবাবেশে বিভোর হয়ে যেও না ; পৃথিবীতে যে ব্রতের ভার তোমার উপর দিয়েছি তাই তুমি পূর্ণ কর।...সকলের কাছে বুঝিয়ে বলতে হবে আগে দরকার একত্ব, তারপর কর্ম্ম। কিন্তু

---

1 Prayers and Meditations—P. 108
2 Underhill " Man and the Supernatural "—P. 143
3 Prayers and Meditations—P. 110
4 Prayers and Meditations—P. 113

যাদের একাগ্রতা অধিগত হয়েছে তাদের দেখতে হবে জীবনের প্রতি মুহূর্ত যেন হয় তাদের তোমার ইচ্ছার অখণ্ড প্রকাশ।" (১)

একমাস না যেতেই শ্রীমা আবার লিখলেন...

"প্রথমে জয় করতে হবে জ্ঞান অর্থাৎ শিক্ষা করতে হবে কি রকমে তোমাকে জানা যায়, তোমার সঙ্গে এক হওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে সব রকম উপায়ই উৎকৃষ্ট, সবকেই কাজে লাগান যেতে পারে।...তোমাকে জানা চাই, প্রথমে ও সকলের আগে —সত্য কথা। কিন্তু তোমাকে জানবার পর বাকী রয়ে গেল তবু তোমার প্রকাশের সব কাজটাই—যার তখনই দেখা দেয় এই প্রকাশের গুণ, শক্তি, জটিলতা, পরিপূর্ণতার কথা সব।" (২)

মানুষকে দিব্যে পরিণত করা, ব্যবহারিক জীবনকে রূপান্তরিত করা, এ দু'ল সত্যই এক "বিরাট" কর্মসূচী। এর কল্পনাই শ্রীমার সমগ্র সত্তাকে পুলকিত করে তোলে, আত্মসমর্পণের প্রতিজ্ঞা যেন নূতন সুরে উচ্চারিত হয়ে অনির্বাণের অনুদাত্ত স্বরে স্পন্দিত হয় :

"একটা সত্যকার সৃষ্টির কাজই আমাদের করতে হবে—সৃষ্টি করতে হবে নবতর কর্ম, নবতর জীবনধারা, যাতে এই যে মহাশক্তি পৃথিবীতে এ যাবৎ অপরিজ্ঞাত রয়েছে তার প্রকাশ হতে পারে পূর্ণ পরিপূর্ণতা নিয়ে। এই নবজন্মদানের মহাপ্রয়াসে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি, হে ভগবান....দিয়েছ তোমার প্রতিশ্রুতি, এ সব জগতে তাদের তুমি পাঠিয়েছ যারা—বন্ধু হোক আর শত্রু হোক—তোমার প্রতিশ্রুতিকে রূপদান করে তুলতে পারে।...এ কাজ যখন করতে হবে, তখন তা করা হবেই।"(৩)

(২)

ব্যক্তি, বিশ্ব, বিশ্বাতীত : শ্রীমা কখনও এর একটি, কখনও ওটি, আবার কখনও অন্যটি ; তাই শ্রীমার ধ্যান ও প্রার্থনাও কখনও এ স্তর, আবার কখনও অন্য স্তর থেকে প্রবাহিত হয়। আর, যে করেই হোক, না যেমন সর্বদা যুগপৎ এই ত্রিপদে অধিষ্ঠিত, তেমনি তাঁর অন্তরাত্মার এই শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর অন্তরস্থ চিৎশক্তিতে রয়েছে এক বহুত্বের সংযুক্ত সমাহার, এক আশ্চর্য্য একত্ব। যখন তিনি ধ্যান করেন, সমস্ত মানবের প্রতিনিধি হয়েই ধ্যান করেন ; যখন তিনি প্রার্থনা করেন তখন মানবজাতির কল্যাণার্থেই করেন, যাতে মানবের উদ্ধারসাধন হয় তারই জন্যে প্রার্থনা করেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন ও অলৌকিক দর্শন, তাঁর সজাগ চিন্তা ও সঙ্কল্প, এ সবই প্রয়োজনের তাগিদ, আপূহা ও ক্ষুধিত মানবের

1 Prayers and Meditations—Pp. 112-113
2 Prayers and Meditations—Pp. 133-184
3 Prayers and Meditations—P. 135

আশা আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ—সে ক্ষুধা হল পরিপূর্ণ স্থিতির, পূর্ণ জ্ঞানের ও পরম আনন্দের তরে। ৩১শে মে, ১৯১৪ সালে শ্রীমা তাঁর রূপান্তরের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করলেন, তা হল—

"প্রশান্ত সন্ধ্যার আত্মসমাহিতির মধ্যে সূর্য্য যখন ডুবে গেল, আমার সমগ্র আধার তোমার কাছে প্রণত হল, ভগবান, মৌন পূজা নিয়ে পূর্ণ সমর্পণ নিয়ে। আমি হয়ে গেলাম সমস্ত পৃথিবী—সমস্ত পৃথিবী তোমার কাছে প্রণত হল, তোমার জ্যোতির আশীর্ব্বাদে, তোমার প্রেমের পরমানন্দ ভিক্ষা করে। পৃথিবী নতজানু হয়ে মিনতি জানায় তোমার কাছে—রাত্রির নীরবতায় অন্তর্মুখ হয়ে যায়, ধৈর্য্য ধরে, সেই সঙ্গেই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে তার পরম কাম্য জ্যোতির আবির্ভাবের জন্য। জগতের কর্ম্মে অবতীর্ণ তোমার প্রেম হয়ে ওঠায় মাধুর্য্য আছে—অনুরূপ মাধুর্য্যই আছে এই অসীম প্রেমের দিকে ঊর্দ্ধে উঠে চলে যে অসীম আস্পৃহা তা হয়ে ওঠায়। আর এই রকমে নিজেকে পরিবর্ত্তন করে ধরা, পরপর কি প্রায় যুগপৎ হয়ে ওঠা, যে গ্রহণ করে আর যে দান করে, যে রূপান্তরিত হয় আর যে রূপান্তরিত করে, একদিকে বেদনাক্লিষ্ট অন্ধকার, অন্যদিকে সর্ব্বশক্তিময় দিব্য-জ্যোতি। দুয়েরই সঙ্গে একাত্মতা এবং এই যুগল একাত্মতার মধ্যে তোমার সর্ব্বোত্তম একত্বের রহস্য আবিষ্কার—এ কি তোমারি পরা ইচ্ছাকে, একভাবে প্রকাশ করা পূর্ণ করা নয়?" (১)

এইভাবে দেখলে শ্রীমা হলেন ক্ষুধার্ত তমসাচ্ছন্ন বস্তুজগৎ ও শুদ্ধ আনন্দময় জ্যোতির্ময় পরম সদ্‌বস্তুর মধ্যে একমাত্র সূত্র, সংযোজক ও সেতু। পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে শ্রীমা যদি বিনম্র নতজানু হয়ে ভগবানের প্রার্থনা জানান, তখন তিনি বর্ত্তমানের শান্তি এবং ভবিষ্যতের মুক্তির জন্য কিছু পরম অবতরণ করান না সেই অমৃতোদ্ভাসে বরদানে আশীর্বাচনে—

এখনও যাই হোক না তারা
আমাদের কাছে দিনের আলোর নির্ঝরিণী,
এখন তারা আমাদের দৃষ্টির কাছে নয়নাভিরাম;
তারাই আমাদের ঊর্দ্ধে ধরে তুলে, পালন করে, সমর্থ আমাদের
কোলাহল-মুখর জীবনের যত বৎসরকে নীরব শাশ্বত
সত্তার কয়েকটি ক্ষণে ধরে দিতে,
সেই জাগ্রত সত্য সব
যাদের নেই আর বিনাশ।

এইভাবে ৯ই জুন, ১৯১৪ সালে শ্রীমা প্রতিনিধি হ'য়ে যে আশীষ পেলেন তা তিনি পৃথিবীকে জানালেন এই ভাষায়—

---

1 Prayers and Meditations p. 127

"প্রেমের এক বিপুল তরঙ্গ সকল জিনিসের উপর নেমে এসেছে, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

শান্তি, শান্তি হোক সকল পৃথিবীর—হোক বিজয় পরিপূর্ণতা মহাবিস্ময়।

হে আমার সন্তান সব, বেদনা-কাতর, জ্ঞানহীন তোমরা! আর তুমিও বিদ্রোহী প্রচণ্ড প্রকৃতি, খোল তোমরা তোমাদের হৃদয়, শান্ত কর তোমাদের বেগ, এই দেখ প্রেম তার মধুর সর্বশক্তি নিয়ে এসেছে, এই দেখ জ্যোতি তার বিশুদ্ধ ছটা নিয়ে তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে। এই যে মানবীয় এই যে পার্থিব মুহূর্ত, সকলের চেয়ে শুভ মুহূর্ত। প্রত্যেকেই, সকলেই জানুক, উপভোগ করুক পরিপূর্ণতার অধিকারী হয়েছে তারা।

আর্ত হৃদয় কাদের, কাদের ললাট চিন্তাক্লিষ্ট। হে মূঢ় অন্ধতা, হে অজ্ঞান অপচিকীর্ষা, তোমাদের যন্ত্রণা শান্ত হোক, মুছে যাক।

এই যে নববাণী এসেছে তার ভাস্বর মহিমায় : 'আমি এখানে।' (১)

বাস্তবিকই শ্রীমা হলেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না সহকর্মিনী ও মহাশক্তিসম্পন্না যোগসূত্র—আবার সর্বদা তিনি শ্রীমা, একান্ত মা।

শুধু এই নয়, এর পর আরও কিছু ; কারণ যোগসূত্র ও সহকর্মিনীই হলেন সৃষ্টিকর্ত্রী এবং কেবল শ্রীমা-ই নয়, সামান্য তুচ্ছ মানুষটিও পর্য্যন্ত মূলত এই তিন। শ্রীমা লিখিয়েছেন যে "হতে হবে দর্পণের মত, সমানে প্রতিফলন করবে, সমানে থাকবে নির্মল, দৃষ্টি রাখবে যুগপৎ বাহিরে ও ভিতরে। একদিকে প্রকাশের পরিণতি আর একদিকে প্রকাশের উৎস উভয়ের উপর, দেখবে যাতে কার্য্য সব তাদের কারণ ভাগবত এশ্বর্য্যের সম্মুখে স্থাপিত হয়। মানুষের কর্তব্য হল এই সকল হওয়া...দুটি ভাব মিলিয়ে ধরতে হবে, একদিকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে যাওয়া, আর একদিকে সক্রিয়ভাবে সংসিদ্ধ করে চলা—ঠিক এইটি হল সবচেয়ে কঠিন কাজ। ভগবান, আর এইটিই তুমি চাও আমাদের কাছ থেকে। তবে তুমি যখন চেয়েছ তখন নিঃসন্দেহে সিদ্ধির উপায়ও তুমি আমাদের এনে দেবে।"(২) অবশেষে যখন আমরা এই অবসাদকারী অন্ধ অনুপযুক্ততা থেকে উঠে আসতে পারব তখন লাভ না থেকেও উদ্যম হবে আমাদের, অহং-ব্যষ্টির কারাঘরে আটক না হয়ে পাব সার্থক ব্যক্তিত্ব।(৩) তখন ক্রমশঃ আমরা ছাড়িয়ে উঠব দুর্ভেদ্য অহন্তার পার্থিব শত প্রমাদ, "বিশ্বব্যাপী যে প্রমাদ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হয়ে চলেছে।"(৪) এইভাবে যখন ব্যক্তিগত সত্তা নিজেকে বিস্তৃত, কলঙ্ক হ'তে নালিন্যমুক্ত করে এবং ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবার প্রয়াস করে তখনই সেই সর্বশক্তিনিয়ের অবরোহণ ও আমাদের প্রাকৃত সত্তার রূপান্তর এবং নবশক্তির ও নবরাজ্যের

---

1 Prayers and Meditations Pp. 131–132
2 Prayers and Meditations P. 140
3 Prayers and Meditations P. 145
4 Prayers and Meditations P. 149

বিপুল সিদ্ধির শুভক্ষণ দেখা দেবে। এই বিপুল সিদ্ধি স্বপ্নমাত্র নয়, তা আসবে, অব-ধারিত আসবে। ভক্ত ভগবান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই বিরাট রূপান্তর কর্ম্মের সংসাধনে। ভগবান যখন ভক্তকে আশ্বাস দিয়েছেন এই বলে, "যা হওয়া উচিত তা হবেই, যেমন প্রয়োজন তেমন যন্ত্রও তৈরী হবে, তুমি চেষ্টা করে যাও দৃঢ় প্রত্যয়ের শান্তির উপর দাঁড়িয়ে।"(১) তখন ভক্তও দিয়েছে তার সম্মিত উত্তর, "আমাকে দয়া দেখিও না, তোমার সর্ব্বশক্তি নিয়ে পূর্ণভাবে কাজ কর, তুমি যে আমার মধ্যে অখণ্ড রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করেছ।"(২)

(৩)

১৯১৪ সালের ২১শে জুলাই—শ্রীমা এক আনন্দপূর্ণ একত্বতার অভিজ্ঞতা পান, যে অভিজ্ঞতা কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের "টিনটার্ন এ্যাবি"র থেকে বিশেষ পৃথক নয়

সেই শান্ত কল্যাণী মানস বিহার,
যেখানে...এই মৃন্ময় দেহের নিঃশ্বাস,
আমাদের এই নরশোণিতের গতি পর্য্যন্ত
প্রায় নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত আমরা
দেহীরূপে, অথচ হয়ে উঠি জাগ্রত আত্মা।

কিংবা কবি শেলের "পারাডিসো"—

"যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দর্শনেন্দ্রিয়কে চমকার করে ভেসে দেয় যাতে স্পষ্ট জিনিসকেও চোখ দিয়ে দেখার ক্ষমতা হরণ করে; তেমনি আমার চারিপাশে এক জীবন্ত জ্যোতি যেন দেখা দিল, আমাকে ফেলে দিল সে প্রদীপ্তির বন্ধনজালে, আর কিছুই আমি দেখতে পেলাম না তারপর।"(৩)

"সীমাহীন একত্বের জ্যোতিতে বিহ্বল হয়ে
আমি অনুভব করলাম আমার সত্তার উপর পড়েছে
যেন একটি নির্ব্বাক মুহূর্ত্তের অলসভার—
অন্তত শত শতাব্দীর যে ভার পড়েছিল
'আর্গো'র অপরিচিত সমুদ্রে পারাপারের অভিযানে তার চেয়েও ভারী।"(৪)

শ্রীমার আনন্দোল্লাসের প্রোজ্জ্বল অসীমত্ব, যদিও তার স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য, এই যথাযোগ্য প্রশান্তি ও স্বচ্ছতায় খানিকটা প্রতিফলিত—

"শরীর ছিল না, কোন রকম শারীর বোধও ছিল না—ছিল একটা আলোর স্তম্ভ, যেখানে

1 Prayers and Meditations P. 151
2 Prayers and Meditations P. 155
3 Book XXX.
4 Book XXXIII.

সাধারণতঃ দেহমূল সেখানে থেকে উর্দ্ধে উঠে গিয়েছে যেখানে মস্তক থাকে সেই অবধি, এখানে তা রয়েছে যেন আলোর একখানা থালা, চাঁদের মত। তারপর সেখান থেকে স্তম্ভটি আরো উঠে গিয়েছে, মাথা থেকে বহুদূরে, শেষে ফুটে উঠেছে প্রকাণ্ড এক প্রোজ্জ্বল নানা-বর্ণময় সূর্য্যমণ্ডল হয়ে—এই সূর্য্য থেকে সোনালী আলো বর্ষণধারার ঝরে পড়ছে, সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলছে।

তারপর আলোকস্তম্ভটি নীচের দিকে আবার ফিরে এল, জীবন্ত আলোর একটা ডিম্বাকার ঘের হয়ে। প্রথমে মস্তকে, তারপর ক্রমে কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, মেরুদণ্ডমূল এবং আরো নীচে এই রকমে ধাপে ধাপে প্রত্যেক চক্রটিকে জাগিয়ে তুললে, সক্রিয় করলে, প্রত্যেকের নিজের ধারায়, আপন স্পন্দন বৈশিষ্ট্যে। জানুতে পৌঁছে উর্দ্ধমুখী আর অধোমুখী ধারা দুটি এক হল। এই রকম একটা নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে আর কোন ছেদ রইল না, সমস্ত আধারকে ছেয়ে রাখল বিপুল এক আলোর ঘের।

ধীরে ধীরে তারপর চেতনা আবার নেমে এল ধাপে ধাপে, প্রত্যেক চক্রে থেকে থেকে যে পর্য্যন্ত দেহ-চেতনা ফিরে না এল। যতদূর মনে হয়, চেতনা দেহে ফিরে এল যেখানে তা হল নবম ধাপ। তখনও কিন্তু বাহ্যশরীর সম্পূর্ণ অচল আড়ষ্ট।"(১)

সেন্টজন্ অব দি ক্রশ তাঁর নিজের আত্মোপলব্ধির বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন "তারপর আমি সব কিছু ভুলে গেলাম...সব গেল থেমে এবং আমার অস্তিত্বও লোপ পেল"। কিন্তু শ্রীমার উপলব্ধি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রীঅরবিন্দের "ট্রান্স্" (সমাধি), "ট্রান্স্ অব্ ওয়েটিং" (প্রতীক্ষার সমাধি) ও "ডিসেণ্ট" (অবতরণ) কবিতাগুলি—এগুলি সেই গুহ্য সাধনাবস্থার লিপিচিত্র যাতে জ্যোতিরুদ্ভাস ও ঈশ্বরানুভব ওতপ্রোত। অতিক্রান্ত বলতে যা বুঝায় তা যদি বুদ্ধিগত ভাষার সাহায্যে বলা যায়, তা হলে শ্রীমার অতিক্রান্তকে অভিমিশ্র করা যায় এই বলে যে তাঁর অতিক্রান্ত হল আরোহণ ও অবরোহণের দ্বৈতগতি, দুটি যেন একটি অখণ্ড সূক্ষ্মতম শক্তি ও জ্যোতির মিলন।

শ্রীমা যে আস্থায় নির্ভর করে চলতেন শূন্যে ও বিস্তারে, তার থেকে সংগ্রহ করতেন শক্তি সে বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনি কোন কারণে তিনি তাঁর জীবন ও আদর্শের কার্য্যকরী দিক একটুও অবহেলা করেননি। মঁসিয় রিশারের সঙ্গে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের হাতে হাত মিলিয়েছিলেন এবং তাঁদের যুগ্ম সম্পাদকত্বে ইংরাজীতে "আর্য্য" ও ফরাসীতে "রেভ্যু দ্য গ্রাঁদ স্যাতেজ" নামক দুটি পত্রিকা যুগপৎ প্রকাশ করতে উদ্যত হলেন। এ প্রচেষ্টার বিবিধ লক্ষ্য "আর্য্য"র প্রথম সংখ্যার মলাটে এই রকমে বর্ণনা করা থাকল—
"(১) জীবনের প্রধানতম সমস্যার ধারাবাহিক অনুধাবন;
(২) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সনাতন মানবধর্ম্মের বিভিন্ন ঐতিহ্যকে সৌষম্যে পরিণত

---

1 Prayers and Meditations Pp. 160-161

করে জ্ঞানের বিরাট এক সমন্বয় স্থাপন করা। এর রীতি হবে বাস্তববাদের, যুক্তিসঙ্গত হয়ে আবার বিশ্বাতীত, এমন বাস্তববাদ যাতে বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সাথে বোধিগত অভিজ্ঞতা এসে মিশবে।"

যদিও ফরাসী পত্রিকাটির নামই খানিকটা আত্মপরিচায়ক, কিন্তু "আর্য্য" নামটি প্রথমে বিভ্রান্তিকর হলেও মন্ত্রের ধ্বনি ও শক্তি বহন করে। শ্রীঅরবিন্দ পরে এই নামটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেন, "আর্য্য বলতে বুঝায় এক প্রয়াস বা উত্থান এবং বিজয়। আর সে-ই হল আর্য্য যে অন্তরে ও বাহিরে যা-ই মানবোন্নতির প্রতিবন্ধক তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও তাকে পরাস্ত করে। তার প্রকৃতির প্রথম আইন হল আত্মজয়...আর আত্মশুদ্ধি হ'ল আত্মজয়ের প্রধান লক্ষ্য। তাই যা সে জয় করে তাকে ধ্বংস করে না, বরং উন্নত ও পরিপূর্ণ করে তোলে। আর্য্য সর্ব্বদাই কর্ম্মী ও যোদ্ধা...সর্ব্বদাই অন্তরে ও বিশ্বে স্বারাজ্যের আগমনীর জন্যে যুদ্ধে রত।"(১) মানুষ অকর্মণ্য ও তুচ্ছ জীব নয়,—অন্তরের সামর্থ্যে তো নয়ই, বাস্তবিই সে ত্রি-ভুবনের উত্তরাধিকারী, স্বাতন্ত্র্য থেকে সার্ব্বভৌমিকত্বে কমুরেখার গতিতে ঊর্দ্ধে সে উঠে যেতে পারে, এমন কি বিশ্বাতীতে পৌঁছেও নিষ্কৃতি পেতে পারে। আর্য্য ও তার পাল্টা ফরাসী পত্রিকার লক্ষ্য ছিল পাঠকদের আত্মজয় ও আত্মশুদ্ধির বিবিধ নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা এই ত্রি-ভুবনে যুগপৎ বাস করতে জানে, পারে "অবস্তনকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করতে, ঊর্দ্ধকে নিম্নের মধ্যে স্বাগত করতে" এবং শেষে নিজের সত্তার সর্ব্বাঙ্গে ধরে এক হয়ে যেতে পারে ত্রিগুণ ব্রহ্মের শক্তি জ্যোতি ও আনন্দের সঙ্গে।(২)

আর্য্য ও রেভ্যু দ্য প্রঁদ স্যাতেক এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে আগষ্টে। অবশেষে নিধ্যার সাথে সত্যের, আঁধারের সাথে আলোর, কুৎসিতের সাথে সুন্দরের লড়াই বেশ জাঁকিয়ে আরম্ভ হল, এ যুদ্ধ যতখানি শ্রীঅরবিন্দের ততখানি শ্রীমায়ের এবং এর সঙ্গে সূত্রে বাঁধা মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

[ক্রমশঃ]

---

1 Views and Reviews Pp. 9-11
2 Views and Reviews P. 12

করে জ্ঞানের বিরাট এক সমন্বয় স্থাপন করা। এর রীতি হবে বাস্তববাদের, যুক্তিসঙ্গত হয়ে আবার বিশ্বাতীত, এমন বাস্তববাদ যাতে বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সাথে যোগিগত অভিজ্ঞতা এসে মিশবে।"

যদিও ফরাসী পত্রিকাটির নামই খানিকটা আত্মপরিচায়ক, কিন্তু "আর্য্য" নামটি প্রথমে বিভ্রান্তিকর হলেও মন্ত্রের ধ্বনি ও শক্তি বহন করে। শ্রীঅরবিন্দ পরে এই নামটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেন, "আর্য্য বলতে বুঝায় এক প্রয়াস বা উত্থান এবং বিজয়। আর সে-ই হল আর্য্য যে অন্তরে ও বাহিরে যা-ই মানবোন্নতির প্রতিবন্ধক তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও তাকে পরাস্ত করে। তার প্রকৃতির প্রথম আইন হল আত্মজয়...আর আত্মশুদ্ধি হ'ল আত্মজয়ের প্রধান লক্ষ্য। তাই যা সে জয় করে তাকে ধ্বংস করে না, বরং উন্নত ও পরিপূর্ণ করে তোলে। আর্য্য সর্ব্বদাই কর্ম্মী ও যোদ্ধা...সর্ব্বদাই অন্তরে ও বিশ্বে স্বারাজ্যের আগমনীর জন্যে যুদ্ধে রত।"(১) মানুষ অকর্ম্মণ্য ও তুচ্ছ জীব নয়,—অন্তরের সামর্থ্যে তো নয়ই, বাস্তবিই সে ত্রি-ভুবনের উত্তরাধিকারী, স্বাতন্ত্র্য থেকে সার্ব্বভৌমিকত্বে কম্বুরেখার গতিতে ঊর্দ্ধে সে উঠে যেতে পারে, এমন কি বিশ্বাতীতে পৌঁছেও নিষ্কৃতি পেতে পারে। আর্য্য ও তার পাল্টা ফরাসী পত্রিকার লক্ষ্য ছিল পাঠকদের আত্মজয় ও আত্মশুদ্ধির বিবিধ নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা এই ত্রি-ভুবনে যুগপৎ বাস করতে জানে, পারে "অধস্তনকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করতে, ঊর্দ্ধকে নিম্নের মধ্যে স্বাগত করতে" এবং শেষে নিজের সত্তার সর্ব্বাঙ্গে ধরে এক হয়ে যেতে পারে ত্রিগুণ ব্রহ্মের শক্তি জ্যোতি ও আনন্দের সঙ্গে।(২)

আর্য্য ও রেভ্যু দ্য গ্রাঁদ সাঁতেজ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে আগষ্টে। অবশেষে মিথ্যার সাথে সত্যের, আঁধারের সাথে আলোর, কুৎসিতের সাথে সুন্দরের লড়াই বেশ জাঁকিয়ে আরম্ভ হল, এ যুদ্ধ যতখানি শ্রীঅরবিন্দের ততখানি শ্রীমায়ের এবং এর সঙ্গে সূত্রে বাঁধা মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

[ক্রমশঃ]

---

1 Views and Reviews Pp. 9-11

2 Views and Reviews P. 12

অমনি আধুনিক পণ্ডিত বলে বসলেন, ঠিকই তো, আর্যরা ছিল সাদা চামড়া আর দাস মানে দস্যু, ভারতের আদিম অধিবাসী, কালাআদমী। তাঁরা ভাবতেই পারলেন না যে যারা আর্য্য, যারা ঠিক করেছে মানুষের মতন মানুষ হবে,—ন যথা প্রাকৃতো জনঃ—তাদের মনের রং একটু অন্যরকমের। এই রংটা বেদের ঋষির চোখে সুস্পষ্ট ছিল। ধরে নিতে আপত্তি কি যে প্রাচীন ভারতের বর্ণব্যবস্থার মূলে ছিল মানুষের মনের রংএর পার্থক্য?

আর একটা কথা। পুরুষসূক্তের বর্ণনা অনুযায়ী চার বর্ণের উৎপত্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে। আধুনিক পণ্ডিত বলবেন এই তো সোজা নজীর রয়েছে, তোমাদের সমাজে কোনো দিন সাম্য বা ডেমক্রেসীর আবেহ ছিল না। গোড়া থেকেই তোমরা ব্রাহ্মণকে বসিয়েছো মাথায় আর বৈশ্য শূদ্রকে পায়ের দিকে। তাই তো তোমাদের মধ্যে এত মনোমালিন্য, ভারত কোনোদিন এক হলো না। এখানেও কিন্তু একটু গলদ আছে। ব্রাহ্মণ বরাবরই আমাদের সমাজের মাথা ছিল এটা সত্যি। কিন্তু ব্রাহ্মণ মানেই চালকলা-বাঁধা পুরুতমশাই নয়। বেদ উপনিষদের আমলে ব্রহ্ম জানলে তবে ব্রাহ্মণ হোতো। ব্রহ্ম মানে বৃহতের সূচনা দেয় যে মন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞান। জ্ঞানীকে সমাজের মাথায় বসিয়ে প্রাচীনভারত কি খুব অন্যায় করেছে?

ব্রহ্মজ্ঞান কিন্তু কোনো জাতিবিশেষের একচেটে ছিল না। রাজার ছেলেও ঋষি হোতো, আবার চাষীর ছেলেও।

উপনিষদের গল্পে দু'একটা জিনিষ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এক হোচ্ছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বেশ একটা রেশারেশি ভাব। তার একটা কারণ এই হোতে পারে যে ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ বেদপাঠ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, তারা অনেকটা হোয়ে দাঁড়াচ্ছিল গতানুগতিক, ইংরিজিতে যাকে বলে কনসারভেটিভ। ক্ষত্রিয়-সন্তানের প্রধান কাজ ছিল তলোয়ার তীরধনুকের চর্চা, তারা ছিল স্বাধীনতার ভক্ত। তাদের গায়ের জোর মনের জোর দুইই ছিল। তাই বোধ হয় জনক অজাতশত্রুর মতন রাজর্ষির জন্ম হোয়েছিল সেকালে। তা সত্ত্বেও কিন্তু ব্রাহ্মণই ছিল সমাজের শীর্ষস্থানীয়, জাতে ব্রাহ্মণ বোলে নয়, ব্রহ্মবিদ্যার দৌলতে। তাই রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে নিজের রাজ্য ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের বিনিময়ে।

আর একটা কথা এই যে জাতভেদ থাকলেও জাতের গোড়ামিটা তখনও তেমন পাকা হোয়ে ওঠেনি। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গুরুর কাছে সমিৎ সংগ্রহ করে যাচ্ছে বিদ্যালাভের আশায়। অজ্ঞাতকুল জাবাল গুরুগৃহে স্থান পাচ্ছে শুধু এই ভরসায় যে সে সত্যকথা বলতে ভয় পায় না, সে সত্যকাম অতএব ব্রাহ্মণপদবাচ্য।

আমাদের সমাজে জাতভেদটা বেশ পাকা হোয়ে গেঁথে গেছে মহাভারতের আমল থেকে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কে বড় কে ছোট এই নিয়ে জোর তর্ক শুরু হোয়েছে তখন থেকেই। ক্ষত্রিয়রা মনে করে তারাই দুনিয়ার মালিক কেন না তাদের গায়ে সব চেয়ে জোর। ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল, ক্ষত্রিয়র মুখাপেক্ষী। এদিকে মনে মনে ভয়ও আছে মোলো আনা, কখন রেগে

গিয়ে শাপ গাল দিয়ে বসে, তখন না রাজ্য লোপ পায়। ব্রাহ্মণও নিজের বংশমর্যাদায় ভরপুর, সে ভাল করেই জানে গায়ের জোরই একমাত্র জোর নয়, তাকে না হোলে রাজার রাজত্ব চলবে না। যাগযজ্ঞ করানর ভার তারই হাতে। লেখাপড়া শিখতে গেলে ব্রাহ্মণ গুরুর শরণাপন্ন হোতে হয়, ব্রাহ্মণই সব চেয়ে বড় দানের পাত্র। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়র কাছে বৈশ্য শূদ্রের স্থান বেশ একটু নীচুতে। বৈশ্যদের প্রধান কাজ টাকা রোজগার করা এবং রাজাকে ট্যাক্স দেওয়া। আর শূদ্র শুধু অপর জাতির সেবা করবে।

মহাভারতে চার জাতের স্থানও যেমন আলাদা, তাদের কাছ থেকে তেমনি বিশেষ বিশেষ গুণও প্রত্যাশা করা হয়। ব্রাহ্মণ হবে বিনয়ী, নম্র, বিদ্বান, জ্ঞানার্জনে তৎপর, সত্যবান্। ক্ষত্রিয় হবে বীর, রণকুশল, দুর্বলের প্রতিপালক, ন্যায়বান্। বৈশ্য কার্য্যকুশল, অর্থশালী, আর শূদ্র হবে সেবায় তৎপর, সহ্যশীল। এই যে "গুণকর্ম্মবিভাগ" এইটেই হোলো ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার মূলকথা। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজে একটা শৃংখলাস্থাপন, যার যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা। মানুষে মানুষে যে একটা স্বাভাবিক পার্থক্য আছে এটা স্বীকার করতে একটুও দ্বিধা করেননি প্রাচীন ভারতের সমাজপ্রতিষ্ঠাতারা। তাঁরা এটাও একরকম ধরে নিয়েছিলেন যে বংশের একটা মূল্য আছে, তাই বর্ণব্যবস্থাটা ক্রমশ: হোয়ে উঠলো জাতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধরে নেওয়া হোলো ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী হবে, ক্ষত্রিয়ের ছেলে ক্ষত্রিয়র। এই থেকেই আধুনিক জাতভেদের সূত্রপাত।

পরবর্তীকালে, অর্থাৎ যখন গৃহ্যসূত্র ধর্ম্মসূত্র বৌদ্ধ ত্রিপিটক লেখা হোচেচ, জাতভেদের নিয়মকানুনগুলো বেশ ভালভাবে গুছিয়ে বোসচে। ব্রাহ্মণ বড় না ক্ষত্রিয় বড়—এ তর্কের সম্পূর্ণ অবসান হয়নি অন্তত: বৌদ্ধমহলে। বুদ্ধ জন্মেছিলেন ক্ষত্রিয়বংশে কাজেই তাঁর মতাবলম্বীরা ক্ষত্রিয়কেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে বেজায় উদ্‌গ্রীব দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের বাইরে কিন্তু ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুসমাজের দুটো ভাগ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এরা হোলো একদলের, এদের নাম দেওয়া হল দ্বিজ কারণ এদের গুরুগৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে এরা গলায় পৈতে দিয়ে এবং বেদাধ্যায়নের ফলে দ্বিতীয়বার নবজন্মের অধিকারী। বাকীরা হোলো শূদ্র, তাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার নেই, তারা বেঁচে থাকতে নবজন্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিজ আর শূদ্রের ব্যবধানটা ক্রমশ: বেড়েই চোললো।

মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-পরাশর স্মৃতির যুগেও কিন্তু ভারতের সমাজ সম্পূর্ণ অচলায়তন হোয়ে উঠতে পারেনি নানা কারণে। শাস্ত্রকাররা সমাজব্যবস্থাকে যতই না কেন শৃংখলাবদ্ধ করবার চেষ্টা করুন মানুষের স্বভাব বদলাবেন এমন ক্ষমতা তাঁদের হাতে ছিল না। শাস্ত্রের বিধান অমান্য করে এমন লোক প্রচুর ছিল। যেমন বিয়ের ব্যাপারে। শাস্ত্রকাররা খুশী হোতেন যদি ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনো জাতে বিয়ে না কোরতো। কিন্তু তাঁদের কথা শুনচে কে? অসবর্ণ বিবাহ হোয়ে চোললো প্রচুর। তার ফলে হোলো নানা মিশ্র জাতির উদ্ভব, চার বর্ণের যায়গায় চৌষট্টি সংকর বর্ণের সৃষ্টি। শাস্ত্রকার কি আর

করেন। তাদের বলতে হোলো, আচ্ছা বেশ, ব্রাহ্মণ যদি চায় তো ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ঘর থেকেও মেয়ে আনতে পারে, কিন্তু তারা সমান মর্যাদা পাবে না, আর ছেলেদেরও ঠিক ব্রাহ্মণ বলা হবেনা, অন্য নাম দেওয়া হবে, যেমন সূত, বাগধ, আয়োগব ইত্যাদি। এইখান থেকে আমাদের প্রাচীন বর্ণব্যবস্থায় একটা বড় রকম ভাঙনের সূত্রপাত।

আর একটা গোল বাধলো বিদেশী আক্রমণের ফলে। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই বিস্তর অসভ্য বা অর্দ্ধসিক্ষিত বাইরের লোক ভারতের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে বসবাস আরম্ভ করে। নামে তাদের যতই না বর্ব্বর বা ম্লেচ্ছ বলে গালাগালি দেওয়া হোক, সমাজকর্ত্তারা ঠিক করলেন তাদের জাতে তুলতেই হবে, তা না হোলে সমাজ ব্যবস্থা টেঁকে না। ব্যবস্থা একরকম মন্দ হোলো না। যারা ওদের মধ্যে একটু সভ্যভব্য এবং লড়াই করতে অভ্যস্ত তারা হোয়ে গেল ক্ষত্রিয়, অবশ্য একটু নীচুদরের। বাকীরা হোলো "নিরবসিত শূদ্র", অর্থাৎ কি না একটু মেজে ঘোষে নেওয়া ছোটলোক। দুশো তিনশো বছর যেতে না যেতেই আগন্তুক কুশান হূন শক যবনরা সব বেমালুম হিন্দু হোয়ে গেল। চেনবার যোটি রইল না কে কোথাকার লোক। কিন্তু তাদের আসার ফলে আমাদের সমাজে কোথায় যে কি ওলটপালট হোয়ে গেল তার হিসেবনিকেশ এখনও হয় নি।

আর একটা বড় রকম পরিবর্ত্তন এলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, মুসলমান বিজয়ের পরে। যেসব মুসলমান সৈন্যরা ভারতজয় কোরেছিল তারা যে আগেকার কুশান হূণের চেয়ে খুব বেশী সভ্য ছিল তা নয়। তবে তফাত ছিল এই যে তাদের পেছনে পেছনে এল বাগদাদ খোরাসান খোয়ারাবাদী শাস্ত্রজ্ঞ মোল্লার দল। সঙ্গে আনলো মুসলমানী "হদিশ্" আর "শারিয়াতের" পুঁথি। মুসলমানী শাস্ত্রের ভাষা আরবী। তাতে মনু পরাশরের নামগন্ধ নেই, তার বিধানও অন্যতর। সেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের স্থান নেই। আছে শুধু দুরকম জাত, এক যারা মুহম্মদকে মানে, আর যারা মানে না।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় ঘুণ ধরলো। হিন্দুদের মধ্যে যারা নিজেদের ধর্ম্ম ছাড়তে রাজী হোলো না তারা নতুন বিধান অনুযায়ী মুসলমান বিজেতার কাছে হোয়ে গেল শূদ্র-পদবাচ্য কাফের, অচ্ছুত বললেই হয়। তাদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য্য হোলো, মান সম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হোয়ে উঠলো। আর যারা পয়সার লোভে বা মান ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে কালমা পাঠ কোরে মুসলমান হোলো তারা এক কথায় বেরিয়ে গেল মনু পরাশরের গণ্ডীর বাইরে, কে কোন জাতের লোক এ প্রশ্ন হোয়ে উঠলো অবান্তর। মুসলমান সমাজে কোনো রকমের জাতভেদ ছিল না এমন কথা বলা শক্ত। বিশেষ করে যে সব মুসলমান সোজা বাইরে থেকে এসেছিল খাইবার পাস পেরিয়ে তারা বরাবরই ভারতীয়দের একরকম কালা আদমী মনে কোরে এসেছে। মোগল বাদশা বাবর তো ভারতীয় "নেটিভ" মুসলমানদের কায়দা কানুন দেখে হেঁসেই বাঁচে না, নিজের আত্মজীবনীতে তার উল্লেখ করে গেছে। তা সত্ত্বেও মানতেই হবে যে জাতের গোঁড়ামীটা ভারতীয় মুসলমান সমাজে কমই ছিল।

এর ত্রুটি পুষিয়ে নিল হিন্দুসমাজ। মুসলমানী যুগের হিন্দুশাস্ত্রকার বলে বসলেন মুসলমানরা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে বিয়ে থা, খাওয়া দাওয়া তো চলবেই না, তাদের সংস্পর্শে আসলেও মহাপাপ। নিয়মের কড়াকড়ি বেড়েই চললো। হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হোলো, কারণ যেতে হলে মুসলমানের জাহাজে চড়তে হয়। ক্ষত্রিয়রা দল লোপ পেতে বসলো কারণ তারা আর লড়বে কার সঙ্গে, দেশ তো মুসলমানের হাতে। বৈশ্যরা যারা ছিল কারিগর বা চাষী, অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক, তারা কলমের এক আঁচড়ে হোয়ে গেল শূদ্র। ঠিক কবে এবং কি রকম কোরে এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল তা ঠিক জানা নেই। কিন্তু এর ফল হোলো এই যে হিন্দুদের মধ্যে রয়ে গেল দুটো প্রধান জাত, শূদ্র আর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের দাপট বাড়লো, টিকি পৈতে তিলকধারীতে দেশ গেল ছেয়ে। কবীর নানক শ্রীচৈতন্য তুকারামের মতন মহাপুরুষ এসেও ব্রাহ্মণের অহঙ্কার ভাঙতে পারলেন না। ইংরেজ যখন রাজ্য হাতে নিল, প্রথম প্রথম তাকেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শরণাপন্ন হতে হোয়েছিল। ইংরেজ বাইরে থেকে এসেচে, সে না জানে আমাদের ভাষা না বোঝে আমাদের কায়দা কানুন। অথচ এত বড় দেশটা মুঠোর মধ্যে পেয়ে হাতছাড়াও তো করতে পারে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাকে সংস্কৃত শেখাল, তার আদালতের জন্যে স্মৃতিচন্দ্রিকা রচনা করলো, ইংরেজ বিচার-পদ্ধতিকে সাহায্য করলো তার কাজে।

ইংরেজের আমলে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব কতদিন চলতো জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে গোল পাকিয়ে বসলেন আমাদের রাজা রামমোহন রায় আর বিলিতি ঐতিহাসিক লর্ড মেকলে। রাজা একটা চিঠি পেশ করলেন এই বলে যে টোলো পণ্ডিতরা দেশটাকে উৎসন্নে দিল, তাদের কিচ্ছু শেখাবার নেই, ভারতের লোক ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান যতদিন না পড়চে ততদিন তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মেকলে রিপোর্ট দিলেন ভারতের যা কিছু পড়বার মত বই আছে সেগুলোকে তিনি তাঁর লাইব্রেরীর একটা ছোট আলমারীর মধ্যে ভরে ফেলতে পারেন, ওঁর কাছে তার কোনোই মূল্য নেই। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে তিনি সংস্কৃত পড়েননি। সে যাই হোক মেকলেরই জয় হোলো। ভারতসরকার ঠিক করলেন যে ভারত-বাসীকে ইংরিজি শেখাতে হবে। মিশনারীদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা হোলো, তাদের স্কুল কলেজে ভীড় জমতে লাগলো। দেশের শিক্ষিত ছেলেরা বলতে আরম্ভ করলো আমরা টিকি রাখবো না, পৈতে ফেলে দেবো, জাতবিচার তুলে দেবো। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অন্ন গেল, ব্রাহ্মণের ছেলে অন্য জাতের লোকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে কেরানীর কাজে মন দিল। ক্ষত্রিয়র পেশা অনেকদিনই গেছে, ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশী বৈশ্যর হাতে। দেশে একটিমাত্র জাত রয়ে গেল, চাকুরীজীবি শূদ্র এবং চাষী।

মোটামুটি এই তো গেল আমাদের বর্ণব্যবস্থার ইতিহাস। এখন দেখতে হবে এর ফলে আমাদের কতটা ক্ষতি হোয়েচে, এবং লাভের কোঠায় কিছু পড়েচে কি না।

(ক্রমশঃ)

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

(১)

প্রশ্ন : যা আপনি বলেন, "অতিমানস নেমে এসেছে পৃথিবীতে"। এ-কথার মানে কি? আরো আপনি বলেন, "যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল তা ফলে গেছে।" সে প্রতিশ্রুতিগুলিই বা কি?

উত্তর : এ সব তো অজ্ঞানের প্রশ্ন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে কত যুগযুগান্ত আগে থেকে—কেবল এই জায়গাতেই নয়, জগৎ-সৃষ্টির প্রথম থেকে। শোনোনি কত ভবিষ্যদ্বাণী, কত মহাপুরুষের উক্তি, কত জনশ্রুতি। যেমন, বহুবার বলা হয়েছে, "নতুন রকম স্বর্গের ও পৃথিবীর সৃষ্টি হবে, নবজাতির জন্ম হবে, জগতের নব রূপান্তর ঘটবে, ইত্যাদি ইত্যাদি"।

*

প্রশ্ন : কিন্তু তাহলে কই সে নবজাতি?

উত্তর : নবজাতি? তাও হবে, কয়েক হাজার বছর পরে, তখন দেখতে পাবে।

ভেবে দেখ, মানস বা মন নামক জিনিসটি যখন প্রথম নেমে এলো এই ভূমণ্ডলে, তার কত লক্ষ বছর পরে মানুষ নামক জাতিকে এখানে প্রথম দেখা গেল। এবার অবশ্য অতিমানসের বেলায় তার চেয়ে কাজটা অনেক তাড়াতাড়ি হবে, তার কারণ এবার মানুষরা তার প্রতীক্ষা করছে, তাদের মনে একটা আবছায়া রকমের ধারণাও গড়ে উঠেছে, তারা আশা করছে যে-কোনো প্রকারে এবার অতিমানবের আবির্ভাব হবে। কিন্তু সেই আগেকার যুগে বানর জাতিরা এমন করে প্রতীক্ষাও করেনি আর কল্পনাও করেনি যে তাদের পরে আবার মানব জাতি জন্মাবে। এমন কথা তারা ভাবতেই পারেনি, কেমন করে ভাবতে হয় তাই জানতো না। কিন্তু মানুষ এখন এই ব্যাপার নিয়ে ভাবছে, তার আসার প্রত্যাশা করছে, অতএব সে কাজ এবার আগের চেয়ে শীঘ্র হবে। কিন্তু এই 'শীঘ্র' মানেও কয়েক হাজার বছর হয়তো। সুতরাং সেই নবজাতি দেখা দেবে তখনই।

কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর আবহাওয়াতে একটা অত্যন্ত পরিবর্তন এসে গেছে। এটি সকলেই তারা লক্ষ্য করছে যারা নিজেরা ভিতরে ভিতরে অনেকটা প্রস্তুত হয়ে উঠেছে, নিজেদেরকে উন্নীলিত করে দিয়ে যারা উচ্চশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাতে পেরেছে, অতি-

মানস চেতনা ও তার আলোর সঙ্গে যারা অনপবিস্তর রকমে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছে।... যাকে জানতে চাও তার সমান পর্যায়ে যেতে পারলে তবেই তাকে জানা যায়। আপন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অতিমানস চেতনার একটু ছোঁয়াচ লাগলে তবেই দেখা যায় পৃথিবীর চারি-দিকের আবহাওয়াতে অতিমানসের ক্রিয়া কি হচ্ছে। কোনো কারণে যাদের সেই দৃষ্টি খুলে গেছে তারাই তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। কিন্তু নিজেদের কিছুটাও ভিতরের দিকে কি রয়েছে তার পর্যন্ত যারা খোঁজখবর রাখে না, আত্মা কি পদার্থ তা বলতে হলেই যাদের ভ্যাবাচেকা লাগে, তারা অবশ্য পৃথিবীর আবহাওয়াতে এই ধরনের পরিবর্তনের কোনো হদিশ পাবে না। তা বোধ করার উপযুক্ত হতে হলে তাদের বোধশক্তিকে আরো অনেক দূর এগোতে হবে। কারণ তাদের চেতনা পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে যত বাহ্য বিষয়ে, আর নিজেদেরই মন প্রাণ দেহ নিয়ে, স্থূল রকমের কোনো কিছু অস্বাভাবিক অঘটন ঘটলে তবেই তারা তখন সেটা দেখতে পাবে। তাকে তারা বলবে নিরেকূল।

কিন্তু যে নিরেকূল নিত্যই ঘটছে, কত শক্তির ক্রিয়াতে ভিতরে ভিতরে সব-কিছু বদ্‌লে যাচ্ছে, তাকে ওরা অঘটন বলবে না, কারণ বাইরে সব-কিছু একভাবেই আছে, সেটাই তারা দেখছে। কিন্তু ভালো করে একটু ভাবলে বোঝা যায়, সবই তো অঘটন! তোমরা মোটেই ভাবো না তেমন করে। তেমন দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখলে তোমাদের বলতেই হতো, "তাই তো, ভারি আশ্চর্য্য কেমন করে হলো?" কিন্তু তোমরা শিখেছ কেবল নিতান্ত ভাসা-ভাসা রকমে বাইরের চোখ দিয়ে দেখতে।

*

প্রশ্ন : সেই নতুন রকম চেতনার প্রতি আমাদের কি মনোভাব হওয়া উচিত?

উত্তর : তা নির্ভর করবে তোমার নিজেরই উদ্দেশ্যের উপর, যেমন ভাবে তাকে তোমার কাজে লাগাতে চাও। যদি কেবল পরখ করে দেখতে চাও তা কেমন জিনিস, তাহলে বিশেষ করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তাকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। আর যদি চাও তার সাহায্যে নিজেকে বদ্‌লে নিতে, তাহলে আপন সত্তাকে তার দিকে খুলে ধরবে, চেষ্টা করবে তার দিকে এগোতে।

*

প্রশ্ন : নতুনের আবির্ভাবে আমাদের লাভ হবে শুধু কি ব্যক্তিগত না সমষ্টিগত?

উত্তর : এমন প্রশ্ন কেন?

*

প্রশ্ন : এখানে যারা আসে তারা প্রায়ই জানতে চায়, তাদের কি লাভ হবে?

উত্তর : তাদের লাভ হবে কেন? কিসের দাবিতে? কেবল ট্রেনে চড়ে এখানে এসেছে এই দাবিতে?

অনেকদিন আগে জনকয়েক লোক এখানে এসেছিল—কবে তা ঠিক স্মরণ নেই, তবে বছর কুড়ি আগেকার কথা—তারা এখানে থাকবার কালে এই আশ্রমে একটি মৃত্যু হয়। তাই দেখে তারা খুব ঘাবড়ে যায়। তারা বলতে থাকে, "এখানকার যোগের গুণে অমর হওয়া যায়, তাই ভেবেই আমরা এসেছিলাম। এখানেও যদি মানুষকে মরতে হয়, তাহলে আমাদের এখানে কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল?"

এও তেমনি কথাই হলো। ট্রেনে চড়ে যারা এতদূর পর্যন্ত এসেছিল—এবার অন্য-বারের চেয়ে প্রায় দেড়শো যাত্রী বেশী হয়েছিল—তারা এসেছিল এমনি কিছু লাভের আশা নিয়ে। আর সেইজন্যই তাদের এসে কিছুই লাভ হলো না। যে জিনিস এখানে নেমে এসেছে, তা কোনো বিষয়ে কাউকে কিছু লাভ করাবার জন্য নয়।

*

প্রশ্ন : তারা এই কথা জানতে চায় যে ওতে অন্তত ভিতরের দিকের বাধাবিপত্তিগুলো ঘোচাবার পক্ষে কিছু সুবিধা হবে কি না।

উত্তর : তারও ঐ এক উত্তর ; কি কৈফিয়ৎ আছে, কোন অধিকার আছে তাদের সে প্রত্যাশা করবার? নিজেদের দিক দিয়ে তারা ওর জন্য কতটা করেছে? সকল বিষয়ে তাদের সুবিধাই বা হবে কেন? তাদের কুড়েমি আর জড়তাকে আরো বেশী প্রশ্রয় দিতে, না আর কিছু?

সবাই কেবল এই কথাই ভাবে যে তাদের কিছু লাভ হোক। আর তাই ভাবে বলেই কিছুই লাভ তাদের হয় না। কাকে ফাঁকি দিয়ে তারা নিজের লাভ করে নিতে চায়? ভগবানকে? তা কখনো সম্ভব নয়।

এখানে এসেই অনেকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ চায়। তাদের বেলাতেও এ-কথা খাটে। আমি বোঝাতে চেষ্টা করি যে তারা সংখ্যায় এত বেশী যে প্রত্যেককে জনে জনে সাক্ষাৎ দেবার মতো তত মিনিটই নেই একটা দিনের মধ্যে। কিন্তু তবু প্রত্যেকেই তারা বলে, "এত দূর থেকে কষ্ট করে এখানে এলাম, সেই অমুক দেশের অমুক জায়গা থেকে এতখানি রাস্তা পার হয়ে তবে এসেছি, আসতেই লেগে গেল কত দিন কত ঘণ্টা..."। অর্থাৎ আর কিছু নয়, এও সেই লেনদেনের কথা, হিসেবী কথা। কিন্তু আমরা কি এখানে ব্যবসা ফেঁদে বসেছি? আগেই বলে দেওয়া হয়েছে যে এখানে ব্যবসা নয়।

*

প্রশ্ন : এখানে যাত্রী আসা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, এ কি কোনো কিছুর একটা লক্ষণ?

উত্তর : স্বভাবতই এখানে লোক আসা আরো বেশী বাড়তে থাকবে। সেই কারণেই আমি এখানে আর তেমন কিছু করতে পারি না, যেমন আগে পারতাম, যখন আশ্রমে মাত্র

দেড়শো লোক ছিল। সহজ বুদ্ধিতেই তা বোঝা যায়। ত্রিশ জন বা একশো জনের সঙ্গেও যেমন আমার সম্বন্ধ হবে, ১৮৪৫ জনের সঙ্গে তা হয়না (এখন এই সংখ্যাই দাঁড়িয়েছে)। একটা সহজ যুক্তির কথা। তবু প্রত্যেকে চায় সকলকে ফেলে প্রথমে তারই লাভ হোক।

*

প্রশ্ন : না, একটা কথা। পৃথিবীর পরিস্থিতিতে প্রথম যখন মন জিনিসটা নেমে এসেছিল, তখন বানরজাতির মধ্যে কোনো চেষ্টাই জাগেনি যাতে বানর থেকে তারা মানুষে পরিণত হয়, চেষ্টা যা কিছু হয়েছিল তা একমাত্র প্রকৃতির তরফ থেকে। কিন্তু এখন তো...

উত্তর : এখনও তো মানুষ নিজে চাইছে না অতিমানব হতে।

চাইছে কি?

দেখ খোঁজ করে, তবে হাঁ, এখন একটা জিনিস কাজ করবে।

হাঁ, একটি জিনিস মাত্র,—কিছুই নেই এমন কথা নির্দয়ভাবে বলতে চাই না—একটি জিনিস মানুষ করতে পারে, সহযোগিতা। তার আন্তরিক সদিচ্ছা দিয়ে, তার আশ্পৃহা দিয়ে সে এই কাজে তার অনুকূল পোষকতা দিতে পারে। এইভাবে তার যথাসাধ্য সাহায্য সে করতে পারে। এই কারণেই আমি গোড়াতে বলেছি যে এবার কাজটা তাড়াতাড়ি হবে। আমি আশা করছি যে খুব শীঘ্রই এ কাজ এগোবে...কিন্তু খুব শীঘ্র মানেও কিছু সময় তো লাগবেই।

শোনো বলি, একটা সমস্যা আছে। এখানে যারা রয়েছ, সকলেই শুনেছ যে অতিমানসের অভিব্যক্তি হবে, একবার নয় একশো বার শুনেছ। নিজেরা তাই নিয়ে বলাবলি করেছ, ভেবেছ তাই নিয়ে, প্রত্যাশা করেছ, চেয়েছ যে তাই হয়ে যাক। অনেকে ওরই জন্য এখানে এসে রয়েছে, অতিমানসের শক্তিতে যাতে অতিমানবে রূপান্তর ঘটতে পারে—এই তাদের লক্ষ্য। তবু কেন এমন ব্যাপার হলো যে সেই শক্তি যখন সত্যই এখানে নেমে এলো, তখন কেউই, অর্থাৎ বলতে গেলে প্রায় কেউই তা জানতে পারলে না? এ-সমস্যার কেউ জবাব দিতে পারো? তা যদি পারো তাহলে সকল প্রশ্নেরই জবাব মিলবে।

আমি বাইরের লোকদের সম্বন্ধে কিছু বলছি না। তারা এ নিয়ে কখনো কিছু ভাবেনি, তারা জানেও না যে অতিমানস বলে আমাদের গ্রহণযোগ্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে। আমি বলছি তাদের কথা যারা এই আশ্পৃহার উপরই নিজেদের জীবনের ভিত্তি প্রস্তুত করেছে। তাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নেই, মুহূর্তের জন্যও না; তারা এই নিয়ে অনেক খেটেছে, কেউ ত্রিশ বছর কেউ পঁয়ত্রিশ বছর অপেক্ষা করেছে, তারা বলেছে," অতিমানস কখন এসে পড়ে, কখন এসে পড়ে..."। কথায় কথায় এই ছিল তাদের মুখের বুলি। সুতরাং বলতেই হবে যে আগের থেকে তারা তৈরি ছিল, ওর চেয়ে বেশী আশা করা যায় না। তবু এটা কেমন করে হয় যে তাদের প্রস্তুতি এমন অপূর্ণ ছিল যে তার স্পন্দন যখন এলো

অমনি তৎক্ষণাৎ তাকে চেনার চমক কিছু টের পেলে না, সে-খবর তারা জানতেই পারলে না?

প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত লক্ষ্য হলো নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা। দিব্যশক্তির সঙ্গে যতটা সম্ভব নিকট সম্পর্ক স্থাপন করা, সে শক্তি এখানে অভিব্যক্ত হলে তার সঙ্গে সহযোগ করা, কিংবা অন্ততপক্ষে তাকে বুঝতে পারা, তার দিকে নিজেকে খুলে দেওয়া। তোমরা এমন কোনো অন্য জগতে নেই যেখানে তোমার ভিতরে যা আছে বাইরে তার কোনো চিহ্নই নেই, তোমরা হঠাৎ প্রবেশ করেছ এমন আবহাওয়াতে যেখানে সবস্তটাই অতিমানসে ভরপুর। তার শক্তি রয়েছে এখানে, তা রয়েছে তোমাকে পরিব্যাপ্ত করে ও তোমাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে। ঐ জিনিসের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ পরিচয় যদি তোমার একটুও থাকতো, তাহলে তখনই তুমি ওকে চিনে ফেলতে, নয় কি?

আর তাদের বেলা বাস্তবিক হয়েছেও তাই, যাদের আগের থেকে অল্প একটু আভ্যন্তরীণ পরিচয় ছিল, তারা দেখেই চিনেছে, তারা টের পেয়েছে ওর আগমন, আর তখনই বলেছে: "হাঁ, এই যে এবার এসে গেছে।" কিন্তু তারা অতি মুষ্টিমেয় জনকয়েক মাত্র, বাকী আরো শত শত জন যারা উন্মুখ হয়েছিল, ও ছাড়া যাদের অন্য ভাবনা ছিল না, ওকেই যারা জীবনের ভিত্তি করতে চেয়েছে, তারা কেন এটা অনুভব করলে না? কারণ কি এর?

এটা এক চিরজানিত সত্য যে অনুরূপ অনুরূপকে চেনে, যে যেমন সে তেমনকে চেনে।... তুমি ব্যক্তিগত ভাবে ঐ শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ঘটাতে পারো; শ্রীঅরবিন্দও তাকেই প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বলেছেন: কতকগুলি লোক চেষ্টা করলে পারে তাদের অন্তর্ভাস্তরীণ প্রয়াস ও আশ্পৃহার জোরে দিব্যশক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে। একেই আমরা বলি অতিমানসের দিকে আরোহণ। তাহলে যারা পার্থিব চেতনাকে ছাপিয়ে আভ্যন্তরীণ আরোহণের জোরে অতিমানসের সংস্পর্শে নিজেরা একবার এসেছে, সে জিনিস এখানে নেমে এলে তারা তৎক্ষণাৎ তাকে চিনে ফেলবে। তার জন্য ঐ আগেকার পরিচয়টি থাকলেই হলো। আগে একটুও জানা না থাকলে কেমন করে চিনবে?

বিশ্বের গতিপ্রণালী এই রকমই: জনকয়েক বিশিষ্ট লোক প্রথমে নিজেদের আভ্যন্তরীণ প্রয়াস ও আশ্পৃহার ফলে অতিব্যক্তিকারী শক্তির অগ্রদূত হয়ে দাঁড়ায়, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তারা তাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে। তবে এর জন্য বিশেষ ক'রে ডাক আসা চাই, উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত যুগ, উপযুক্ত মুহূর্ত তখন এসে হাজির হয়। এমনি করেই এই সব জিনিস হয়ে থাকে, আর এর এবারকার অভিব্যক্তিও এমনি করেই ঘটেছে।

যারা প্রস্তুত হয়েছিল তাদের নিশ্চয়ই জানতে পারার কথা। এবং এও বলছি যে কেউ কেউ তা জেনেওছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত...কথাটা এই যে, জানতে পারারও স্তরভেদ আছে। অর্থাৎ যারা উপর স্তরের এবং অতিমানসের স্পন্দন চেনে তারা তখনই বলেছে, "হাঁ, এই সেই জিনিস", আবার যারা নীচের স্তরে তারা কিছুই টের পায়নি। তাছাড়া আরো অনেকেই

রয়েছে যারা একটা নূতন কিছু বোধ করেছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সংবিৎ গ্রহণের শক্তি অত্যন্ত ভোঁতা হওয়াতে এবং ভিতরের দিকের আত্মবীক্ষণ ক্রিয়াতে অভ্যস্ত না থাকায় তারা জিনিসটা ঠিক নিতে পারেনি। তারা ভেবেছে যা বোধ করছে তা আরো পাঁচটা সাধারণ ব্যাপারের মতো, অসাধারণ বা অভূতপূর্ব কিছু নয়। এমনও ঘটেছে কয়েকজনের বেলাতে। তারা ভিতরে কিছু তীব্র আলোর ঝলসানি দেখেছে, কিন্তু সেটা কি তা বোঝেনি, অতিমানসের ধারণার সঙ্গে মেলাতে পারেনি। আর অবশিষ্ট সকলে কিছু বোধই করেনি।

যারা ট্রেনে চড়ে এখানে এসেছে তাদের প্রশ্ন আলাদা। তারা মনে করে যে এখানে এলেই জিনিসটা মিলে যাবে, আর এক গ্লাস মিষ্টি সরবতের মতো তা চক্ চক্ করে খেয়ে নেবে। কিন্তু আগের থেকে কোনোই প্রস্তুতি না থাকলে তা হয় কেমন করে? আবার সঙ্গে সঙ্গে তারা লাভও চায়, বলে, "ওতে কিছু লাভ আছে তো"?

একটু যদি ঐকান্তিকতা ওদের থাকতো—বেশী নয়, কারণ বেশীতে অবসাদ আসতে পারে—অল্প একটু ঐকান্তিকতা, তাতেই তাড়াতাড়ি খানিকটা ওদের অগ্রসর করে দিতো। এটুকু খুবই সম্ভব, আর আমি মনে করি যে তা নিশ্চয়ই হবে।

কিন্তু এ যা হচ্ছে এ নিতান্ত পাটোয়ারী মনোভাব, এতে শেষ পর্যন্ত কিছু লাভ হয়না।

যদি যথার্থই আস্পৃহা করতে থাকো, এবং ঐকান্তিকভাবে, আর সেই সঙ্গে অনেক বাধাবিপত্তিও থাকে, সেগুলো আস্তে আস্তে তখন কমে যায়। তাই আমরা আশা করতে পারি। তাহ'লে ওদের প্রশ্নের এই জবাব দেবে: "আগে তোমরা ঐকান্তিক হও, সাহায্য তখন নিশ্চয়ই মিলবে।

*

প্রশ্ন: কিন্তু মা, আপনি সম্প্রতিই এ কথা বলেছেন, "এবারকার এই বিজয়লাভের ফলে যেটা হলো, তা কেবল অবতরণ নয়, তা এক অতিব্যক্তি। কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারের চেয়ে অনেক বেশী; অতিমানসের আলো ঝল্‌সে উঠেছে বিশ্বস্তরের মাঝখানে।"

উত্তর: হাঁ, কিন্তু আমি এইমাত্র কি বোঝালাম। তুমি উপরে উঠে গেলে, সেখানকার জিনিস মুঠোয় ধরে নিয়ে এখানে নেমে এলে: এই হলো অবতরণ, একটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের ক্রিয়া। এই ক্রিয়াই যদি অনেক দফায় হতে হতে সাধারণের মতো হয়ে দাঁড়ায়, তখন আর তা অবতরণ পদবাচ্য রইল না, তাই হলো "অতিব্যক্তি"।

যাকে অবতরণ বলি তা হলো ব্যক্তিগত চেতনার ব্যক্তিগত ক্রিয়া। কিন্তু যখন দেখি যে পুরানো জগতের উপর এক নতুন জগতের অভ্যুদয় হচ্ছে,—যেমন পৃথিবীর প্রাণ-রাজ্যের উপর যখন মনের রাজ্য দেখা দিয়েছিল—একেই বলি অতিব্যক্তি।

ইচ্ছা করলে তুমি এর অন্য নাম দিতে পারো, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বোঝবার ভুল না হয়। ওঠা নামার কথা বলছি, কিন্তু বাস্তবিক তা কিছু নয়—কারণ উপর নীচ বা

এদিক ওদিক বলে কিছু নেই, বোঝাবার জন্য বলা। উঠে যাওয়ার মতো ভাব এলে তাকে বলি আরোহণ, উপরের জিনিস ধরে ফিরে এলে তাকে বলি অবতরণ। কিন্তু যখন সকল দরজা খুলে একাকার হয়ে গেল তখন আর তা নেই। সেই শক্তি তখন আপনা হতেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বুঝলে কথাটা?

শব্দটার উপর ঝোঁক দিচ্ছিনা, বোঝাবার জন্য ওটা বেছে নিয়েছি, নতুবা ব্যাখ্যার অন্ত থাকবে না। যারা আঁকাবাঁকা প্রশ্ন করবে তাদের বলবে: পাবার সহজ উপায় জোর করে টানতে যাওয়া নয়, উপায় হলো শুধু নিজেকে দেওয়া। নতুন জীবন যা আসছে তার মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলেই তা তোমার কাছে ধরা দেবে। কিন্তু টানাটানি করতে গেলে নিজেদের অহংএর চাপে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এই হলো কথা।

২

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ যে বলেছেন উপরকার বিভিন্ন স্তরের কথা, যেমন উচ্চমানস, অধ্যাত্মগত মানস, বিশ্বগত মানস ইত্যাদি, অতিমানসে পৌঁছতে কি প্রত্যেককেই এই বিভিন্ন স্তরগুলি অতিক্রম করতে হবে?

উত্তর শ্রীঅরবিন্দ এ কথাও বিশেষ করে বলেছেন যে প্রত্যেকেই যাবে আপন আপন পথে, দুজনের পথ কখনো একরকম নয়।

স্তরভেদ হয়তো সর্বদাই ঐরূপ, কিন্তু কার পক্ষে কোন স্তর বেশী জরুরী আর কত কাল সেখানে থাকতে হবে এ প্রশ্ন ব্যক্তিগত। কেউ হয়তো খুব তাড়াতাড়ি সব স্তরই পার হয়ে চলে যায়, এতই তাড়াতাড়ি যে টের পাওয়া যায় না। আবার কারো বেলাতে হয়তো অনেক বছর লেগে যায়। কার মধ্যে কতখানি প্রতিবন্ধক আছে তারই উপর এটা নির্ভর করে।

উপলব্ধিকে স্থায়ী করতে হলে একটি জিনিস অপরিহার্য রূপে দরকার চাই, চেতনার উলটপালট। কারণ অনুভূতি জিনিসটা সাময়িক, যখন আসে তখন চেতনাকে স্পর্শ করে, কখনো হয়তো তার তীব্র জ্যোতি ক্ষণেক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তার পরে তা নিলিয়ে যায়, তখন তুমি আবার আগের জায়গাতেই ফিরে আসো; সাধারণ বাহ্য চেতনার দিক থেকে বোঝাই যায় না যে পরিবর্তন কিছু হয়েছে। এই ভাবেই চলতে থাকে ঘুরে ফিরে বছরের পর বছর; কখনো হঠাৎ একটা দিব্যদৃষ্টি আসে, জ্ঞানদীপ্তির মতো একটা সত্যচেতনা ঝলক দিয়ে ওঠে, তখন মনে হয় এবার আসল জিনিসটা এসে গেছে। কিন্তু তার পর ধীরে ধীরে কিংবা অকস্মাৎ সে অনুভূতি অন্তরালে চলে যায়; তাকে আর খুঁজে পাওনা, মনে হয় কই কিছুই তো বদলায় নি।

এ-সব অনুভূতি আসে অগ্রদূতের মতো, পূর্ব আশ্বাসের মতো। ভাবখানা এই যে, "দাঁড়াও বাপু আসছে।" ওগুলি এসে তোমাকে বলে যায়, "আশা নিয়ে থাকো, এমনি হতে হতে ঠিক হবে"। অনেক বারই এর পুনরাবৃত্তি হবে। এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু খুব মন্থরগতিতে, স্পষ্ট করে টের পাবার মতো নয়।

তারপর অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতের মতো আসে একটা দিন—হয়তো ইতিমধ্যে প্রস্তুতির পালা নখেষ্ট হয়েছে বলে, হয়তো তার শুভক্ষণটি এসেছে বলে, কিংবা ঐ সময়েই তা হওয়া ধার্য ছিল বলে—সেদিন মিলে যায় সেই বিশেষ অনুভূতি ; আর সত্তার যে অংশে ঐরূপ অনুভূতি ঘটল সেখানকার চেতনার সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে যায়। তখন সেখানে যে অবস্থান্তর ঘটে তা একেবারে সুনির্দিষ্ট, নিরেট, পাকাপাকি। ঐ একটিমাত্র শব্দের দ্বারাই সে অবস্থা বোঝানো যায় পুরো ওলটপালট। সেই অংশের সঙ্গে সত্তার অন্যান্য অংশের আর বাহ্য জগতের সম্পর্কই তখন চেতনার দিক থেকে অন্যরকম ; যেন উপর-নীচ একেবারে পাল্টে গেছে। একবার এমন হলে তখন আর চেতনা তার আগের অবস্থাতে ফিরে যায় না (শ্রীঅরবিন্দ একে বলতেন status বা ধাপ)।—সত্তার যে অংশ ঐ অনুভূতির স্পর্শ পেলে তা উপরের ধাপেই সুপ্রতিষ্ঠ হয়, নীচের ধাপে আর ফেরে না।

এমন পরিবর্তন যতদিন না ঘটে ততদিন অনুভূতির আসা-যাওয়া চলতে থাকে। তুমি একটু হয়তো এগোলে, তার পর দিন গুনতে থাকলে, আবার কখনো একটু এগিয়ে নয় পিছিয়ে যাচ্ছ, মনে হলো এর বুঝি শেষ নেই—আর সত্যই তাই। বছরের পর বছর এই ভাবেই চলে। কিন্তু একবার যখন চেতনার ঐরূপ পরিবর্তন এসে যায়—মনের মধ্যেই হোক বা তার কোনো অংশেই হোক, প্রাণসত্তায় বা তার কোনো অংশে কিংবা এমন কি স্থূল দেহচেতনাতেও যদি হয়,—তাতেই যথেষ্ট, আর তোমাকে আগের অবস্থায় ফিরতে হবেনা, আগে যেমন ছিলে তেমন আর তুমি হবেনা। এই হলো লক্ষণ, এতেই জানা যাবে যে তুমি নিশ্চিত এক ধাপ এগিয়েছ। আর আগে যা-কিছু হচ্ছিল তা কেবল প্রস্তুতি।

এই পরিবর্তন যাদের ঘটেছে তারাই আমার কথাটা বুঝবে, অন্যে নয়। প্রায়ই অনেকে যোগের ক্রিয়া সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে এই বিশেষ অনুভূতির তুলনা করেছে তেকোণা বেলোয়ারি কাচের (prism) ঘুরিয়ে দেখার সঙ্গে। সে কাচ এক পিঠে ফেলে রাখলে কেবল সাদাই দেখাবে, কিন্তু যেমনি তাকে একটু ঘুরিয়ে দেবে অমনি তার সাদা রং ভেঙে কত রংএর বর্ণালী দেখিয়ে আবার সাদায় ফিরে যায়। সাধারণ চেতনাতে বর্ণালী এলেও তোমরা তাকে ঘুরিয়ে সাদায় ফিরিয়ে আনো। কিন্তু এতে একটা উপমা দেওয়া হলো মাত্র, আসল জিনিসটা বলা হলোনা। এ-স্থলে যা হয় তা পাকাপাকি জিনিস, বাহিরটা যায় ভিতরে ঢুকে, আর ভিতরটা আসে বাইরে বেরিয়ে। কিন্তু তাও ঠিক নয়। একটা গোল বলের যদি ভিতর বাহির উল্টে দিতে পারো—যদিও তা করা যায় না, তাহলে আমি যা বলতে চাইছি তাই কতকটা হবে।

এই ওলটপালট আমি বোধ করছি এমন কথাও তখন বলা যায় না : বোধ করার প্রশ্নই নেই। জিনিসটা একটা ঘটনা ঘটার মতো—ঠিক যেমন বাস্তব ঘটনা ঘটে (মা তাঁর পাশের টেবিল থেকে একটা জিনিস তুলে নিয়ে সেটা উল্টো করে বসিয়ে দিয়ে দেখালেন)···।সিদ্ধি-লাভের (অর্থাৎ যেমন এই চেতনা পরিবর্তনের) মুহূর্তটি, আর তার আগেকার সুদীর্ঘ তপস্যার কালটি ও তার সমগ্র ক্রিয়াটি, এ-দুইএর মধ্যে অনেক পার্থক্য, তার মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য কথা রয়েছে, বললে বুঝবে কেমন করে হয়।···

তপস্যা বা সাধনা হলো আলাদা জিনিস, আর সিদ্ধি আলাদা জিনিস, সম্পূর্ণই আলাদা। তুমি হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী, তপস্যাই করে গেছ, সিদ্ধির কাছাকাছি ঘুরেছ পশকের মতো, তার খুবই কাছে গিয়ে পড়ছ,—আরো কাছে, আরো কাছে, কিন্তু তবু কিছুই ফল হচ্ছে না,—আর যেমনি সিদ্ধি এসে গেল, অমনি সকলই বদলে গেল সব কিছু উল্টে পাল্টে গেল। এ কথা ভাষায় বোঝানো যায় না, কারণ এ সব বাক্যে প্রকাশের জিনিস নয়, কথার ভিতর দিয়ে আসল জিনিসটা গলে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এই বলতে পারি যে, এই সিদ্ধির সঙ্গে আর তোমার সিদ্ধিলাভের আশ্পৃহা ও মনের ব্যাকুলতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ; মস্ত একটা মূলগত ব্যবধান রয়েছে, সে ব্যাকুলতা যতই দীপ্তমনের বা যতই উঁচুদরের হোক ; সিদ্ধি যেন উপর থেকে চিরনির্ধারিত, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাত্রা ও স্তরভেদের উপর আদৌ নির্ভর করছে না। তুমি অল্পে অল্পে উঠতে উঠতে যে তাতে গিয়ে পৌঁছবে তাও নয়, নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিতভাবে একটু একটু সাধনা করতে করতে তারই জোরে সেটা এসে যাবে তাও নয়। এর কোনোটাই নয়। ও জিনিস যখন আসে তখন হঠাৎই আসে, কেমন করে এসে কেমন করে আসন পেতে বসে তা কেউই বলতে পারে না, কেবল এই দেখা যায় যে সবই হঠাৎ যেনালুন বদলে গেল।

যার এই ব্যাপারই হবে সারা জগতে,সারা বিশ্বে। ওর কাজ ও করে চলেছে। এগিয়ে আসছে খুবই ধীরে ধীরে, তার পর ওর শুভক্ষণটি যেমনি আসবে অমনি ওর কাজটিও সবাধা হবে—না, ওর আসল কাজ তখন শুরু হবে।

সাধারণত চৈত্যসত্তার সঙ্গে যখন প্রথম সংস্পর্শ ঘটে তখনই ওর অনুভূতিটা আসে। কিন্তু তখন তা আংশিক মাত্র, চেতনার সঙ্গে বা তার ক্রিয়ার সঙ্গে কেন্দ্রস্থ চৈত্যসত্তার যেখানে মিলন হলো সেখানেই অনুভূতিটা ঘটল (সত্তার যে-কোন অংশেই এমন হতে পারে)। সেই সময়ে ঐ বিশেষ অংশের অনুভূতিপূর্ণ চেতনার সঙ্গে অন্যান্য অংশের সাধারণ চেতনার সম্পর্ক ও বাহ্য জগতের সম্পর্ক একেবারে উল্টেপাল্টে অন্য রকম হয়ে যায়। অতঃপর যা একবার হয়ে দাঁড়াল তাকে আর ফেরানো যায় না। এবার যদি ঐ অনুভূতিদীপ্ত অংশের কাছে তোমার সকল প্রশ্ন ও সকল কাজই নিয়ে গিয়ে হাজির করে তারই আলোতে চলবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকে, তাহলে দেখবে যে সত্তার সকল দিক দিয়েই একটা শৃঙ্খলা আসছে। সমগ্র সত্তা তখন এক হয়ে দাঁড়াবে, তার বহুত্বকে নিয়েও সেই একত্ব, বহুত্বের ধারার জটিলতা থাকলেও

নির্দিষ্ট একের কেন্দ্রটিকে ঘিরে সমস্তই একত্রে জড়ো হবে। তখন সেই এক কেন্দ্রচেতনা বা কেন্দ্র-ইচ্ছা বা কেন্দ্রসত্তাই তোমার সত্তার যাবতীয় অংশকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকবে, কারণ সবই তখন সেই এক জীবন্ত উপস্থিতির চারিপাশে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে।

বস্তুত এটাই হওয়া দরকার, আর একে এড়ানোও তোমার পক্ষে অসম্ভব, যদি তুমি দিব্যশক্তির হাতের সচেতন যন্ত্রস্বরূপ হতে চাও। অবশ্য এমনি শুধু অল্প-কিছু শুভবুদ্ধি ও ঐকান্তিকতা থাকলে তাতেই তুমি দিব্যশক্তির অচেতন যন্ত্র হয়ে কাজ করতে পারো। কিন্তু রীতিমত সচেতন যন্ত্র হতে গেলে অর্থাৎ তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে কাজ করতে গেলে, ঐ ভাবের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নিশ্চয়ই চাই ; নতুবা একটা কোথাও ফাঁকি এসে যাবে, গণ্ডগোল বেধে যাবে, কোনো অংশ অন্ধকারে বা নিশ্চেতনায় চাপা পড়ে থাকবে। তখন তুমি ভগবৎ-প্রেরণায় কাজগুলি করে যেতে থাকলেও এক দিব্য-কেন্দ্রের শৃঙ্খলাগত চেতনার অধিকারী হয়ে কাজ করলে যেমন তা পুরোপুরি মিলিস হতো তেমন হতে পারবে না।

কাজটা পরিশ্রমের খুবই। কিন্তু এ-কাজ যে-কোনো সময়ে যে-কোনো অবস্থাতেই করা যায়, কারণ তোমার সমস্যার সূত্রগুলি তোমার নিজেরই মধ্যে রয়েছে। এর জন্য বাইরের কোনো জিনিস বা বাইরের সাহায্য দরকার লাগে না। চাই কেবল অটুট অধ্যবসায়ের সঙ্গে ঐ কাজ নিয়ে সর্বদার জন্য লেগে থাকা—কারণ সত্তার ভিতরকার বদ অভ্যাস প্রায় অনেক কিছুই থাকে, যেগুলো নানা ঘটনাচক্রে তোমার মধ্যে এসে গেছে, হয়তো গতানুগতিক রূপে, শিক্ষার দোষে, পরিবেশ থেকে এবং আরো কত কারণে। তোমার মধ্যে ভুল কাজের অনেক ভাঁজ পড়ে গেছে, সেগুলোকে যতই সমান করে দাও ততই আবার তা আপন হতে ভাঁজে এসে তেমনি হয়ে যায়।

কাজেই তোমাকে একই চেষ্টা হাজার বার করে যেতে হবে। অসংখ্যবার করতে হলেও নিরুদ্যম না হয়ে তাই করতে থাকবে, তবে শেষে তার ফল পাবে। কিন্তু কেউই বা কোনো কিছুতেই যেন তার থেকে তোমাকে বিরত করতে না পারে, কারণ সমস্যা ও তার সমাধান দুইই রয়েছে তোমার নিজেরই মধ্যে, অন্য কোথাও নেই।

আসল কথা এই যে মানুষের সব চেয়ে সাধারণ রোগ হলো বিরক্তিবোধ, একঘেয়েমির ভাব এসে পড়া। এর হাত থেকে নিস্তার পেতে মানুষ অধিকাংশস্থলে নানারকম মূর্খতার কাজ করে। কিন্তু বাইরের কোনো জিনিসের দ্বারাই তার কিছুমাত্র কিনারা হয় না, এই বিরক্তির ভাবকে এড়াতে তুমি যা কিছুই করোনা কেন, তা আরো জোর করে চেপে ধরবে। কিন্তু তার বদলে যদি নিজেরই সত্তাকে ও তার ক্রিয়াগুলিকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে এনে ফেলো, আর তার সব-কিছুকে সেই এক কেন্দ্রচেতনাতে জড়ো করো যেখানে রয়েছে দিব্য উপস্থিতি, তাহলে তাই হবে এ রোগের সব চেয়ে অব্যর্থ ওষুধ। ওতে দেখবে যে জীবনে প্রচুর আগ্রহ আসবে, আশ্চর্য রকমের বৈচিত্র্য আসবে। একঘেয়েমির অস্বিরতা আর বোধ করবার ফুরসৎই হবে না। কিন্তু ওর জন্য অধ্যবসায় চাই।

আরো বেশী আশ্চর্যের কথা এই যে কেবল এই পার্থিব স্থূলদেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে থেকেই অন্তর দিব্য কেন্দ্রকে ঘিরে সত্তার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি আনার কাজ করা যেতে পারে। বস্তুত আমাদের এই দেহধারণের মূল কারণই তাই। দেহ ছেড়ে গেলে তখন এ-কাজ আর হতে পারবে না।

তার চেয়েও বেশী আশ্চর্যের কথা এই যে, কেবল মানুষেরই বেলাতে থাকে ঐ কেন্দ্রস্থ দিব্য উপস্থিতি, সে তার ঐ চৈত্যসত্তায়। তাকে কেন্দ্র করে এই আত্মবিকাশ ও আত্মসঙ্গতি আনার ও সত্তার অংশগুলিকে জানার সুযোগ মানুষ ছাড়া আর কারো নেই, সুতরাং এ-কাজ অন্য কোনো জগতের সত্তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, প্রাণরাজ্যেরও নয়, মনোরাজ্যেরও নয়, এমন কি যাদের আমরা "দেবতা" বলি তাদের পক্ষেও নয়। তারা যদি চায় এমন সঙ্গতি আনতে ও চেতনাকে পূর্ণ পরিণত করতে, তাহলে তাদেরও মানুষ হয়েই জন্মাতে হবে।

সুতরাং সকল মানুষই একটা দেহ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু কেন জন্মেছে তা কেউই জানে না। অধিকাংশ মানুষই এমনি করে না-জেনে আসে আর না-জেনে চলে যায়, আর এমনি আসাযাওয়া কেবল করতেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাদের চেতন করে দিয়ে না বলে, "অবহিত হও, কেন এসেছিলে তা ভেবে দেখ। এর কিছু কারণ আছে, সেই কাজের জন্যই তুমি এসেছ, এই আসার সুযোগটি যেন হারিয়ো না।"

কিন্তু কত যুগের যে বৃথাই নষ্ট করে চলেছ তোমরা...

(৩)

প্রশ্ন সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত পাবার আশা নিয়ে কোনো একটা বইএর যেখানে খুশি খুলে দেখা, এর কি কোনো মানে হয়? আমার কোনো প্রশ্নের জবাব পেতে চাইলে তখন কি করা উচিত?

উত্তর : ওর জন্য একাগ্রতা থাকা চাই। আর তুমি কি চাইছ তার উপরেও সেটা নির্ভর করছে। যদি চাও আভ্যন্তরীণ সমস্যার জবাব, তাহলে সেই সমস্যাটি নিয়েই একাগ্র হতে হবে। নিজের অবস্থার কথা যদি জানতে চাও, যদি তার উপর আলোকপাত চাও, তাহলে সহজভাবে নিজেকে সামনে ধরে সেই আলো আসা চাইতে থাকো। কিংবা যদি শুধুই জানতে চাও যে অদৃশ্য জ্ঞাতা তোমার সম্বন্ধে কি বলছে, তাহলে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চুপচাপ থেকে সোজাসুজি বইখানি এক জায়গায় খুলে দেখ। একটি কাগজকাটা ছুরি নিলেই ভালো হয়, যার মুখটা ধারালো ; ঐরকম ভাবে কিছুক্ষণ একাগ্র থেকে ছুরিটি বইএর মধ্যে চালিয়ে দাও, তারপর খুলে দেখ ছুরির মুখটা কোন লাইনে ঠেকে আছে।

একাগ্র হতে যদি শিখে থাকো, অর্থাৎ জবাবটি পাবার জন্য যদি সত্যিকার আগ্রহ

জাগিয়ে একাগ্র হতে পারো, তাহলে ওতে সমুচিত জবাব নিশ্চয় মিলবে। কারণ এই ধরণের বইগুলি (যা তাঁর হাতের কাছের বইখানি "Synthesis of Yoga" তুলে দেখালেন, ইতিপূর্বে এর থেকেই তিনি কিছু পড়ে শোনাচ্ছিলেন), যাতে জ্ঞান-উন্মীলনের কথা থাকে, এর মধ্যে থাকে এক সঞ্চিত শক্তি—সে শক্তি আসে উচ্চচেতনার স্তর থেকে, কিংবা প্রায়ই তা হয় সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার আধ্যাত্মিক শক্তি।

প্রত্যেকটি বই তার শব্দ-সম্ভার নিয়ে শক্তিগর্ভ এক-একটি ক্ষুদ্র ব্যাটারি। লোকে সে কথা জানে না, কারণ সেটা কেউ কাজে লাগাতে জানে না, কিন্তু কথাটা সত্য। তেমনি প্রত্যেক প্রতিমূর্তির মধ্যে বা ফোটোগ্রাফের মধ্যে শক্তিগুলি কিছু কিছু সঞ্চিত থাকেই, যার সেটি প্রতিমূর্তি বা ছবি তার প্রকৃতি এবং শক্তি যা আছে তা ওতে এসে বর্তায়। তোমার যদি ঐকান্তিক আশ্পৃহা থাকে, তাহলে তোমার সেই আশ্পৃহা থেকে একরূপ স্পন্দন উঠে ও ঐ শক্তিকে গিয়ে স্পর্শ করবে, ছবিরই হোক কিংবা বইএরই হোক, তখন জবাব আসবে কোনো উচ্চ চেতনা থেকে।

কোনো সমগ্রের মধ্যে যে জিনিস থাকে, তার প্রত্যেকটি খোলাংশের মধ্যেও সেই জিনিসের বিভবটুকু থাকে। এ-কথা বুঝিয়ে বলা কঠিন, কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত বললে বুঝতে পারো যে ব্যক্তি ইন্দ্রজাল দেখাতে চায়, সে তার সানানা একটু নখ কিংবা চুল দিয়েও তা দেখিয়ে দিতে পারে, তার পক্ষে তাই যথেষ্ট ; কারণ গোটা মানুষটার মধ্যে যা আছে, ঐ জিনিসটুকুর মধ্যেও তার বিভব আছে। তেমনি বইটির লেখকের মধ্যে যে জ্ঞান থাকে তার লেখা বইটির মধ্যেও সেই জ্ঞানের বিভব থাকে (যদিও প্রকাশ হয়ে নয়)। এখন শ্রীঅরবিন্দের বেলাতে দেখ, তিনি ছিলেন এক পরিপূর্ণ-বোধের ও পরিপূর্ণ-প্রজ্ঞার ও পরিপূর্ণ-শক্তির আধার, কাজেই তাঁর লেখা প্রত্যেকটি বই হবে তার প্রতীক, সেই জিনিসের বিভব প্রত্যেকটির মধ্যেই থাকবে। তাঁর নিজের মধ্যে যা আছে, তাঁর বইগুলির মধ্যেও প্রতীক-রূপে তার নিদর্শন আছে। সুতরাং তাঁর বইএর উপর একাগ্র হতে পারলে তুমি তারই মাধ্যমে মূল উৎসে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। এমন কি বইটি যদি অধ্যয়ন করো তবে বইতে যা লেখা আছে তার চেয়েও অনেক বেশী কিছু তোমার আয়ত্তে এসে যাবে।

বই পড়বার এবং পড়ে বোঝবারও একটা পন্থা আছে যাতে ওর থেকে তোমার নিজের প্রশ্নের জবাব মিলে যায়। সেটা দৈবাৎ মিলে যাওয়া নয়, আর তা মনোরঞ্জন করাও নয় কিংবা ভুলিয়ে দেওয়াও নয়। অবশ্য সে ভাব নিয়েও তুমি পড়তে পারো, তাতে অন্য কিছুই হবে না, কোনো রকম জলাবই তুমি পাবে না। কিন্তু যদি অন্তরের ভিতরকার গুরুত্ব নিয়ে পড়ো, আর যদি বইখানিকে মাধ্যমস্বরূপ করে তার উপর তোমার আশ্পৃহাকে একাগ্র করে তোলো, সেটিকে শক্তিতে চার্জ করা ব্যাটারির মতো জেনে যদি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তোমার আপন প্রশ্নের জবাব পাবার যথার্থ আকিঞ্চন করো, তাহলে শক্তির বিভব ওর মধ্যে তো সঞ্চিত আছেই, আর তোমারও আশ্পৃহার শক্তি বেরিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে,

এই দুই শক্তিতে মিলে তোমার হাতটিকে আর হাতের কাগজকাটা ছুরিটিকে ঠিক সেই জায়গাতে নিয়ে হাজির করবে, যেখানে লেখা আছে তোমার কোন কথাটি জানা দরকার। কিন্তু এখানে আবার বলে রাখি, আস্থা আর ঐকান্তিকতা অবশ্যই থাকা চাই, তা নইলে নয়। ঐকান্তিকতা নিয়ে এ কাজ করলে জবাব ঠিকই মিলবে।

কোনো কোনো বইতে শক্তি চার্জ করা থাকে খুব বেশী ; সেগুলি ছাড়া অন্যান্য বই থেকে তেমন সুস্পষ্ট ফল মেলে না। সাধারণত যে সব বইতে সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি দেওয়া আছে বা ছোটো ছোটো পঙক্তিতে কথাগুলি লেখা হয়েছে,যাতে বাহুল্য ব্যঞ্জনার বদলে সংক্ষেপে ও সুনির্দিষ্টভাবে কথাগুলি বলা হয়েছে, তার থেকেই সব চেয়ে ভালো ফল মিলতে পারে।

বলা বাহুল্য বইখানির মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি যে পরিমাণে আছে তারই মূল্যের উপর জবাবের গুরুত্বমূল্য নির্ভর করবে। একটা নভেলের বই নিয়ে যদি প্রশ্নের জবাব খোঁজো তার থেকে কেবল বাজে জিনিস ছাড়া আর কিছু মিলবে না।

(৪)

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ এতে বলছেন "গতিধর্মী ধ্যান"-এর কথা, তার অর্থ কি? (Synthesis of Yoga, Chap. IV)

উত্তর এমন ধ্যান যাতে তোমার সত্তার মধ্যে ক্রমশ রূপান্তর আনবে। এ ধ্যান তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আগেকার স্থিতিধর্মী ধ্যানের মতো নয় যাতে নিশ্চল ও জড়বৎ হতে হয়, চেতনার মধ্যে বা সত্তার ধারাতে কোনোরকম পরিবর্তন আনে না। গতিধর্মী ধ্যান হলো রূপান্তরকারী ধ্যান।

সাধারণত লোকে যে ধ্যান করে তা গতিধর্মী হয় না। যখন তারা ধ্যানে বসে—অন্তত থাকে তারা "ধ্যান" বলে—তখন এমন নিশ্চলতা আসে যাতে কোনোরকম গতি থাকে না। ধ্যান থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন তাদের সত্তা বা চেতনা পূর্ববৎ থাকে, কোনো পরিবর্তন আসে না, আর এই নিশ্চলতা যতই বেশী হয় ততই তারা খুশি হয়। যদি এইভাবে চিরন্তন কাল ধ্যান করা যায় তাতেও কোথাও কিছু বদলাবে না, বিশ্বের মধ্যেও নয় কিংবা নিজেদের মধ্যেও নয়। এইজন্যই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন গতিধর্মী ধ্যানের কথা, সাধারণ থেকে একেবারে উল্টো। রূপান্তর আনার ধ্যান।

*

প্রশ্ন : এই ধ্যানে কি করতে হয়? এর পদ্ধতিও আলাদা হবে তো?

উত্তর : কাকে বলো পদ্ধতি—ধ্যানে বসার পদ্ধতি? তা নয়, আপ্রুহাটিই হবে আলাদা, মনোভাবটি হবে আলাদা, যা ভিতরের দিকের পদ্ধতি।

কিন্তু আবার প্রত্যেকের পক্ষেই তা আলাদা।

সব চেয়ে দরকারী কথা হলো এইটি আগে জানা যে, কেন তুমি ধ্যান করছ। সেই তাৎপর্য থেকেই ধ্যানের প্রকারভেদ হয়, তার থেকেই তোমার ধ্যানের রাস্তা নিরূপিত হয়, এটা কিংবা ওটা। তুমি ধ্যান করতে পারো দিব্যশক্তির কাছে নিজেকে খুলতে পারার জন্য, কিংবা তোমার সাধারণ চেতনাকে সরিয়ে দেবার জন্য, কিংবা আপন সত্তার গভীরতম অন্দরে প্রবেশের জন্য, কিংবা আত্মনিবেদন করতে শেখার জন্য ; অনেক কিছুর জন্যই ধ্যান করা যেতে পারে। নিশ্চল নীরব প্রশান্তি লাভের জন্যও ধ্যান করা যেতে পারে, অনেকে সাধারণত সেই চেষ্টাই করে কিন্তু বিশেষ ফল পায় না। কিন্তু যাতে রূপান্তরের শক্তি তোমার মধ্যে আসে, কোথায় কোথায় রূপান্তর প্রয়োজন তা যাতে আবিষ্কার হয়, কোন পথে তোমার প্রগতি হবে তা যাতে জানা যায়, এর জন্যও ধ্যান করতে পারো। আবার ব্যবহারিক প্রয়োজনেও ধ্যান করা যেতে পারে, যেমন তোমার যখন একটা বিপদ পার হতে হবে, কোনো সমস্যার সমাধান বের করতে হবে, কিংবা বিশেষ কোনো কাজের জন্য সাহায্য পেতে ইচ্ছা হবে।

বোধ করি যারা ধ্যান করে তাদের প্রত্যেকেরই ধ্যানের রীতি স্বতন্ত্র। কিন্তু যদি তুমি চাও যে তোমার ধ্যান গতিধর্মী হোক, তাহলে তোমার অগ্রগতির জন্য কিছু আস্পৃহা থাকা দরকার, যাতে তোমার ধ্যান সেই আস্পৃহাটিকে সফল করে আনতে সাহায্য করে ; সেই ধ্যানই হবে গতিধর্মী।

(৫)

দেহ ও তার খোসা

আমার বিশ্বাস তোমাদের বোঝবার পক্ষে সব চেয়ে বেশী গণ্ডগোল বাধে সেইখানে, যখন আমরা নিজের মতলবে ধরে নিই যে আত্মা আছে একদিকে আর জড় আছে অন্য দিকে। বোকামি করে দুটিকে আলাদা মনে করি বলেই আমরা কোনো কিছু ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারিনা।

আত্মাও আছে আর জড়ও আছে, এই তো সোজা কথা। সুতরাং তুমি আত্মা না হলে জড়, আর জড় না হলে আত্মা। কিন্তু যাকে বলছ আত্মা তাই বা কোন জিনিস, আর যাকে বলছ জড় তাই বা কোন জিনিস ? জিনিস তো আছে অসংখ্য ; তার সীমা পরিসীমা নেই। যাকে বলো আত্মা, ধরো তোমারই আত্মা, তার আরম্ভ কোনখানে ? যেখানে কিছু দেখা যায় না সেখানে ? তা যদি হয় তাহলে প্রাণময় জগতের সকল সত্তাকে আত্মা বলতে হবে, কারণ সহজ অবস্থায় তুমি তাদের চোখে দেখ না।

অনেকে বলে, "যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তুমি থাকবে জড় দেহের মধ্যে, মৃত্যু

হলেই জড় ছেড়ে চলে যাবে আত্মায়, এই মোট কথা। জড় থেকে আত্মাকে মুক্ত করতে হবে, মৃত্যু হলেই তুমি হবে মুক্ত আত্মা।" এই সব ভুল ধারণা আছে বলেই কেউ কিছু বোঝে না। কিন্তু জগতের ধারার সঙ্গে ওর একেবারেই মিল নেই।

বর্তমান মানব-চেতনার কাছে দৃশ্য জিনিসের চেয়ে অদৃশ্য জিনিস অসংখ্য রকমে বেশী। একটা কমলালেবুর তুলনায় তার খোসা যতটুকু, আর তাও খুব পাতলা খোসা, অদৃশ্য আর অজানার তুলনায় তোমার জানার মাত্রাও ততটুকু। মাত্র খোসাটুকু জেনেই সম্পূর্ণ লেবুটিকে জানা যায় না।

কিন্তু এখন সেই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সম্বন্ধে তুমি জানো মাত্র তার বাইরের ছালটুকু, এবং তাও ভুল করে জানা। বাকী সমস্তটাই তোমার জানার বাইরে।

(৬)

প্রশ্ন : ভবিষ্যদ্বাণীর মতো করে প্রায়ই এ কথা বলা হয় যে ২,৩,৪,৫,৬, এই সংখ্যা-গুলি একত্র হলে (যেমন ৫৬ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখটি, ২৩।৪।৫৬) তা নাকি এই আশ্রমের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে ?'

(এটি ১৪।৩।৫৬ তারিখের ক্লাসে বলা হয়েছিল)

উত্তর : এর উত্তরে যদি আমি রহস্য করে বলি, "কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে এখন থেকে পঞ্জিকা বদলানো হচ্ছে, তাতে তারিখগুলিও সব পাল্টে যাবে," তাহলে ঐ সব গল্পই তো ফাঁস হয়ে যায়।

ও একটা প্রচলনের কথা মাত্র।

অবশ্য কোনো একটা প্রচল যদি সর্বসাধারণের মানবার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়, যেমন এই ক্যালেণ্ডার, তাহলে তার শক্তি খুব বেশী হয়। তা হয় একটা শক্তিশালী সংগঠন, যদি তা সর্বব্যাপী সর্বগ্রাহ্য জিনিস হয় (এখানে তাকেই বলছি সংগঠন যাকে তোমরা প্রতীকরূপে প্রাণবন্ত করে তোলো)।

অনেকে নিজেদের জন্য এমনি প্রতীক খাড়া করে তা নিজেদের কাজে লাগায়; তাদের পক্ষে তা খুবই কাজ দেয়, যেমন স্বপ্নের প্রতীকগুলো মেনে চলা। কিন্তু সে প্রতীকের প্রামাণিকতা তাদের নিজেদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ, সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব বিষয়সাপেক্ষ। কিন্তু এই ক্যালেণ্ডারের বেলা, যেহেতু তা দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষই মেনে চলছে, সেই হেতু এখানে তার প্রতীকশক্তি কাজ করবে খুব বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে; কিন্তু তবু প্রচল থেকেই ওর উৎপত্তি।

কোনো এক নির্দিষ্ট দিন থেকে তোমরা তারিখ গুনতে শুরু করলে—নিজেদের

খেয়ালে নেওয়া একটা দিন—তার থেকেই এখন তারিখের সংখ্যাগুলি এমন পাকাপাকি দাঁড়িয়েছে। আমরা বাল্যকাল থেকে ওতেই অভ্যস্ত হয়ে আসছি, কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে এ প্রচলনের অদলবদল করা হতে পারে। এমন দেশও আছে যেখানে ভিন্ন ভাবে তারিখ গোণা হয়। তাদের পক্ষে অন্যরকম সংখ্যা, সেই অনুসারে প্রতীক হিসাবে তাদের বিশেষ বিশেষ কালের গুরুত্ব অন্যরকম। যেমন মনে করো, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে নিয়ে গিয়ে বসাও, দেখবে যে তাদের সংখ্যার ধারা একেবারে স্বতন্ত্র, তাদের কাছে এই ২,৩,৪,৫,৬ বললে কিছুই তারা বুঝবে না।

কিন্তু তোমাদের এই বিশেষ সংগঠন—অর্থাৎ যার মধ্যে জন্মে যাকে এতকাল মেনে চলছ, তা যখন জগতের সর্বাধিক মানুষ মঞ্জুর করেছে, তখন তাদের সকলের উপর এই সংগঠন কাজ করবে। যত বেশী লোক একে মানবে ততই বেশী এর কাজ হবে।

এ সব জিনিসকে প্রতীক হিসাবে বেশ কাজে লাগানো যায় এবং এর দ্বারা বাস্তব জগতের সঙ্গে সূক্ষ্ম জগতের যোগাযোগ হতে পারে, এই পর্যন্ত।

কিন্তু যদি হাজার হাজার মানুষের পরিবর্তে মাত্র তিন চার জন মানুষের এই ক্যালেণ্ডার হতো, তাহলে এই সংখ্যাগুলির এমন প্রতীকমূল্য থাকতোনা। মাত্র ঐ তিন চার জনের বেলাতেই সেটা খাটতো। সুতরাং ওর নিজস্ব দাম কিছু নেই, সর্বজনীন স্বীকৃতি ও প্রয়োগের উপরেই ওর দাম।

গ্রহনক্ষত্রের বিচার আর কোষ্ঠিগণনা সম্বন্ধেও এই ভুল করা হয়। সেও একরকম ভাষা এবং প্রচল ছাড়া অন্য কিছু নয়, যদি তাকে মঞ্জুর বলে গ্রহণ করো তাহলে তাকে নিজেদের কাজে লাগাতে পারো, কিন্তু তার মূল্য আপেক্ষিক মাত্র, কত মানুষ মানছে তারই উপর ওর মূল্যের গুরুত্ব নির্ভর করবে।

এই আপেক্ষিক জগতে সব কিছুরই মূল্য আপেক্ষিক। কোনো কিছুকেই অক্ষরে অক্ষরে সঠিক বলে ধরে নিওনা, তাতে তোমার মস্তিষ্ক সংকীর্ণই থেকে যাবে।

যতই আদিম অর্বাচীন মনোভাবের দিকে যাবে ততই তোমরা সহজবাদী হয়ে দাঁড়াবে, আর ততই এ-সব জিনিস নিয়ে অন্ধসংস্কার এসে পড়বে। অন্ধসংস্কার মানেই তাই, কোনো এক বিশেষ ঘটনাকে নির্বিশেষ করে নিয়ে সাধারণ বলে ধরা।

তোমরা তো সে গল্প জানো, কোথাও একবার একটা মইএর উপর উঠে মিস্ত্রি কাজ করছিল, দৈবক্রমে সেখানে এমন যোগাযোগ ঘটে গেল যে মিস্ত্রি যখন তার হাতের অস্ত্রটা নীচে ফেলে দিলে ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্য একজন সেই মইএর তলা দিয়ে যাচ্ছিল, ধারালো অস্ত্রের ঘায়ে মাথাটা তার কেটে গেল। এই দুর্ঘটনাটি থেকে লোকে সাধারণ নিয়ম হিসাবে চারদিকে রটিয়ে দিলে যে মইএর তলা দিয়ে যাওয়াটাই অশুভ ও মারাত্মক। এই হলো অন্ধসংস্কার, আর এমনি করেই তার সৃষ্টি হয়।

তাছাড়া আমাদের অনেক জ্ঞানও ঠিক এমনিভাবেই জন্মায়। যেমন, কোনো একটা

ওষুধ যদি অনুকূল অবস্থায় কয়েকটি রোগীকে আরোগ্য করেছে দেখা গেল, অমনি আমরা প্রচার করতে থাকবো যে অমুক রোগে অমুক ওষুধটি একেবারে অকাট্য। কিন্তু তা তো ঠিক কথা নয়। একই ওষুধ তুমি একই ভাবে একশো জন রোগীকে দিয়ে দেখ, তার ফল দুজনের বেলা একরকম হবে না, এমন কি কোনোসময় হয়তো একেবারে উল্টো ফল হবে। ওষুধের গুণই রোগ সারায় এমন নয়; ওষুধের উপরেই এমন একান্ত বিশ্বাস, এও একটা অন্ধসংস্কার।

বস্তুত বিজ্ঞানে আর অন্ধসংস্কারে যে পার্থক্য তা খুব বেশী নয়। বোধ করি ভাব প্রকাশের হেরফেরেই তার পার্থক্য দেখা যায়। তুমি যদি বৈজ্ঞানিকের মতো সতর্ক ভাষাতে বলো, "জিনিসটা এইরূপ বলে মনে করা যেতে পারে...অতএব বলা যেতে পারে...সব দিক দিয়েই এই কথা ভাবা যেতে পারে...", এমন বললে তা আর অন্ধসংস্কার নয়। কিন্তু তার বদলে যদি বলো, "এটা এমন হবেই", অমনি তা হয়ে দাঁড়াল অন্ধসংস্কার।

অতএব দেখতে পাচ্ছি, ৩,৪,৫,৬, কিংবা ২,৩,৪,৫,৬ সংখ্যার যোগাযোগে যদি তোমাদের পক্ষে অসাধারণ কিছু ঘটে যায়, যদি ঐ সময়ে বাহ্য বা আভ্যন্তর বিশেষ কিছু হতে দেখ, তাহলে তোমরা হয়তো বলবে তারিখটি অসামান্য। কিন্তু ঐ দিন কিছুই যদি না হতে দেখ তবে তা আর অসামান্য হবে না, তখন ওকে বলবে অন্যান্য তারিখের মতো।

বৈদিক যুগের চেয়েও প্রাচীন এক প্রবাদ বাক্য আছে, তাতে বলা হতো, "বারো জন সাধু মানুষ যদি একত্রিত হয়ে এক আশ্পৃহা নিয়ে ভগবানকে ডাকে, ভগবান তাহলে সাড়া দিতে বাধ্য হন।" হয়তো এর মধ্যে সত্য আছে, কিংবা হয়তো এটা অন্ধসংস্কার। হয়তো এটা নির্ভর করে ঐ বারো জনের সাধুতার উপর, কিংবা হয়তো আরো অন্য-কিছুর উপর। আমার মনে হয় প্রথম একবার বারো জন মানুষ একত্রিত হওয়াতে ঐ রকমই হয়েছিল (সম্ভবত কেন যে ঠিক বারো জনই হলো তা নিজেরাই তারা জানতো না), তাদের একই আশ্পৃহা মিলিত হয়ে এমনই তীব্র ও শক্তিশালী হয়েছিল যে তাদের সাড়া মিলে গেল। কিন্তু তাই থেকে যদি বলা হয় যে বারো জন সাধু এক আশ্পৃহা নিয়ে একত্রে মিললেই ভগবান নেমে এসে সাড়া দেবেন, তাহলে তা হবে অন্ধসংস্কারের কথা।

তথাপি প্রথম দফায় একবার ঐরকমই হয়ে থাকবে, আর যে লোকটি তা দেখতে পেলে সে তার থেকে এই প্রবাদ রটালে, "বারো জন সাধু একত্রিত হয়ে এক আশ্পৃহা নিয়ে ভগবানকে ডাকলে তিনি আসতে বাধ্য হন।" কিন্তু তারপর থেকে কতবারই বারো জন মানুষ এক আশ্পৃহা নিয়ে একত্রিত হয়েছে, কিন্তু ভগবান নেমে আসেননি। প্রবাদটি কিন্তু তাই রয়ে গেছে।

আজকের সন্ধ্যায় আমরা বারো জনের চেয়ে অনেক বেশী লোক একত্রিত হয়েছি। এসো একবার চেষ্টা করে দেখি কি ফল হয়।

(ধ্যানারম্ভ)

---

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—শ্রীপতপতি ভট্টাচার্য।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সান্ধ্যবৈঠক

নীরদবরণ

নীরদ আশ্রমে একটি চলতি ধারণা যে কোন অসুখ হতে সেরে ওঠবার পর সাধনায় একটা উন্নতি দেখা যায়। সত্যি কি?

শ্রীঅরবিন্দ: তেমন কোন কথা নেই। তোমার সর্দ্দিতে বুঝি তোমার সাধনায় উন্নতি হবে?

নীরদ: সর্দ্দি তো আর রোগ নয়।

শ্রীঅরবিন্দ: যোগীদের মতে প্রত্যেক রোগের মূলে কোন না কোন মানসিক কারণ আছে, সেটা যদি বের করে তাকে সারান যায়, তাহলে উন্নতি সম্ভব।

নীরদ শিশুদের সম্বন্ধে কি বলবেন তাহলে?

শ্রীঅরবিন্দ কেন? তাদের কোন মনস্তত্ত্ব নেই? তুমি বলতে চাও যে এই পৃথিবীতে তারা আসে একেবারে সাদাপাতার জীবন নিয়ে, আর পরে সেগুলো ভরে ওঠে? মোটেই নয়, মনস্তত্ত্বে ঠাসা তারা, প্রত্যেকে অন্যের থেকে আলাদা।

এখন হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে সামান্য কথার পর আলোচনা আরম্ভ হল দীর্ঘায়ু বিষয়ে। আমাদের মধ্যে কেউ একজন বলল যে, তিব্বতী বাবা অনেককাল বেঁচেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু তা ত যোগের ফলে নয়, তিনি বলেছেন যে কোন ওষুধের গুণে তাঁর শরীর বদলায় এবং লম্বা আয়ু হয়। ব্রহ্মানন্দ ত বহু বছর বাঁচেন, কারও মতে ২০০—৩০০ বছর। তাঁর সঠিক বয়স কেউ জানে না, তিনি কাউকে বলেনও নি। একবার যখন তাঁর দন্তশূল হয়, সর্দ্দার মজুমদার তাঁর কাছে কিছু ওষুধ নিয়ে যান। ব্রহ্মানন্দ বলেন, "এই দাঁত ব্যথা ত আজকের নয়, সেই ভান গিরদি (পাণিপথের যুদ্ধ) থেকে রয়েছে।" এই সূত্র থেকে তাঁর বয়সের আন্দাজ পাওয়া যায়। অদ্ভুত ছিল তাঁর চোখ। সাধারণতঃ চোখ দুটো হয় বন্ধ, নয় আধা-খোলা থাকত। যখন আমি দেখা করতে যাই, ফিরে আসার সময় চোখদুটো পুরো খুলে আমার দিকে তাকান। মনে হল আমার ভিতরের সবটা পরিষ্কার দেখে নিলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বাংলার গভর্ণর Sir Edward Baker-এর কথা। আমার চোখের তিনি খুব প্রশংসা দিয়েছেন। আলিপুরে আমাদের পরিদর্শন করে তিনি চারু দত্তকে বলেন, "অরবিন্দ ঘোষের চোখ দেখেছ?"

"দেখেছি। কি বলতে চাও?"

"ওগুলো পাগলের চোখ!" (হাস্য)

চারু দত্ত অনেক কষ্টে তাকে বোঝাতে চাইল যে আমি মোটেই পাগল নই, বরং কর্ম-যোগী ইত্যাদি।

পুরাণী: Manchester Guardianএর লেখক Nevinson বলেছেন, আপনি কখনো হাসেন না।

শ্রীঅরবিন্দ: জানি। তাঁর সাথে আমার দুবার দেখা হয়। একবার বাংলায় সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে, তখন আমার শুরুতর অসুখ। আর একবার সুরাটে, যখন আমি Nationalist Conference-এর সভাপতি। সভাপতি বলে সেবারও হাসতে পারিনি। সুতরাং তিনি লিখলেন, "The man who never laughs"—যে লোক কখনো হাসেনা। (হাস্য)

নীরদ: Tegart তো আপনাকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের একনম্বর শত্রু মনে করত। সরকার মহলে যখন আপনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির (ordinance) আলোচনা হয়, তখন তা রদ করার প্রস্তাবে সে ভয়ানক আপত্তি করে।

শ্রীঅরবিন্দ: কই, সেরকম নিষেধাজ্ঞা কিছু ছিল না ত। শেষবার আমার নামে অভিযোগ হল কর্মযোগিনে আমার দুটো সই করা চিঠি নিয়ে। কিন্তু সেগুলো বিদ্রোহমূলক নয় বলেই ত রায় দেওয়া হল। এই নিষেধাজ্ঞা তাহলে উপকথা মাত্র।

নীরদ: ভারতবর্ষে অন্তত: ওটাই সাধারণের ধারণা। সবাই বলে আপনিই বিদ্রোহ আন্দোলনের নেতা।

শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজদের ধারণা তাই। Olive Maitlandকে জান ত? রাজ-পরিবারের সাথে তাঁর বেশ বন্ধুত্ব। যখন এখান থেকে তিনি ফিরে যান তখন তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে আমি নেহাৎ ভাল মানুষ, আমার আশ্রম অত্যন্ত মনোরম জায়গা, ইত্যাদি। কিন্তু তিনি টের পেলেন যে তাঁদের বিশ্বাস করান দূরে থাক, তাঁরাই ওঁকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখছেন। লর্ড মিন্টো ত বলেছেন অ. ঘোষকে পিষে না মারা পর্য্যন্ত বালিশে নিশ্চিন্তে তাঁর মাথা রাখতে পারবেন না। তাঁর ভয় যে আবার আমি বিদ্রোহ শুরু করব। হত্যাও চলছিল তখন মাঝে মাঝে; কিন্তু কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বরং Lord Carmichael তাঁর লোক মারফত যে একটি প্রস্তাব পাঠান তাতে বলেন যে আমি যেন দার্জিলিং গিয়ে থাকি। সেখানে তাঁর সাথে দর্শন আলোচনায় আমাদের দিন কাটবে ভাল। আমি রাজী হলাম না।

সরকারের ভয়ানক তাক লেগে গিয়েছিল। তাঁরা ভাবতেই পারেননি যে ভারত-বাসীরা এরকম বিদ্রোহ আন্দোলন করতে পারে।

নীরদ : চারু দত্তও কি যোগ দিয়েছিলেন?

শ্রীঅরবিন্দ : অবশ্য। সবাই সে খবর জানত, সেজন্যে ইংরেজ মহলে তাকে বলত, "রাজভক্তিহীন (disloyal) জজ।" সাহসী, তেজস্বী, শক্তিমান ও সাদাকথার (frank) লোক ছিল সে। এই রকম লোকই আমার পছন্দ। সে তার স্বদেশীভাব ইংরেজদের কাছে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করত।

নীরদ : ইংরেজরাও তাঁকে পছন্দ করত?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, তারা এধরণের লোক পছন্দ করে। D. Souza বলে আমার একজনকে আমি খুব চিনতাম। তিনি এখন Mysore State-এ কাজ করছেন। এরকম বুদ্ধিমান লোক আমি খুব কম দেখেছি। স্বাধীন মন তাঁর। জাতে দেশী খৃষ্টান কিন্তু খৃষ্টানত্ব কিছুই নেই।

নীরদ : Tegartই তো নাকি বিদ্রোহ দমনের মূল কারণ। কিছুদিন আগে সে Palestine-এ কোনমতে প্রাণে বেঁচে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। আশ্চর্য্য যে সবচেয়ে সেরা বদমায়েস যারা, তারাই এ রকম রক্ষা পায়।

নীরদ : চারু দত্ত তাঁর 'পুরোণো কথা'য় দুটো ঘটনা উল্লেখ করেন। আপনি নাকি তাস খেলতে ও গুলি ছুঁড়তে জানতেন না অথচ এতে আপনাকে যখন যোগ দিতে ডাকা হল, দুটোতেই আপনি তাঁদের অবাক করে দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ : তাস খেলতে জানতাম না ঠিকই, Bridge আবার শক্ত খেলা। আমি জিততাম বলে সে মনে করত যে আমি সকলের তাসগুলি দেখতে পেয়েছি। আর গুলি ছোঁড়া ত তেমন শক্ত কিছু নয়, ছোট ছোট পাখী শিকার করতে পারতাম সহজে।

নীরদ : তিনি ফিরে যেতে পারবেন না ভয়ে এখানে আসতে চান না।

শ্রীঅরবিন্দ : শেষ যাত্রা?

নীরদ : তিনি আপনার বিশেষ বন্ধু ছিলেন?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ।...Beechcroft (আমার কলেজ-বন্ধু, আমরা Tripos একত্রে পাশ করি,) কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না আমি বিদ্রোহী হতে পারি। আর একজন

ঘনিষ্ঠ ইংরেজ বন্ধু Ferrar বিচারের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমাদের তখন খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয় জজ-সাহেবকে গুলি করে মারব ভয়ে। বেচুন কি সিঙ্গাপুরে তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার। আমায় এই খাঁচায় দেখে তার খুব কষ্ট হয় কিন্তু বের করে আনবার কোন উপায় খুঁজে পান না। ইংরেজীতে Hexameter ছন্দের সঙ্কেত তাঁর কাছেই আমি পাই। তাঁর ধারণায় Homer-এর যেটি উৎকৃষ্ট লাইন সেটি তিনি আমায় আবৃত্তি করে শোনান। তাতেই ছন্দের দোলাটি পেয়ে গেলাম। ইংরেজীতে সত্যিকারের ভাল Hexameter নেই, বড় বড় সমালোচকরা একবাক্যে রায় দিয়েছেন ইংরাজীতে Hexameter চলবে না। Matthew Arnold এবং তাঁর বন্ধুরা চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সফল হন নি।

নীরদ : ইয়েটস্ লেখেন নি?

শ্রীঅরবিন্দ : কই? আমি ত জানি না। তুমি বোধ হয় Alexandrine-এর কথা ভাবছ।

নীরদ : হাঁ, হাঁ, তাই।

শ্রীঅরবিন্দ ওটা অন্য জিনিষ। অনেকেই তা লিখেছে। এটা হল Dactyl Hexameter, যাতে Homer ও Virgil তাদের মহাকাব্য লিখেছেন। চমৎকার এর দোলা, মহাকাব্যের উপযুক্ত বটে। এখানেই সুরু করি লিখতে, অমল ও আর্জব পড়ে বলল যে ছন্দ ঠিকই হয়েছে। দুটো লাইন মনে পড়ছে—

Old and alone he arrived, insignificant, feeblest of mortals,
Carrying Fate in his helpless hands and the doom of an empire.
(Ilion)

নীরদ : আপনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন কখন?

শ্রীঅরবিন্দ : যখন আমরা তিন ভাই Manchesterএ। Fox Family Magazine-এর জন্যে প্রথম কবিতা লিখি—হুবহু কার অনুকরণে মনে নেই। তারপর লণ্ডনে নিয়মিত লিখতে থাকি, তার কিছু Songs to Myrtillaতে ছাপান হয়েছে।

নীরদ : ছন্দ কোথায় শিখলেন? স্কুলে?

শ্রীঅরবিন্দ : না, না। স্কুলে তো ছন্দ শেখায় না। কবিতা জোরে জোরে পড়তাম, আর ধ্বনি শুনে লিখতাম। অবশ্য অমুকের মত আমি ছন্দোবিদ (prosodist) নই।

নীরদ : মনোমোহন কি তখন কবি তকমা পেয়ে গেছেন?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। Binyon, Philips, Cripps ও সে—ওরা চারজন। অবশ্য পরে সে তেমন বড় কিছু হতে পারেনি। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে একটা কবিতার বইও বের করে, তার বেশ নামও হয়েছে। আমার ভাইই যে আমার কবিতা লিখতে প্রেরণা দেয় এতে সন্দেহ নেই।

নীরদ : Oscar Wilde তাঁর বন্ধু?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। প্রত্যেকদিন বিকেলে তার সাথে দেখা করতে যেত আর Wilde তার Wildish চঙে বলত, "সন্ধ্যার পিঙ্গল বেশে এই যে ভারতীয় যুবা-চিতাবাঘ!"* Wilde লেখায় যেমনি চমৎকার আলাপেও তেমনি। একবার তার কয়েক বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং জিজ্ঞেস করে সকালবেলাটি সে কি করে কাটাল। সে বলল, সে চিড়িয়াখানা দেখতে যায় এবং সঙ্গেসঙ্গে চিড়িয়াখানার প্রত্যেক পশুর এক মনোরম বর্ণনা দিল। তার স্ত্রী কোণায় বসে তার কথা শুনছিল, সে আস্তে আস্তে বলল, "দেখ, কি করে এসমস্ত মিথ্যে কথা বললে? সারা সকাল ত তুমি আমার সঙ্গে কাটালে।" "প্রিয়ে, মাঝে মাঝে কল্পনার ঘুড়ি না ওড়ালে চলবে কেন?"—বলল সে। (হাসা)

তখন আমিও Wilde-এর কথা-র গল্পটি বললাম, কি করে ভদ্রলোক প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে কথাকে বসলাচ্ছেন সেদি-কোনদে, আবার কথায়, তারপর একবার দাঁড়িতে। এমনি করে শেষ পর্যন্ত তিনি কথাই বজায় রাখলেন, শ্রীঅরবিন্দ গল্পটি খুব উপভোগ করে বললেন, "হাঁ, ঠিক Wildeএর মার্কা বটে।"

এবার পুরাণী মহাকাব্য সম্বন্ধে কথা তুলল। বলল যে গুজরাটে বহু পরীক্ষা চলেছে মহাকাব্যের ভাষা কি রকম হবে তা নিয়ে। সে দুঃখ করল যে কোন ভারতীয় ভাষায় সত্যিকারের এপিক নেই।

শ্রীঅরবিন্দ : কেন? মধুসূদন? তিনি ভাল এপিক লিখেছেন। তাঁর কাব্যের গতি, ছন্দ ও রূপ চমৎকার, কেবল অভাব হল বিষয়বস্তুর। আশ্চর্য্য যে তিনি মহাকাব্য লিখতে পারলেন, কারণ বাঙালীর এপিক মন নেই। বাংলা রামায়ণ মহাভারত বিশেষ কিছু নয়। তবে মধুসূদন Homer, Virgil খুব পড়েছেন কিনা, সেজন্যে এই গুণ পেয়েছেন।

নীরদ : এপিক মন কি রকম?

শ্রীঅরবিন্দ : অর্থাৎ উঁচু, বিশাল, বিপুল ও বৃহৎ বলতে পার। কিন্তু বাঙালী

---

* A young Indian panther in evening brown.

মন হল সুকুমার ও সুষম, ললিত। বাংলা চিত্রের সাথে পল্লব ভাস্কর্যের এপিক মূর্ত্তির তুলনা করে দেখ। একই কারণে ফরাসিরাও এপিক লিখতে পারেনি। তাদের ভাষাও অতিরিক্ত স্বচ্ছ, নিয়মাধীন ও সুললিত। ওতে এপিক লেখা চলে না।

নীরদ: মধুসূদনের কাব্যে বিষয়বস্তুর গৌরব নেই কেন বলছেন?

শ্রীঅরবিন্দ: বিষয়গৌরবের জন্যে চাই উন্নত ও বহৎ মন, বহৎ চিন্তার সঙ্গে সংবেদন-ক্ষমতা, উদার ও বিশাল হৃদয়। জানই ত মধুসূদনের এসব গুণ দেখা যায়নি। (হেসে বললেন)

নীরদ: তবুও স্নেহ প্রতিভাবলে রাবণের প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করেছেন, রামের জন্যে নয়। এটা কম কথা?

শ্রীঅরবিন্দ: কিন্তু বাল্মীকির দারুণ রাবণচরিত্র অথবা মিল্টনের শয়তান চরিত্রের সাথে পাশাপাশি তুলনা কর মধুসূদনের রাবণের চরিত্রকে, মনে হবে না কত তুচ্ছ? আর রামকে কী রকম ছোট করেছেন তিনি।
(পুরাণীর দিকে তাকিয়ে) মহারাষ্ট্রভাষায় কোন এপিক নেই?

পুরাণী: জানিনা, Moropat বলে একজনের নাম শুনেছি।

শ্রীঅরবিন্দ: শ্রীধর বলে কেউ চেষ্টা করেছেন শুনেছি। জ্ঞানদেব নাকি চমৎকার কিছু লিখেছেন, কিন্তু বেচারা মাত্র একুশ বছরে মারা যান। তিনি ত জ্ঞানেশ্বরী গীতা লেখেন ১৫ বছর বয়সে।

পুরাণী: তুলসীদাসের মানস্ নাকি হিন্দীতে বেশ নামকরা এপিক।

শ্রীঅরবিন্দ: দক্ষিণীদের মতে কাম্বানের এপিক খুব উঁচু স্তরের। (নীরদের দিকে তাকিয়ে) নলিনীকান্তও শুনছি এপিক লিখতে চায়।

নীরদ: পারবে না? তার ত উপযোগী ক্ষমতা রয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: অসম্ভব নয়।

নীরদ: তার দুইই আছে, যেমনি তেজ তেমনি লালিত্য।

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, কিন্তু তার লিরিকই হল চমৎকার।

নীরদ: ইকবালের কবিতা পড়েছেন? কারও মতে রবীন্দ্রনাথ থেকেও ইকবাল নাকি বড়।

শ্রীঅরবিন্দ : জানিনা ; আমি তাঁর কবিতা অনুবাদে মাত্র পড়েছি, তাতে মনে হয় না বস্তু-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের চাইতে বেশি মৌলিক বলে।

পুরাণী : বর্তমান অবস্থায় এপিক লেখা সম্ভব কি ? কেউ কেউ বলে এপিক বিষয়ের অভাব নেই কিন্তু এপিক কবিরই অভাব।

শ্রীঅরবিন্দ : কি জানি। বহুশতাব্দী পরে নাকি এপিক কবি আসে। এপিক কবি তো গোণা যায়। আর বিষয়ের কথা যদি বল, নেপোলিয়ানের জীবনের চাইতে বড় বিষয় কি হতে পারে ? কিন্তু সংস্কৃতে দেখ কত এপিক কবি রয়েছে ! ভাষাটাই যে এপিক, বাল্মীকি, ব্যাস, এমন কি ক্লাসিকাল কবি কালিদাস, ভারবী ইত্যাদি সবাই এপিক রীতি উঠেছেন।

নীরদ আপনার এপিক 'সাবিত্রী' মহাভারতের গল্পের মত ?

শ্রীঅরবিন্দ : না। আমি শুধু সূত্রটা সেখান থেকে নিয়েছি। আমার কাব্য হল প্রতীকী। আমার বিশ্বাস মহাভারতের গল্পও মূলে প্রতীকী ছিল. পরে পাশ্চাত্য প্রেমের নিদর্শন করা হয়েছে তাকে।

আমার কাব্যে সত্যবান হল আত্মার প্রতীক. মৃত্যুর আঁধার আলো সে নেমে এসেছে। আর সাবিত্রী হল দিব্য আলো ও জ্ঞানের ঈশ্বরী, নেমে এসেছে মৃত্যুর কবল থেকে সত্যবানকে উদ্ধার করবার জন্যে। অশ্বপতি হল তপঃশক্তির প্রভু। দ্যুমৎসেন হল প্রোজ্জ্বল অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক। এই কাব্যে বাইরের ঘটনা কিন্তু খুবই কম. সব ঘটনা ঘটছে ভেতরে, অন্তরে। আরম্ভ হয়েছে প্রথম উষায়, যখন সাবিত্রীর ঘুম ভাঙ্গল, তার নিয়তির দিনে ; সেদিন সত্যবানের মৃত্যুদিন। আদ্যাশক্তি সাবিত্রীকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর পরম দান হিসাবে। অশ্বপতি হল যোগী, পৃথিবীকে অজ্ঞান থেকে উদ্ধার করা তার সাধনার উদ্দেশ্য।

নীরদ : কতদূর এগিয়েছে আপনার লেখা ? প্রথম খসড়া কি শেষ হয়েছে ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, কিন্তু সংশোধন বাকী। তোমায় ত বলেছি যে ১২ বার সংশোধনের পর মাত্র প্রথম বই শেষ করেছি।

নীরদ : ছন্দটা কি রকম ?

[illegible] Shakespeare-এর অভিনয়ের ঘর ছিল Marlowe-এর থিয়েটার থেকে ভিন্ন। [illegible] ৩০ ফুট লম্বা আর প্রস্থে ৪০ ফুট হতো। কিন্তু সিলিংয়ের কাছে [illegible] ছিল। আলোর ব্যবস্থা ভিন্ন ছিল। Shakespeare-এর [illegible] ছিল। এঁদের পক্ষে অভিনয়ের ঘর ছোট হওয়ার কারণ ছিল। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল দর্শকের চোখে মিথ্যের সমস্ত ধুলো উড়িয়ে দেওয়া কিন্তু সিলিংয়ের ঝুল বাঁচানো। Yeats [illegible] অভিনয়ের পরিবর্তে ছিলো Celtic ভিন্ন ভিন্ন, Tennyson-এর [illegible]। একটি ভিন্ন ঘর ছোট ছোট, তাই ৩ ফুট ভিন্ন [illegible] ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন [illegible] ছোট ছোট ঘরের দরকার, Tennyson-এর [illegible] ও [illegible] ভিন্ন ভাবের।*

[illegible]

* [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অঙ্গারিকা। সাবনা প্রয়োজন তোমার?

বাসবদত্তা। হাঁ, আমাকে পীড়া দিচ্ছে
আমার নিজের হৃদয় নিজেরই বিরুদ্ধে।

অঙ্গারিকা। কিন্তু কেন? অবশ্য, যদিও জানি আমি।
তবু বলবে না?
তোমার হয়ে আমিই তবে সে-কথা বলব।

(সহসা বাসবদত্তা অঙ্গারিকার মুখের উপর হাত রাখল

আঃ!
কারণ সে-বস্তুকে তুমি দাবিয়ে রাখতে পারছ না
যা তোমার অন্য সত্তা সানন্দে যাচে,
যাকে তোমার মরসত্তা সাগ্রহে কামনা করে;;
এর হেতু তোমার অহংকারী হৃদয়
এখনো আত্মদান করতে জানে না।

বাসবদত্তা। না, যদি সব জানতে।

অঙ্গারিকা। না, ইচ্ছাবল তোমার আছে
কিন্তু পঞ্চশরের নূতন ছাত্রী, কৌশলটি তোমার জানা নেই;
ওগো দেবাকী মধুময়ী অবোধ বালা
পথ চিনে আসবে সে নিজে
আর তুমি বাধ্য হয়ে তোমার হৃদয় যা চায়
তার আস্বাদের আনন্দ জানবে।
যথেষ্ট হল ত?

বাসবদত্তা। মানণি।

(অঙ্গারিকার বক্ষে মুখ লুকিয়ে)

অঙ্গারিকা। তোমার পিতার ইচ্ছা পূরণ করলে না?
তোমার স্বামী না হবে তোমার পিতার অধীনরাজ?

বাসবদত্তা। আমার কি পিতা আছে না গৃহ আছে?
কিছু নেই, কেউ নেই,
সে ছাড়া আর কোন কিছুই নেই।

অঙ্গারিকা। না থাকুক আর কেউ,
শুধু সে থাক
যাকে তুমি সর্বস্ব বলে ভালোবেসেছ।
বাসবদত্তা, তোমার উপর এই ভার দিলাম—
সুদূর কৌশাম্বীতে যখন পাবে তোমার রাজচ্ছত্র
তখন তোমার রাজকার্য হয় যেন
তাকে আনন্দের রূপে ঢেকে রাখা,
তার কল্যাণ সাধনে নিরত থাকা।
তার সমুন্নত সৌভাগ্যকে আরো উর্ধ্বে ধরো,
হৃদয়কে তার ঘিরে রেখো দুঃখের হাত থেকে,
নিজের অশ্রুজলের বিনিময়ে আহরণ করো তার তৃপ্তি ও শান্তি,
স্বার্থের দাবি জানিয়ে তোমার একটি চিন্তাকণাও যেন
তার বিরুদ্ধাচরণ না করে।

বাসবদত্তা। না, তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার হৃদয়;
ঠিক এই রকমই না তা?
এ রকমে বাঁধা পড়ে
ইচ্ছা থাকলেও কি অন্যরূপ কিছু করা সম্ভব আর?

অঙ্গারিকা। বাছা, আমার কাজ তোমার হৃদয়কে বাঞ্ছায় করা,
তাকে তার মহত্তর সত্তার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া।
এখন এই হোক তোমারই গর্বের জিনিস।

বাসবদত্তা। তাই হয়েছে, তাই হয়েছে।
কিন্তু, না, প্রভুর বড় বন্ধুর,
আর প্রভুর আনি যদি করি আমার নয়
তার কল্যাণের জন্য?

অঙ্গারিকা। তোমাকে সংশোধন করা অসাধ্য।
রাণীমণি, রাজদণ্ড নাও গিয়ে।
এখন এস তবে;
ওই তোমার ভাই আসছে।
(বাম হাতের দিকে বাসবদত্তার প্রস্থান; পরিচারিকার প্রবেশ।)
ওকি তোমার কপালে মেঘের ছায়া?

বিকর্ণ। বৎসরাজকে উজ্জয়িনীতে আনা হয়েছে কী উদ্দেশ্যে?
বন্দী রাখা হয়েছে কেন?

অঙ্গারিকা। তোমার পিতার ইচ্ছা, কে জানে তা?

বিকর্ণ। কিন্তু জানতে চাই আমি।

অঙ্গারিকা। জিজ্ঞাসা কর গিয়ে তাঁকে।

বিকর্ণ। (অঙ্গারীর মুখখানি দুই হাতের মধ্যে নিয়ে)
তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি,
উত্তর তোমাকেই দিতে হবে।

অঙ্গারিকা। তোমার ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহের উদ্দেশ্যে।

বিকর্ণ করুক সে পাণিগ্রহণ,
তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে যেন।
আমাদের সুনামে কলঙ্কের ছাপ পড়ল,
নগরীতে উঠেছে অস্ফুট বিদ্রোহের গুঞ্জন।
বৎসের দেশ থেকে আক্রমণ আসুক,
আর আমাদের পক্ষে অন্যায়।

অঙ্গারিকা। বাসবদত্তাকে বিবাহ করলে
আমাদের সামন্তরাজ থাকতে রাজী হতেই হবে তাকে

বিকর্ণ। এই কি সামন্তরাজ তৈরীর পথ?
এই করেই কি গড়তে হয় সাম্রাজ্য?
মন্ত্রীজাকর এ ব্যাপার।
আগে মুক্তি দাও ওকে,
তারপর বীরোচিত সমরে স্ববশে আন।

অঙ্গারিকা। জান তো তোমার পিতার কঠোর অদম্য অভিপ্রায়
আমাদের না মেনে উপায় নেই।

বিকর্ণ। আমার পক্ষে নয়,
আর অন্যায় ক্ষেত্রেও নয়।

অঙ্গারিকা। শ্রদ্ধাশীল হও পিতার প্রতি।
নিজের অভিপ্রায় অসমাপ্ত রেখে
শত্রুকে মুক্তি দেবেন না তিনি।
এ জিনিস চেও না।

বিকর্ণ। তাহলে আমিই মুক্ত করব তাকে।

অঙ্গারিকা। কোন অধিকারে?
আমার তাকেই যে তোমাদের বংশের শত্রু?

বিকর্ণ। বীর সে
আর আমার বন্ধু।

অঙ্গারিকা। তাকে এখানে বন্দী করে আনতে
সহায় হওনি তুমি?

বিকর্ণ। বাসবদত্তার জন্য।
দু'জনকে আমার রথে বসিয়ে
নগরীর বাহিরে গিরিমালার স্বাধীন প্রাঙ্গণে নিয়ে যাব আমি।
যে বাধা দিতে আসবে
তাকে করব ভূতলশায়ী।

অঙ্গারিকা। বৎস, তুমি অপরিণামদর্শী ও ক্রোধান্ধ—
এতে অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হবে।
সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা কর
যখন বৎসরাজ নিজেই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করবে।

বিকর্ণ। আসবে সে-মুহূর্ত?

অঙ্গারিকা। সে মুক্ত হবেই।

বিকর্ণ। ওভ্যা পাঁড়ুর,
নতুবা আমিই হাত লাগাব।

অম্বালিকা। ভালো কথা
আর সকলের বড়ো কথা এই যে
প্রাচীনের উদার বীরত্ব মানুষের বুকে এখনো বেঁচে আছে।
মহাদেব, পুত্রভাগ্যে ভাগ্যবতী করেছ তুমি আমাকে।

(জনান্তিকে)

প্রাতঃপ্রণাম

শ্রীগিরীকান্ত আচার্য

ঐ মা যে দাঁড়ালো।
পুবের মোর আঁধির পাতা
পলক হারালো।
দাঁড়ালো মা হিরণ্ময়ী,
প্রভাত-রবির কিরণময়ী,
অধরে মা'র স্নিগ্ধ উজল
করুণার আলো।

আঁধার ধরার প্রভাত আনে
তিমিরমোচন,
রাত্রি-পথের যাত্রীদলের
মুক্তি-ঘোষণা।
দাঁড়ালো মা সর্বজয়া,
দাঁড়ালো মা বরাভয়া,
সন্তানে ঠাঁই দিতে ছুটি
হাত যে বাড়ালো।

দাঁড়ালো মা অলিন্দে ঐ
ঊর্ধ্ব-নয়নে,
ভবন থেকে মা'র দিঠি যায়
নিখিল ভুবনে;
শক্তি যে মা'র সৃষ্টি-ভরা,
নূতন জগৎ সৃষ্টি-করা,
লক্ষ্য শুভের দিগন্তের ঐ
সীমা হারালো।

আদিশ্লোক

রণজিৎ সরকার

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসে
মনের প্রান্তরে, এক ধানপাকা মাসে,
ফসলের লোভে কিনা পারিনা বুঝিতে ;
বিচিত্র বর্ণের পাখি,
লাল, নীল,
হরিৎ, পিঙ্গল,
মলিন, উজ্জ্বল ।

সৃষ্টির অনন্ত সুরে গায় তারা গান,
মিলিত কূজনে কাঁপে
বারে বারে প্রান্তরের প্রাণ ।
ময়ূর পেখম ধরে,
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মেলে সাদা পাখা,
মনে পড়ে "মা নিষাদ"
বাল্মিকীর আঁখি অশ্রুমাখা ।

ওরা সব কথা যেন,
ওরা যেন ছন্দ এক নূতন কাব্যের ।
দিন রাত ঝরে-পড়া পালক কুড়াই,
তাই দিয়ে পাখা বুনে
নিয়ে যাই
গম্‌গমে গঞ্জের হাটে ।
প্রথম শ্লোকের মায়া থেকে
কোথায় রেহাই ?

উচ্চৈঃশ্রবা

নীরদবরণ

উচ্চৈঃশ্রবা ছুটে চলে নিকষ আঁধারে
মরুভূর তপ্ত বালু নখরে উড়ায়ে ;
শ্রান্তি নাই : আগুনের লেলিহান বায়ে
নিশ্বাস জ্বলিয়া উঠে হ্রেষার হুঙ্কারে।

বজ্রগামী দীপ্তি তার নয়নে, কেশরে :
আকাশ কাঁপায়ে চলে বিদ্যুৎ-বিলাসে
নিস্তরঙ্গ নিশীথের মূর্চ্ছিত অধরে
ঝলকে রক্তের স্রোত মরণ-আভাসে।

সহসা থামিল অশ্ব ; দেখিল চাহিয়া
দূরে কোন্ দিগন্তের অস্ফুট রেখায়
নীলবর্ণ পতাকার উত্তুঙ্গ শিখর,
সেই ক্ষণ-পলকের উল্লাসে মাতিয়া
আবার চলিল অশ্ব গিরি-মেখলায়
যেথা তার জীবনের অনন্ত সুন্দর।

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

"The Divine Horse that trails through the Night to reach the Light of the Higher Consciousness—নীলপতাকা is the Sign of that Consciousness. Very fine poem, symbolic, not surrealistic."

হিরণ্ময় পরিক্রমা*

এক

অবতরণ

(১)
দুয়ে এক

সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ উর্ধ্বে ছিল এক, এক যে আবার দুই, দুই যে আবার এক—ছিল পুরুষ ও প্রকৃতি, যে পুরুষ আবার প্রকৃতি, যে প্রকৃতি আবার পুরুষ—উভয়ে ওতপ্রোত, গাঢ়-সংশ্লিষ্ট, অভিন্ন।

(২)
আনন্দময় বিচ্ছেদ

পৃথিবীতে নামতে হবে, পৃথিবীর খেলা খেলতে হবে, তাই তাদের পৃথক হতে হবে—হল পৃথক, একজনের পিছনে আর একজন, এক জনের সামনে আরএক জন—দু'জনেই সামনে, দু'জনেই পিছনে।

(৩)
অন্তবর্তী লোক সব

অন্ধকার, সোনালী অন্ধকার—পৃথিবীর পথে চলেছে, সঙ্গে দেবতারা সব; তরুণ দেবতারা সব—তারাও পৃথিবীর খেলায় যোগ দেবে পৃথিবীর 'পরে, পৃথিবীর ফলে ফুলে জলে প্রতিফলিত প্রতিরূপিত তাদের একই সত্তা, এক এখন হয়ে গিয়েছে বহু বহু বহু।

(৪)
অবতার

এই বহুর মধ্যে অবতীর্ণ হবে সশরীরে পরমপুরুষ, পার্থিব মাতার কোলে বিরাজিত হবে অপার্থিব সত্তা—যেমন সে অবতীর্ণ হয়েছে কালে কালে নবসৃষ্টির জন্যে।

---

* এই ত্রিবেণীর তাহিবে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে Le Périple d'Or নামে যে ফরাসী ভাষায় লিখিত খাতাখানি অভিনীত হবে তার কাহিনীর সারাংশ।

দুই

পার্থিব লীলা

(১)
মা ও সন্তান

পার্থিব সত্তা গ্রহণ করে, পার্থিব সন্তানের মধ্যেই সে আবদ্ধ থাকবে না—পৃথিবীকে প্রকৃতিকে সে নিয়ে চলবে ঊর্ধ্বে পরম মুক্তির মধ্যে।

(২)
যাত্রী
(ক)

পুরুষ চলেছে প্রকৃতির কোল আশ্রয় করে—পুরুষ শিখছে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলন মনন্ময়, পৃথিবীর রসে রসায়িত হয়ে আলোকের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে চলা।

(খ)

চলেছে দু'জনে—এ দুই পুরুষ-প্রকৃতি, পুরুষ-পুরুষ, প্রকৃতি-প্রকৃতি—তাদের মধ্যে চিন্ময় হয়ে উঠেছে এ জগৎ, পৃথিবীর ফুল, আকাশের তারা—তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে রাজকন্যার অন্বেষণ—এ তাদের মহামিলন।

(৩)
মিথুন

কালের ধারায় নিত্য-মিলন উভয়ের এখন এই বর্তোর নাটিতে জলে পাহাড়ে ছিমানী-সন্তারে, কন্দরে কণ্টকের মধ্যে প্রসারিত যত উৎসবের পথে—উভয়ের এক হাসি এক আগুন, আজ কাল চিরতরে চিরমিলন।

(৪)
দীক্ষা

প্রকৃতি গুরু এখন, শক্তি শিখিয়ে চলে পুরুষকে বর্তোর বিধান, পুরুষকে মুক্ত শুদ্ধ করে ধরবার জন্যে, তার আদি-প্রকৃতি, তার স্বরূপের মধ্যে উদ্ভাসিত করে ধরতে।

(৫)

দিব্য শক্র

দেহী যে প্রকৃতি, দেহী যে পুরুষ, এক অভিন্ন হলেও যাহাত তারা দুই—তাদের একজনকে আত্মদান করতে হবে, একজনের হাতে আর একজনকে আত্মবলি দিতে হবে বিশ্বযজ্ঞে, আর এক জনের মধ্যে বিলিয়ে বিশিয়ে দিয়ে তবে বর্ত্তে থাকবার জন্যে।

দিব্যপ্রকৃতির রাজত্ব সাম্রাজ্য সম্ভব হবে দিব্যপুরুষকে যখন সে আত্মসাৎ করে নেয়; দিব্যপুরুষ নূতন পথে দিব্যপ্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হতে চান।

তিন

প্রত্যাবর্তন

(১)

অভিক্রান্তি

প্রকৃতি ও-পারের প্রকৃতি হয়ে গেল—আলোয় উজ্জ্বলো আনন্দে গঠিত—সমস্ত সৃষ্টি গলে তার মধ্যে এক হয়ে গিয়েছে তার বিভিন্নতা হারিয়ে, পরমপুরুষও তার মধ্যে অন্তর্হিত—পরম একত্ব সাধন করে অন্তর্হিত, কারণ, অন্তরে স্থিত—আপনারই আপন প্রতিকৃতি হয়ে, মুকুরে যেমন।

(২)

অনন্ত নাগ

দুই ছিল, এক হয়েছে আবার, প্রকৃতির ভিতরে পুরুষ ফিরে এসেছে কিন্তু নূতন সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে—এক তবুও দুই সত্তা। প্রকৃতি তাই আলোয় আলোকিত—সহস্র কোটি আলোক-বিন্দু—তারার মালা—তার দেহ গঠন করে দিয়েছে। মানুষ আজ দিব্যজ্যোতির্ময়।

এই তো দিব্য রাস—আনন্দের যুগল-নৃত্য, রূপান্তরিত চিন্ময় দেহ-সত্তা।

(৩)

নিত্য রূপায়ণ

চিরন্তন প্রকাশ—ভাগবত স্বরূপের দ্বৈতলীলা; বিশ্বপৃথিবী তাকে দিয়েছে স্থূল আকার, প্রদীপ্ত জ্যোতির্ময় আনন্দময়—নাই আঁধার, নাই বাধা—

ছিল যে পরমশত্রু সে-ই এখন পরম মিত্র, ছিল যে বিদ্রোহী সে-ই এখন পরম সহযোগী। জড়ের আত্মদান পরম অবদান, ছিল যা সুপ্ত, ছিল যা পরমোত্তরণে তা এখন ব্যক্ত, এখন তা অবতীর্ণ।

" Good taste is the aristocracy of art."

The Mother

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone: 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

" To Know how to wait is to put Time on your side,
With patience one arrives always.
A persevering will surmounts all obstacles."

THE MOTHER

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

সরিষার তৈল

আপনি যখনই গণেশ মার্কা সরিষার তেল কেনেন, আপনি নিশ্চিত জানবেন যে শতকরা ১০০ ভাগই খাঁটি সরিষার তেল কিনছেন। সিল করা ১।০ ২৷০, ৫ এবং ১৮ সেরী টিন যে কোন ভাল দোকানে পাবেন

গণেশ
সরিষার তৈল

প্রাগ অয়েল মিল্স · আলীগড়।

শ্রীঅরবিন্দ-মন্দির বর্ত্তিকা

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির পাঠমালা

পাঠমালা সিরিজ

১। মা	শ্রীহরিদাস চৌধুরী	।৵০
২। চেতনার অবতরণ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৲
৩। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ	শ্রীঅনিলবরণ রায়	১৲
৪। পূর্ণযোগ প্রদীপ নমস্কার।	নিবেদিতা	৷৷৵০
৫—৭। মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৷৷৵০
৮-১০। শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	শ্রীঅনিলবরণ রায়	২৲
১১। এ-যুগের সাধনা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৷৵০
১২। কে এই মা ?	শ্রীপ্রফুল্ল ভট্টাচার্য	২৷৵০
১৩। সাধনার জীবন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৲

: শ্রীঅরবিন্দ :

বিবিধ রচনা

মূল বাংলায় লেখা পুরাতন কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত ও প্রথম মুদ্রিত

মূল্য ১৲

প্রাণায়ামের নূতন	১৷৵০
কর্ম্মযোগী	১৷৵০
প্রাণায়ামের কথা	১৲
গীতার ভূমিকা	২৲
শ্রীঅরবিন্দের পত্র	১৲
পত্রাবলী	১৷৵০

: শ্রীমা :

উত্তম রহস্য

[একাঙ্ক নাটিকা]

রাজনীতিজ্ঞ, লেখক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার দু'জনের ছুটি আত্ম-কাহিনী ও তার উপসংহার

মূল্য ১৲

ছোটদের মা	১৷৵০
পুরাণের কথা	১৷৵০
শিক্ষা	১৷৵০
মায়ের আলাপ	২৷৵০

দিব্য-জীবন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম খণ্ড ৮৲ ; ২য় খণ্ড ১০৲